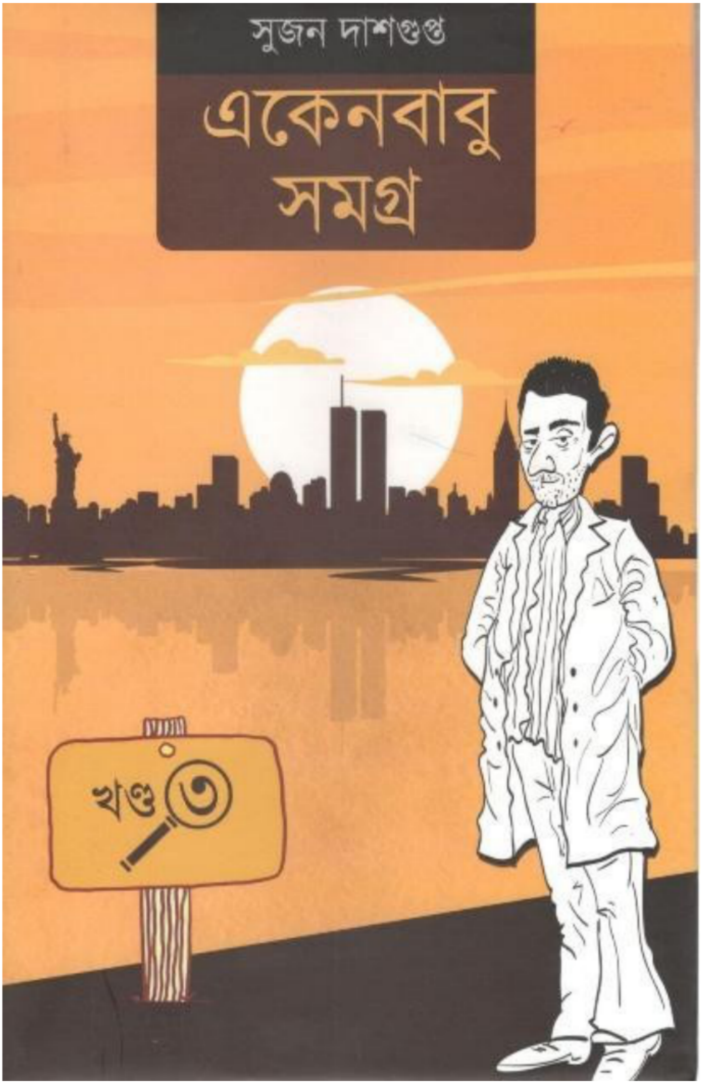
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু সমগ্র
খণ্ড ৩

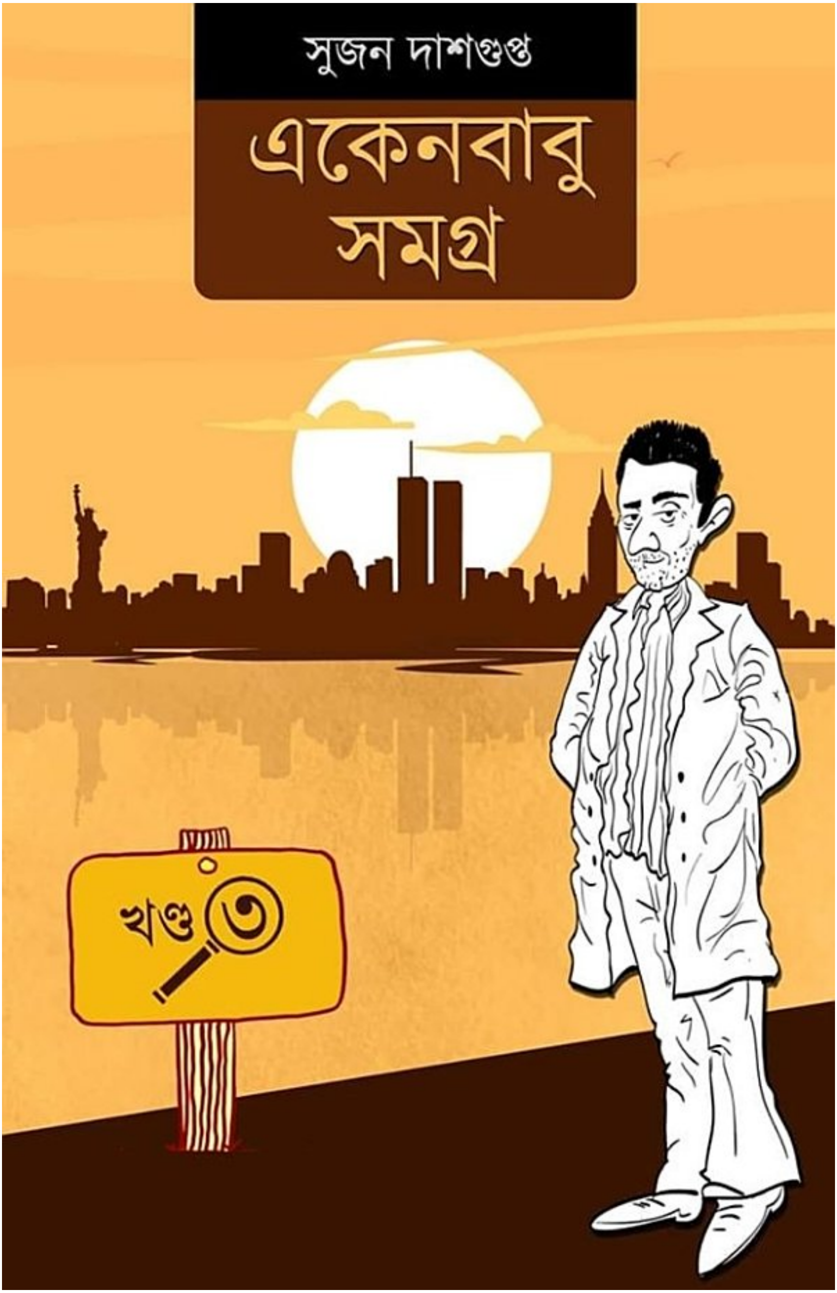
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ৩

একেনবাবু সমগ্র
(তৃতীয় খণ্ড)

সুজন দাশগুপ্ত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

www.thecafetable.com

Ekenbabu Somogra (Tritiyo Khondo)
Sujan Dasgupta
A Collection Of Detective Novels

প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর, ২০১৮
তৃতীয় প্রকাশ	এপ্রিল, ২০২০
প্রথম ই-বুক প্রকাশ	মে, ২০২০
দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশ	মার্চ, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব	সুজন দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ	একতা ক্রিয়েটিভ টেলস্
পত্রবিন্যাস	ইন্দ্রাণী নাগ
মুদ্রক	জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা-০৯
পরিমার্জিত	দ্য বুকমেকার্স
ই-বুক সংস্করণ	(thebookmakers2020@gmail.com)
মূল্য	৩২৫ টাকা / ১৬.২৫ ডলার
ISBN	978-93-87753-34-1
প্রকাশক	অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র দ্য কাফে টেবল সাহেববাগান, ব্যান্ডেল, হুগলি – ৭১২১২৩ ৯৮৭৪২৬৩৪১৩, ৯৭৪৮০৮১৫৪২

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সুবীণ ও তুষারসিক্তা দাশ-কে

ভূমিকা

‘একেনবাবুর সমগ্র’র প্রথম দুটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর দ্বিতীয় খণ্ড সংকলন করতে গিয়ে একটা ভয় ছিল, আবার তৃতীয় খণ্ডের জন্য চাপ না আসে। আশায় ছিলাম বিক্রি বাটা হবে না। কিন্তু বাঙালিরা যে এত বই কেনে কে জানত! কত বিক্রি হল জানি না, কিন্তু ‘দ্য কাফে টেবিল’-এর দুই কর্ণধার, স্নেহের অভিষেক আইচ আর অরিজিৎ ভদ্র সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করবে।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, এই খণ্ডে ‘কর্মফল’ কাহিনিটি ছাড়া সবগুলোই পূর্ব-প্রকাশিত— বই হিসেবে বা পত্র-পত্রিকায়। তবে প্রতিটি কাহিনিই বাপিবাবু পরিমার্জনা করেছেন। এখন কেনা বা না-কেনা আপনাদের ইচ্ছা।

‘একেনবাবু সমগ্র’র গল্প নিয়ে আগে যে সমস্যা হয়েছে এবারও তাই হল। একেনবাবুর সব কাহিনিই বাপিবাবুর ডায়রিতে থাকে। লেখা চাইতে গেলে ডায়রি খুলে নিজেই কয়েকটা বাছেন। ফলে একটা গল্পে মনে হয় একেনবাবু পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। পরের গল্পেই নিউ ইয়র্কে বহাল তবিয়তে। খুবই বিরক্তিকর। এই নিয়ে বাপিবাবুকে একবার বলতে গিয়ে প্রমথবাবুর ধমক খেয়েছিলাম, “আরে রাখুন তো মশাই, আপনার সময়ের পারম্পর্য! বিরক্তিকর বলছেন? আপনাদের একেনবাবুই তো বিরক্তিকর! আর কাহিনিগুলো তো রহস্যকাহিনি। ধরে নিন তার সঙ্গে স্থান-কালের রহস্যও যোগ হল।”

বিদগ্ধ পাঠক, যাঁরা এই ধরণের সংকলনে কালানুসরণ করা হবে আশা করেন, তাঁদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

— সুজন দাশগুপ্ত
মন্টভিল, নিউজার্সি

সূচি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

ম্যানহাটানের ম্যাডম্যান

হাউসবোটে নিখোঁজ

বেসুরো বেহালার পরের কাহিনি

কর্মফল

ম্যানহাটানের ম্যাডম্যান

।। ১।।

শুক্রবার, মে ১৩, ২০১১

"আজকাল স্যার, আমেরিকায় থাকার কোনও গ্ল্যামার নেই", সকাল বেলায় কফি খেতে খেতে একেনবাবু তাঁর সুচিন্তিত মতামত পেশ করলেন।

"মানে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"মানে স্যার, আজকাল যদু-মধু সবাই আমেরিকায় থাকে।"

"আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়, আপনি আমাকে আর বাপিকে যদু মধুর দলে ফেলছেন! জানেন, বাপি পড়াতে না পারলেও, একজন প্রফেসর, তাও হেঁজিপেঁজি কলেজে নয়নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে। আর আমিও একজন বিজ্ঞানী, গবেষকও বলতে পারেন।"

"কী যে বলেন স্যার, আপনারা কেন? আমি বলছি এইসব লটারি-তে ইমিগ্রেশন পাওয়া লোকেদের কথা। ম্যানহাটানে একটা ট্যাক্সিতে উঠুন, দেখবেন ফিফটি পার্সেন্ট ড্রাইভার বাংলাদেশী।"

"বাংলাদেশী মানেই যদু-মধু? এদিকে তো তারেক আলীকে দেখলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন! তারেক বাংলাদেশী নয়?"

"কী মুশকিল স্যার, আমি লটারিতে আসা বাংলাদেশীদের কথা বলছি।"

"আমি শুনেছি কী বলেছেন, ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্সি ড্রাইভার বাংলাদেশী... তা, আপনি ট্যাক্সিতে উঠলেন কবে? দূরে কোথাও যেতে হলেই তো গাড়ি করে নিয়ে যাবার জন্যে বাপির খোশামুদি শুরু করেন।"

"শুনছেন স্যার", একেনবাবু আমাকে সাক্ষী মানলেন। "ট্যাক্সিতে না উঠলে যেন ড্রাইভারের মুখ দেখা যায় না।"

"না, ভালো করে যায় না। আর কী ধরণের ডিটেকটিভ আপনি? শার্লক হোমস হলে বলতেন, বাইরে থেকে যে কয়েকটা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে অস্পষ্ট দেখেছি, তাদের কয়েকজন মনে হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার লোক। এক আধটা বাঙালিও তাদের মধ্যে থাকতে পারে।"

সকালে আমাদের ব্রেকফাস্টটা এইরকম আগড়ম-বাগড়ম বকে কাটে। একটা বেফাঁস

কথা বলেন একেনবাবু। প্রমথ সেটা নিয়ে তুমুল তর্ক বাধায়। একেনবাবু আমাকে সাক্ষী মানেন। প্রমথ আমাকেও তুলোধোনা করে। এইসব বকবকানির মধ্যেই আমরা নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ি। প্রমথ কয়েক পট কফি বানায়। ছুটির দিনে ডিম, সসেজ, বেকন, ইত্যাদি অনেক কিছু থাকে। কাজের দিনে গ্রেফ টোস্ট, ডোনাট বা মাফিন দিয়ে সকালের কফি-পর্ব শেষ হয়।

প্রমথ আর একেনবাবুর উচ্চস্বরে তর্কাতর্কি কানে এলেও আমার চোখ আজ অন্যদিকে ছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটা সংক্ষিপ্ত খবর:

> হোবোকেনে পরিত্যক্ত কাগজের কারখানার পাশে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতের নাম অশোক দুবে, বয়স বছর তিরিশেক। গায়ে গুলির আঘাত, মনে হচ্ছে হোমিসাইড।

নাম যখন অশোক দুবে, নিশ্চয় ভারতীয়। হোবোকেন অবশ্য নিউ ইয়র্ক শহরে নয়। ম্যানহাটানের পশ্চিম পাশ দিয়ে হাডসন নদী বয়ে গেছে, তার উলটো পারে। এক বন্ধুর বাবা-মা ওখানে থাকতেন বলে হোবোকেনে বার কয়েক গেছি। বছর পঁচিশেক আগে তাঁদের বাড়ির সামনেই একটি ভারতীয় ছেলে নভরোজ মোদি খুন হয়েছিল। খুন করেছিল 'ডট-বাস্টার' নামে একটা রেসিস্ট গ্যাং, যাদের কাজ ছিল ভারতীয়দের হেনস্থা করা। ভারতীয় মেয়েরা কপালে টিপ বা ডট দেয় বলে নিজেদের বলত ডট-বাস্টার। নভরোজ-হত্যার পর স্থানীয় ভারতীয়দের দলবদ্ধ আন্দোলন আর পত্র-পত্রিকার লেখালেখিতে হোবোকেন পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয়। তারপর বহুদিন কোনও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেনি। গত বছর আবার এক ভারতীয় খুন হল হোবোকেনের কাছে জার্সি সিটিতে। এবারও খুনি কতগুলো কম-বয়সী সাদাদের গ্যাং। এক বছরের মধ্যে আবার এই মৃত্যু। তাহলে কি সেই ডট বাস্টার পুনর্জন্ম নিল?

অশোক দুবে নামটা চেনা চেনা লাগছিল। প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, অশোক দুবে বলে কাউকে চিনতিস?"

প্রমথ একটু অবাক হয়ে বলল, "হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"পত্রিকায় দেখছি অশোক দুবে বলে একজন খুন হয়েছে। কে জানে এটাও হেট-ক্রাইম কিনা!"

"দেখি।" প্রমথ কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে খবরটা পড়ল। তারপর বলল, "আমারও চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক প্লেস করতে পারছি না।"

দুজনেই খানিকক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে পত্রিকাটা একেনবাবুর হাতে চলে গেছে। একেনবাবুকে প্রমথ একটু খোঁচা দিল, "কি মশাই, খুব তো গোয়েন্দাগিরি করেন, চেনেন একে?"

"না, স্যার।"

এমন সময়ে একটা ফোন। ধরলেন একেনবাবু। ইদানীং ওঁর ফোনই সবচেয়ে বেশি আসে, তাই ফোন বাজলে সেটা ধরার প্রথম দায়িত্ব একেনবাবুর। একেনবাবুর 'হ্যাঁ ম্যাডাম', 'ঠিক আছে ম্যাডাম', ইত্যাদি শুনে বুঝলাম ফোনটা কোন মহিলার।

ফোন শেষ করে এসে বসতেই প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "সাত সকালে এক সুন্দরীর

ফোন, ব্যাপারটা কী?”

“সুন্দরী নয় স্যার, বিপাশা মিত্র।”

“বিপাশা মিত্র! মানে সোশ্যালাইট বিপাশা মিত্র?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“তাঁকে বলছেন সুন্দরী নয়, আপনার আস্পর্ধার তো সীমা নেই দেখছি?”

“কী মুশকিল স্যার, তাই বললাম নাকি?”

“তাছাড়া আবার কী বললেন? আমি কি বাংলা বুঝি না, না আপনি বাংলা ভাষা জানেন না?”

“তুই থামবি?” প্রমথকে একটা ধমক লাগিয়ে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “হঠাৎ ফোন করলেন কেন?”

“উনি একটা ঝামেলায় পড়েছেন স্যার।”

“সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু ঝামেলাটা কী?”

“গত সপ্তাহে যে বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে এত হইচই হল, সেটা অদৃশ্য হয়েছে।”

“অদৃশ্য হয়েছে?”

“সেটাই ম্যাডামের মনে হচ্ছে।”

যাঁরা আমেরিকার সোশ্যাল সিন-এর খবর রাখেন না, তাঁরা হয়তো বিপাশা মিত্রকে চিনবেন না। কিন্তু পিপলস ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে ভোগ, গ্ল্যামার, স্টার□ হেন পত্রিকা নেই যেখানে বিপাশা মিত্রের ছবি আর খবর নিয়মিত বেরোয় না। চেহারা? ইস্ট আর ওয়েস্টের পারফেক্ট কম্বিনেশন, স্টানিং বিউটি! পৈত্রিক সূত্রে ম্যানহাটানের ইস্ট সাইডে অনেকগুলো বড় বড় বাড়ির মালিক। নিউ ইয়র্কে রিয়েল এস্টেটের এখন যা দাম, তাতে নিঃসন্দেহে বিলিয়নিয়ার।

গতমাসে একটা বিশাল এক্সিবিশন ‘ওয়ার্ল্ড অফ লর্ড বিষ্ণু’-র আয়োজন করেছিল এশিয়া ইনস্টিট্যুট। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বিষ্ণুর ছবি, মূর্তি, বই, পুঁথি ইত্যাদির প্রদর্শনী। আমরাও গিয়েছিলাম দেখতে। সেখানে কম্বোডিয়া থেকে পাওয়া বারোশো বছরের পুরোনো একটা পাথরের বিষ্ণুমূর্তি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পারিবারিক সংগ্রহশালা থেকে বিপাশা মিত্র কয়েক দিনের জন্যে ওটা এশিয়া ইনস্টিট্যুটকে ধার দিয়েছিলেন। মূর্তিটা তেমন বড় নয়, কিন্তু সত্যিই খুব সুন্দর। গাঢ় ছাই রঙা গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। গা-টা একেবারে মসৃণ, আর নিখুঁত কারুকাজ। এটা নাকি অ্যাঙ্কোর ভাটের কাছে কোনও একটা ভাঙ্গা মন্দিরে ছিল। মূর্তিটির উৎসস্থল নিয়ে পরে বেশ বিতর্কও হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের আর্ট-ক্রিটিক জন হেক্টারের মতে, মূর্তিটা কম্বোডিয়ার নয়, দক্ষিণ ভারতের। আর বারোশো বছরের নয়, বড়জোর আটশো বছরের পুরোনো। জন হেক্টার হেঁজিপেঁজি লোক নন, এককালে দাপুটে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার ছিলেন। তাই ধরে নিতে হয়, ওঁর মতামতটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। হেক্টারের দাবি ওঁর কাছে এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ আছে। কিন্তু অনেকে সেটা মানেননি। বিশেষ করে এশিয়া ইনস্টিট্যুটের যিনি কিউরেটর, তোশি আকাহাশি। তাঁর সঙ্গে জন হেক্টারের দীর্ঘ পত্রযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে।

“বিপাশা মিত্র আপনার খবর পেলেন কী করে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে স্যার।”

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নিউ ইয়র্ক পুলিশের বড় কর্তা। বেশ কয়েক বছর আগে ম্যানহাটানের ‘মুনস্টোন মিস্ট্রি’ নিয়ে পুলিশ যখন হিমশিম খাচ্ছিল, তখন একেনবাবু রহস্যটা উদ্ঘাটন করেছিলেন। সেই থেকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একেনবাবুর গুণমুগ্ধ।

“পত্রিকায় তো এই চুরির খবর বেরোয়নি!”

“নিউজ মিডিয়া বোধহয় এখনো খবরটা পায়নি স্যার। যাইহোক, ওঁর অফিসে একবার যেতে বলেছেন।”

“তার মানে এই সুযোগে আপনি বিপাশার সঙ্গ পাবেন? বউদির পারমিশনটা নিয়ে রাখবেন আগে থেকে। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে একটা কেচ্ছা হবে।” প্রমথ মন্তব্য করল।

“কী যে বলেন স্যার, ছি ছি, কোথায় বিপাশা মিত্র আর কোথায় আমি। তার ওপর এই তো চেহারা।”

“বিউটি এন্ড বিস্ট বলে একটা কথা আছে, শোনেননি?”

“তুই থামবি,” আমি প্রমথকে আবার ধমক লাগালাম। “কবে যেতে হবে আপনাকে?”

“শুধু আমি কেন স্যার, আমরা সবাই যাব। উনি চান আজ বিকেলেই চারটে নাগাদ আমরা যেন আসি।”

।। ২।।

ইন্টারনেট একটা অ্যামেজিং জিনিস। এরমধ্যেই প্রমথ গুগল সার্চ করে বিপাশা মিত্রের কুষ্ঠি-ঠিকুজি আবিষ্কার করে ফেলেছে। ঠাকুরদা ছিলেন কলকাতার এক মিত্তির। এক জার্মান মহিলাকে বিয়ে করে মার্কিন মুলুকে আসেন। ছেলে সুজয় মিত্রের জন্ম এদেশে। সুজয় বিয়ে করেন এক আইরিশ মহিলাকে। ওঁদেরই একমাত্র কন্যা বিপাশা মিত্র। বিপাশা নামটা ঠাকুরদার দেওয়া। বাঙালিত্ব বলতে ওইটুকুই, বাংলার ব-ও জানেন না। ঠাকুরদা ট্র্যান্সপোর্ট বিজনেসে প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন। ছেলে সুজয় মিত্র সেই টাকা নিয়েই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ে নামেন। বছর দশেকের মধ্যেই হি বিকেইম এ রিয়েল এস্টেট কিং। তবে টাকা বানালেও বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। বছর তিনেক আগে স্ত্রীকে (ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিপাশা মিত্রের আইরিশ মা-র মৃত্যু ঘটেছিল বহু বছর আগে) নিয়ে থিয়েটার দেখে ফেরার পথে গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে দুজনেই মারা যান। দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনও সন্তান ছিল না। তাই বিপাশা মিত্র একাই এখন ব্যবসাটা চালাচ্ছেন। এছাড়া ওঁর বাবার একটা বড় ফাউন্ডেশন আছে, বিভিন্ন সৎকাজে টাকা দেয়। সেটার দেখাশোনাও করেন বিপাশা মিত্র নিজে। সেই সূত্রেই এশিয়া ইনস্টিট্যুটের উনি একজন বড় পেট্রন। তথ্য বলতে এইটুকুই। বাদবাকি হল সস্তা ম্যাগাজিনের এক্সক্লুসিভ খবর। মুখরোচক, কিন্তু সত্যি হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। কার সঙ্গে বিপাশা মিত্রকে কোথায় দেখা গেছে, কার সন্তানকে বিপাশা মিত্র অ্যাবরশন করেছেন, কে বিপাশা মিত্রের জন্যে বউকে ডিভোর্স করেছে, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে একটা খবরেই কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকতে পারে,

সেটা হল হলিউডের এক বিখ্যাত প্রডিউসারের সঙ্গে বিপাশার অন্তরঙ্গতা। নিউ ইয়র্ক টাইমসে একসঙ্গে ওঁদের দুজনের ছবি বেশ কয়েকবার দেখেছি।

নিউ ইয়র্কে প্রায় সাত বছর থাকলেও সত্যিকারের বড়লোকদের বাড়িতে যাবার সুযোগ আমার কখনো হয়নি। বিপাশা থাকেন সেন্ট্রাল পার্কের উল্টোদিকে ফিফ্থ অ্যাভিনিউয়ে। বিল্ডিংটা পঁচিশ-তলা, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম থেকে বড়জোর মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। ভারী কাচ দিয়ে তৈরি বিশাল সদর দরজা। সেটা ঠেলে ঢুকলেই মাঝারি সাইজের লবি। এক পাশে সিকিউরিটি স্টেশন, কয়েকজন গার্ড সেখানে বসা। অন্য দিকের দেয়ালে আটকানো একটা বিশাল বোর্ড। সেখানে বিভিন্ন তলায় কী কী অফিস আছে, স্যুইট নম্বর দিয়ে তাদের লিস্ট। সামনে এগোলেই একটা হলওয়ে যার দু-দিকে পাশাপাশি বেশ কয়েকটা লিফট। একদম শেষে ছেলেদের আর মেয়েদের জন্য আলাদা দুটো ওয়াশরুম।

বিপাশা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনে সিকিউরিটির একজন বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করছিল। তখন প্রমথই একটু গরম হয়ে বলল, "উনিই আমাদের ডেকেছেন, তোমাদের এত সমস্যা হলে আমরা চললাম।"

তখন সুপারভাইজার গোছের লোকটি ফোন করল বিপাশা মিত্রের অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি মিলল।

সুপারভাইজারটিই আমাদের একটা স্পেশাল লিফটের সামনে নিয়ে গিয়ে লিফট অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল চব্বিশ তলায় পৌঁছে দিতে। লিফটটা কুড়ি তলার আগে কোথাও থামে না, সেখান থেকে ওঠে পঁচিশ তলা পর্যন্ত। অ্যাটেন্ডেন্টকে প্রশ্ন করে জানলাম, একুশ থেকে তেইশ তলা পর্যন্ত শুধু রেসেডিনশিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট। ওগুলো যে সুপার-রিচদের জন্যে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। চব্বিশ আর পঁচিশ তলা বিপাশা মিত্র রেখেছেন নিজের ব্যবহারের জন্য। ওঁর অফিস হচ্ছে চব্বিশ তলায়।

লিফটের দরজা খুলতেই যিনি অভ্যর্থনা করলেন, নিজের পরিচয় দিলেন বব ক্যাসেল বলে। বব বিপাশা মিত্রের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্টেন্ট, অর্থাৎ পার্সোনাল সেক্রেটারি। দেখে মনে হয় বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক। পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো সোনালি চুল, চোখে গোল্ড রিমের চশমা। ক্যাজুয়াল পোশাক জিনস আর পোলো সার্ট। আমাদের নিয়ে নিজের অফিসে বসালেন। বিপাশা মিত্র কারোর সঙ্গে কথা বলছেন, একটু বাদেই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

বব মনে হল ভালো ভাবেই জানেন, বিপাশা মিত্র কেন একেনবাবুকে ডেকেছেন।

"মূর্তিটা অদৃশ্য হওয়া নিয়ে ও খুবই চিন্তিত। ফ্যামিলি মিউজিয়ামের কালেকশনে অনেক জিনিস আছে যেগুলো টাকা দিয়েও কেনা যাবে না। এরকম চুরি আর যেন না ঘটে, তারজন্যে বিপাশা পুরো ব্যাপারটা ভালো করে অনুসন্ধান করাতে চায়।"

"বিষ্ণুমূর্তিটা কবে চুরি হল স্যার?"

"ওটা এশিয়া ইনস্টিট্যুট থেকে আসার পথেই খোয়া যায়। একটা কাঠের ক্রেটে বাব্ল র‍্যাপ দিয়ে প্যাক করা ছিল। ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদেরই সিকিউরিটির দু'জন লোক। কিন্তু এখানে আসার পর ক্রেটটা যখন খোলা হল, দেখা গেল শুধু বাব্ল র‍্যাপগুলোই আছে, মূর্তিটা নেই।"

"স্ট্রেঞ্জ! মূর্তিটা স্যার প্যাক করেছিল কারা?"

"এশিয়া ইনস্টিট্যুটের মিস্টার আকাহাশির লোকেরা। কিন্তু আমাদের সিকিউরিটির

লোকেরাও সেখানে ছিল।”

“তারা দেখেছিল স্যার, মূর্তিটা বাক্সে ঢোকানো হয়েছে?”

“সেটাই তো তারা বলছে।”

“পথে গাড়ি কোথাও থামেনি?”

“না। এইটুকু তো পথ, সোজা চলে এসেছে।”

“এখানে যখন ক্রেটটা খোলা হয়, তখন সেখানে কে কে ছিলেন স্যার?”

“আমি ছিলাম, আর আমাদের মিউজিয়ামের কিউরেটর সতীশ কুমার, সেও ছিল।”

“তারপর স্যার?”

“সতীশ সঙ্গে সঙ্গে আকাহাশিকে ফোন করে। আকাহাশি তো শুনে অবাক! সে নিজে অবশ্য প্যাক করার সময়ে ছিল না। কিন্তু যারা করেছে, তারা বিশ্বস্ত লোক। তাছাড়া আমাদের সিকিউরিটির সামনে মূর্তিটা প্যাক করা হয়েছে। আকাহাশির কথায় যে কোনও ভুল নেই, সেটা আমরা জানি।”

বব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে ওঁর ফোনটা বাজল। বিপাশা মিত্রের ঘরে আমাদের ডাক পড়েছে। বব মৃদু হেসে বললেন, “ইউ আর লাকি, মাত্র পনেরো মিনিট বসতে হল।”

ঘড়িতে দেখলাম চারটে বেজে ঠিক পনেরো মিনিট।

বিপাশা মিত্রের ঘরে ঢুকে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে বব বিদায় নিলেন। বিশাল অফিস। বড়সড় একটা এক্সিকিউটিভ ডেস্কের পিছনে বিপাশা বসে আছেন। নিঃসন্দেহে স্টানিং বিউটি। টানটান করে কালো চুল পোনিটেল করে বাঁধা। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। চোখে ফ্যাশানেবল গোল চশমা—তারই ভেতর থেকে চোখদুটো যেন কথা বলছে। গায়ের রঙ ফ্যাটফ্যাটে সাদা নয়, বাদামি ঘেঁষা— একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে বেরোচ্ছে। গায়ে হালকা সবুজ রঙের সিল্ক-টপ। কানে লাল রঙের দুটো বড় বড় রিং, গলায় ম্যাচিং হার। কীসের তৈরি কে জানে!

বিপাশা টেবিলের কয়েকটা কাগজপত্র পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, “হঠাৎ একটা কাজ এসে পড়ায়, আপনাদের কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে হল। রিয়েলি সরি... থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং।”

“কী যে বলেন ম্যাডাম, এত আমাদের প্লেজার।”

“আমাকে বিপাশা বলেই ডাকবেন।”

“ইয়েস, ম্যাডাম।”

“আপনারা দুজনে মিস্টার সেন-এর সঙ্গে কাজ করেন?” বিপাশা আমার আর প্রমথর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

“ওঁরা ছাড়া আমি অচল, ম্যাডাম।” উত্তরটা আমাদের হয়ে একেনবাবুই দিলেন।

“অত্যন্ত খাঁটি কথা,” প্রমথ এবার মুখ খুলল, “বাপি গাড়িতে রাইড দিলেই উনি একমাত্র সচল হন।”

প্রমথর জোকটা বোধহয় মাঠে মারা গেল।

“আই সি” বলে বিপাশা চেয়ার থেকে উঠে অফিসের দরজাটা ভেতর থেকে লক করে এসে বসলেন। তারপর দু-আঙুল দিয়ে কম্পিউটারের মাউসটা ঘোরাতে ঘোরাতে আমাদের তিনজনকে যেন একটু যাচাই করলেন।

“আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, এই ঘরের বাইরে আর কারোর কানে যেন সেটা না যায়।”

ব্যাপারটা যে বেশ গুরুতর বিপাশার গলার স্বরে সেটা স্পষ্ট।
“আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাডাম, আমরা তিনজনের কেউই এ নিয়ে কোথাও আলোচনা করব না।”
আমার আর প্রমথর দিকে সপ্রশ্নে তাকালেন বিপাশা।
আমি বললাম, “আপনার কথা গোপন থাকবে।”
প্রমথও আমার কথায় সায় দিল।
“থ্যাঙ্ক ইউ। আসলে ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট।” কথাটা বলে বিপাশা একটু চুপ করলেন। বুঝলাম কথাটা ভাঙতে এখনো অসুবিধা বোধ করছেন।
“মানে বিষ্ণুমূর্তি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা ম্যাডাম?”
“আমি বিষ্ণুমূর্তির ব্যাপারে আপনাকে ডাকিনি।”
“কিন্তু টেলিফোনে যে বললেন ম্যাডাম...!”
একেনবাবুকে থামিয়ে বিপাশা বললেন, “বিষ্ণুমূর্তিটা চুরি যায়নি, হারিয়ে গিয়েছিল। সেটা এখন কোথায় আমি জানি।”
“আমি একটু কনফিউসড ম্যাডাম, আপনি বলছেন ওটা পাওয়া গেছে, অথচ মিস্টার ক্যাসেল একটু আগে বললেন ওটা অদৃশ্য হয়েছে।”
“তার কারণ আমি চাই না আর কেউ জানুক, কীসের জন্যে আপনাকে ডেকেছি।”
আমরা চুপ।
একটা অস্বস্তিকর নীরবতার পর বিপাশা মিত্র বললেন, “একটা পুরানো ছবি ক’দিন হল খুঁজে পাচ্ছি না।”
ছবি? এটা এত ডেলিকেট ব্যাপার কি করে হয়? বিপাশার কি মাথা খারাপ হয়েছে?
“বড় কোনও আর্টিস্টের?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।
“না, ক্যামেরায় তোলা একটা ফটোগ্রাফ।”
একেনবাবু বোধহয় আর পারলেন না। বললেন, “এ নিয়ে এত সিক্রেসির কী আছে ম্যাডাম?”
কী জানি দেখে বিপাশার ভুরুটা একটু কুঁচকালো। ড্রয়ার খুলে টিস্যু-পেপার বার করে সেটা দিয়ে টেবিলের একটা কোনা পরিষ্কার করে বললেন, “সেলিব্রেটি হবার সমস্যা কি জানেন? এভরিথিং ইন মাই লাইফ বিকামস নিউজ। আমার একটা ফটো চুরি হয়েছে, তার জন্য আপনার মতো একজন বিখ্যাত গোয়েন্দাকে কাজে লাগিয়েছি। সেই চোর সম্ভবত আমারই পরিচিত, হয়তো একটু মজা করার জন্যেই সে ফটোটা চুরি করেছে... আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড টু নো অ্যাবাউট ইট!”
“ইয়েস ম্যাডাম। তবে মনে হচ্ছে ফটোটা একটা অর্ডিনারি ফটো নয়।”
“ইউ আর রাইট। ওটার একটা হিস্ট্রি আছে।”
“ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন ম্যাডাম মানে হিস্ট্রিটা, কী ধরণের ফটো, কোথায় সেটা ছিল, কবে হারাল...।”
“নিশ্চয়,” বিপাশা শুরু করলেন। “আমার ঠাকুরদার বাবা বিজয় মিত্র, ত্রিপুরার মহারাজের, নামটা এখন মনে পড়ছে না, খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ওঁরা দুজনে একসঙ্গে একবার আমেরিকাতে বেড়াতে এসেছিলেন। এই নিউ ইয়র্কেই কোনও একটা লেকের ধারে দু’জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাউকে দিয়ে একটা ফটো তুলিয়েছিলেন। মহারাজ মৃত্যুর আগে ফটোটা একটা খামে পুরে বিজয় মিত্রকে পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটা ঠাকুরদা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন পরে নিজেও আমি পড়েছি।

বন্ধু,
আমার শেষ উপহার□ একটি অমূল্য ধন পাঠাইলাম।

নীচের সইটা অস্পষ্ট, তবে শেষে মাণিক্য কথাটা পড়া যাচ্ছিল। বিজয় মিত্র চিঠি আর ছবি-শুদ্ধ সেই খামটি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে আমার ঠাকুরদাকে দিয়ে যান। বিশেষ করে বলে যান, ওটা যেন কখনো হাত-ছাড়া না হয়। ঠাকুরদার কাছ থেকেই ফটোটা আমি পাই। মারা যাবার কিছুদিন আগে আমাকে ওটা দিয়ে যান। ঠিক ওই একই কথা বলে, 'এটা কখনো হাত-ছাড়া করিস না'।"

"আপনার ঠাকুরদার নাম ম্যাডাম?"

"অজয় মিত্র।"

"আপনার কি কোনও ধারণা আছে, কেন আপনার ঠাকুরদা ওই কথাটা বলেছিলেন?"

"না, কিন্তু অনুমান করতে পারি।"

"কী অনুমান করতে পারেন ম্যাডাম?"

"আমার ঠাকুরদার ধারণা ছিল আমাদের যে এত ধন-সম্পত্তি হয়েছে সেটা ওই ফটোর জন্যে। ইট হ্যাজ ব্রট আস লাক।"

"আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন ম্যাডাম?"

"না। কিন্তু ওই ফটোতে একটা কিছু ছিল, যেটা খুব আন-ইউস্যুয়াল। ফটোতে নয়, ফটোর পেছনে। লাল কালিতে আঁকা কতগুলো সিম্বল, যার মাথামুণ্ডু আমি খুঁজে পাইনি।"

"আপনার মনে আছে সিম্বলগুলো কী?"

"না, কয়েকটা সার্কল আর ট্র্যাঙ্গেলের মধ্যে চাইনিজ জাতীয় কিছু ক্যারেক্টার □ লিট্ল টু কমপ্লিকেটেড।"

"আপনার ঠাকুরদা এ নিয়ে কিছু বলেননি?" এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

"পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন, ওটা স্বয়ং মহারাজের আঁকা, আর ওতে একটা সিক্রেট মেসেজ আছে। ঠাকুরদা যখন মারা যান, আমার বয়স মাত্র বারো। এর বেশি আর কিছু মনে নেই।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। একটা প্রশ্ন ম্যাডাম, আপনার ঠাকুরদা আপনার বাবাকে না দিয়ে ওটা আপনাকে দিয়ে গেলেন কেন?"

"আই ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু হিম। বাবা আর ঠাকুরদার সম্পর্ক শেষের দিকে ভালো ছিল না। যাই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছি□ আমি ওসব সিক্রেট মেসেজ-টেসেজে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে ছবিটার ভ্যালু হচ্ছে পিওরলি সেন্টিমেন্টাল। ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া একটি মাত্র জিনিস, তাই খুবই প্রেশাস।"

"অবশ্যই ম্যাডাম। এবার বলুন, কবে ওটা অদৃশ্য হল?"

"কবে ঠিক বলতে পারব না। আমার ফ্যামিলি অ্যালবামে খামশুদ্ধু ওটা ছিল। কয়েকদিন আগে হঠাৎ ইচ্ছে হল পুরোনো ফটোগুলো দেখি, তখনই খেয়াল করলাম খামটা অ্যালবামে নেই। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো অ্যালবামটা তুলতে গিয়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। কিন্তু আলমারির মধ্যে কোথাও ওটাকে পেলাম না। আমার হাউসহেল্পকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনও খাম দেখেছে কিনা। দেখেনি।" বিপাশা মিত্র একটু থামলেন।

"ম্যাডাম, এটা যে আপনার বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন, সেটা আর কি কেউ জানতেন?"

"কথা প্রসঙ্গে এই ফটোর কথা কয়েকজনকে বলেছি, ফটোটা দেখিয়েওছি।"

"ওর আর কোনও কপি আছে আপনার কাছে?"

"না।"

"ফটোটা কি রঙিন না ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট?"

"রঙিনই, কিন্তু এখনকার কালার ফটোর মতো ব্রাইট নয়। রঙিন ফটো ছিল বোঝা যায়, কিন্তু রঙগুলো সব ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।"

"কত দিনের পুরোনো ফটো ম্যাডাম?"

"তা তো বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদা বেঁচে থাকলে এখন ওঁর বয়স একশো বছর হত। তাঁর বাবার যৌবনকালের ফটো। মনে হয় একশো বছরের মতোই পুরোনো হবে।"

ভাবছিলাম, একশো বছর আগে কালার ফটো ছিল কি না! অজ্ঞতাটা প্রকাশ করলাম না।

"শেষবার এই ফটোটা কবে দেখেছিলেন ম্যাডাম?"

"প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে। আমার এক বন্ধু মায়ের ছবি দেখতে চেয়েছিল। সেটা দেখাতে অ্যালবামটা বার করেছিলাম। খামটা তার মধ্যেই থাকত।"

"আর অ্যালবামটা ম্যাডাম?"

"ফ্যামিলি রুমের আলমারিতে।"

"তালাচাবি দেওয়া আলমারি?"

"না, আলমারিতে কোনও তালা নেই।"

"তারমানে ম্যাডাম যে-কেউ আলমারি খুলে অ্যালবামটা দেখতে পেত?"

"যে-কেউ না।" 'যে-কেউ' কথাটা-র ওপর জোর দিয়ে বিপাশা মিত্র বললেন, "বিশেষ পরিচিত লোক ছাড়া কাউকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই না। খুব পরিচিত দুয়েকজন ছাড়া অন্য যারা ঢোকে তাদের নীচে সিকিউরিটির লগবুকে সই করে ঢুকতে হয়।"

"তারমানে ম্যাডাম এই তিন সপ্তাহে যাঁরা বাড়িতে ঢুকেছেন, তাঁদের সবার নামই জানা যাবে, শুধু আপনার বিশেষ পরিচিত দুয়েকজন ছাড়া।"

"তা যাবে। বিশেষ পরিচিতরা রেস্পেক্টেব্ল লোক, ফটো-চোর নন।"

"না না ম্যাডাম, তা বলছি না। কিন্তু ধরুন তাঁদের মধ্যে কেউ ওই অ্যালবামটা নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসেছিলেন, সেখানে হঠাৎ ফটোটা পড়ে গেল। মানে আমি বলতে চাচ্ছি ম্যাডাম, আপনার ফ্যামিলি রুম ছাড়া অন্য কোনও জায়গাতেও ফটোটা পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।"

"তা পারে," বিপাশা মিত্র একটু চিন্তান্বিত ভাবে বললেন। "তবে ফটোটা তো আলাদা ছিল না, একটা খামের মধ্যে চিঠি শুদ্ধু ওটা ছিল। আর ফটোটাও খুব ছোটো নয় ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি। সেটা পড়ে থাকবে, কেউ দেখবে না বিশ্বাস করা কঠিন।"

"যাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের কারোর সঙ্গে আপনার কোনও গোলমাল বা মনোমালিন্য চলছিল কি?"

বিপাশা মিত্র একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "লেট মি বি ফ্র্যাঙ্ক মিস্টার সেন, এটাই আমার প্রব্লেম। আমার বিশ্বাস চুরিটা যে করেছে সে জানে ফটোটা আমার কাছে খুব প্রেশাস। এটা হারিয়ে গেলে আমি খুবই কষ্ট পাব।"

"আই সি, ম্যাডাম। আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন?"

"গত তিন সপ্তাহে আমার বাড়িতে এসেছে, তাদের মধ্যে তিন জনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা চলছে। এরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাদের কেউ এটা

নিয়ে থাকলে, কী ভাবে জিনিসটা উদ্ধার করব জানি না। সেজন্যেই আপনার সাহায্য দরকার।”

“এই তিনজন কারা ম্যাডাম?”

“দেবরাজ সিং, এডওয়ার্ড রীড আর হ্যারি রেডব্যাঙ্ক। এদের পরিচয়টাও দিয়ে দিই। দেবরাজ নিউ-হেরিটেজ হোটেলগুলোর মালিক, এডওয়ার্ড নিউ ইয়র্ক সিম্ফনির কনডাক্টর, আর হ্যারি হলিউডের প্রডিউসার। তিনজনই আমার বিশেষ বন্ধু, মনোমালিন্যের ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত।”

মনে পড়ল, এই হ্যারি রেডব্যাঙ্ক আর বিপাশা মিত্রকে নিয়েই কিছুদিন আগে পত্রপত্রিকায় খুব হইচই হচ্ছিল। দেবরাজ সিং বা এডওয়ার্ড রীডকে জড়িয়ে বিপাশা মিত্রের কোনও খবর অবশ্য পড়িনি। কিন্তু ওঁরাও বিখ্যাত লোক।

“এঁরা তিনজনই ফটোটার কথা জানতেন?”

“আই থিঙ্ক সো। জোর করে বলতে পারব না, তবে মনে হয় ওদের ফটোটা দেখিয়েছি।”

“এঁরা তিনজনই গত তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন?”

“হ্যাঁ।”

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, একেনবাবু এবার একটু প্যাঁচে পড়েছেন। এঁরা সবাই সেলিব্রেটি□ এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়াই কঠিন ব্যাপার। সাক্ষাৎ না হয় মিলল, কিন্তু তারপর? এঁদের কাছ থেকে চুরি করা জিনিস উদ্ধার হবে কী করে?

“যেখানে আপনার অ্যালবামটা ছিল সেই জায়গাটা কি একবার দেখতে পারি?”

“নিশ্চয়, চলুন।”

আমাদের নিয়ে বিপাশা উপরে পঁচিশ তলায় পেন্টহাউসে গেলেন। ড্রয়িং রুমের পাশে ফ্যামিলি রুম। কী তার সাইজ! আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের মতো বেশ কয়েকটা তার ভিতরে এঁটে যাবে। এক দিকটা পুরো কাচের□ সেখান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক দেখা যাচ্ছে। বাকি দেয়ালগুলোতে দামি উড-প্যানেলিং। বড় বড় যে-সব পেন্টিং ঝুলছে, সেগুলো নিশ্চয় অরিজিনাল। ফার্নিচারগুলোও মনে হয় ঘরের জন্যে স্পেশালি তৈরি করা হয়েছে। দেয়ালের বেশ খানিকটা জুড়ে একটা বিল্ট-ইন বুক-শেলফ। সেখান থেকে তিনি একটা মোটা অ্যালবাম বার করলেন।

“এটাই আমার ফ্যামিলি অ্যালবাম, এইখানে ছিল।”

একেনবাবু অ্যালবামটা একটু উলটে পালটে বুক-শেলফের ভিতরে যখন উঁকিঝুঁকি মারছেন, বিপাশা তখন বললেন, “এর প্রত্যেকটা বই নামিয়ে আমি আর মারিয়া, আমার যে হাউস-হেল্প□ দুজনে মিলে খুঁজেছি, কোথাও কিছু নেই।”

“একটা কথা ম্যাডাম, আপনার হাউস-হেল্প কি জানে যে এটা আপনার কাছে খুব মূল্যবান?”

“আমার যখন আট বছর বয়স, তখন থেকে মারিয়া এখানে আছে□ ওল্ড পর্তুগীজ লেডী, আমাকে মেয়ের মতো দেখে। তাকে সন্দেহ করার কোনও কারণই নেই।”

“আই সি।”

“আর কিছু দেখতে চান?” বিপাশা ওঁর ঘড়ির দিকে তাকালেন। “আমার আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এখন না হলেও পরে দেখাতে পারি।”

“না ম্যাডাম, আপাতত আর কিছু লাগবে না। তবে যে তিনজনের কথা বললেন,

তাঁদের ফোন নম্বরগুলো কি দিতে পারেন?”

“আমি আপনাকে কাল ফোনে জানিয়ে দেব। তবে ঘুণাক্ষরেও আমার কাছ থেকে নম্বর পেয়েছেন জানাবেন না।”

এতো আচ্ছা ফ্যাসাদ! মনে মনে ভাবছিলাম, আমাদের মতো অজানা অচেনার সঙ্গে এঁরা ফোনে কথা বলবেন কেন?

বিপাশা মিত্র বললেন, “আমি জানি, আপনাদের একটা কঠিন কাজ দিচ্ছি, কিন্তু আমি তার জন্য যে কোনও রকম পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি। জাস্ট নেইম ইওর প্রাইস।”

“আগে দেখি ম্যাডাম, কদ্দুর কী করতে পারি।”

সুন্দরীর উপরোধ ফেলা কঠিন, তবে মনে হল একেনবাবু একটু পাশ কাটাবার চেষ্টা করছেন।

“না, না, দেখি নয়, এটা কিন্তু আপনাকে করতেই হবে। ঠিক তো?” আচমকা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বিপাশা মিত্র কথাগুলো বললেন।

হতচকিত একেনবাবু বললেন, “কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমি কল্পনা করিনি আপনি এত চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন!”

“আমার সম্পর্কে আপনাদের কী ধারণা আমি জানি না, তবে পত্রপত্রিকায় যেসব কথা পড়েন, সেগুলো বিশ্বাস করবেন না□ ওগুলো বেশির ভাগই বানানো।”

একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, “হ্যাঁ, ম্যাডাম।”

এবার বেশ গর্ব গর্ব মুখ করে বিপাশা বললেন, “আমি সিকি ভাগ বাঙালি হলেও বাংলা বেশ ভালোই বলতে পারি। ঠাকুরদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমার নামটা ওঁরই দেওয়া। ঠাকুরদার কোলে বসে আমি ঠাকুরমার ঝুলি থেকে সুরু করে টুনটুনির গল্প, রামায়ণ, মহাভারত□ সব শুনেছি। এক সময়ে বাংলায় লিখতেও পারতাম, এখন তেমন পারি না।”

আমাদের বিদায় দেবার আগে, বিপাশা মিত্র একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার একটা কার্ড আছে?”

ভাগ্যিস কয়েকদিন আগে একেনবাবুকে বকেঝকে একটা ভিজিটিং কার্ড করানো হয়েছে। মাত্র কুড়ি ডলার লাগে পাঁচশোটা করাতে□ সেটা খরচ করতেও একেনবাবুর দারুণ আপত্তি। শুধু শুধু এতগুলো টাকা নষ্ট করা স্যার। যাক, এবার সেটা কাজে লাগল। বিপাশার কাছে মুখ রক্ষা হল।

লিফট আসার জন্যে যখন অপেক্ষা করছি, তখন একেনবাবু বললেন, “যে প্রশ্নটা আমার প্রথম করা উচিত ছিল, সেটাই করিনি ম্যাডাম□ যে খামটার মধ্যে ছবিটা ছিল, সেটা কী রকম দেখতে?”

“খুবই পুরোনো ছাই-রঙা চিঠির খাম। খামের উপরের ঠিকানাটা এত অস্পষ্ট, ভালো করে পড়াও যায় না।”

“খামের ওপর স্ট্যাম্প লাগানো ছিল?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“তা একটা ছিল। কিন্তু কী রকম স্ট্যাম্প বলতে পারব না, ভালো করে দেখিওনি।” তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে বললেন, “জানি আপনি কী ভাবছেন... তেমন দামি হতে পারে না, যার জন্যে আমার কোনও বন্ধু চুরি করবে।”

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হাউ ডু ইউ নো? কিন্তু সেটা ভালো শোনাত না, নিজেকে সামলালাম।

বিপাশা বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝলেন। বললেন, "দেবরাজ স্ট্যাম্প চেনে, খুব দামি হলে আমাকে বলত।"

"দাঁড়ান ম্যাডাম, দেবরাজ মানে দেবরাজ সিং? কিন্তু আপনি তো বললেন উনি একজন সাসপেক্ট!"

"ইয়েস, কিন্তু তার কারণটা অন্য কয়েক হাজার ডলারের স্ট্যাম্প নয়। ফ্র্যাঙ্কলি ওই কটা টাকা ওর কাছে কিছুই নয়, আমার কাছেও নয়।"

মনে মনে বললাম, কয়েক হাজার হলে কথাটা হয়তো ভুল নয়, কিন্তু মিলিয়ন ডলারের স্ট্যাম্পও হয়, যেমন, সুইডেনের 'ট্রেসকিলিং ইয়েলো'। এটা একেনবাবুকে পরে জানাতে হবে।

লিফটের দরজাটা খুলল, সবাই উঠলাম। বিপাশা অফিসে যাবেন, আমরা একেবারে নীচে। একেনবাবু বললেন, "আপনার মিউজিয়ামটা আজ দেখা হল না ম্যাডাম।"

"কেন হবে না? আমি মিস্টার কুমারকে বলে দিচ্ছি। উনি আমার মিউজিয়ামের কিউরেটর, দেখিয়ে দেবেন।" বলেই বিপাশা মোবাইলে কাকে জানি ফোন করলেন।

অফিসে এসে লিফটের দরজা খুলতেই বিপাশা বললেন, "আসুন।" অফিসের সামনেই একজন গার্ড টাইপের কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। বিপাশা তাকে বললেন, "এঁদের মিস্টার কুমারের কাছে নিয়ে যাও। আমি ওঁকে ফোন করে দিচ্ছি।"

মিউজিয়ামটা অফিস যে তলায় সেই তলাতেই। তবে একেবারে অন্যদিকে, লিফট থেকে একটু হাঁটতে হয়। মিস্টার কুমার অফিসেই ছিলেন। মনে হল বিপাশার সঙ্গে কথা শেষ করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে এসে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী আমরা দেখতে চাই?

"না স্যার, বিশেষ কোনও কিছু নয়। শুধু ঘুরে ঘুরে একটু আইডিয়া করব, অবশ্য যদি আপনার সময় থাকে স্যার।"

"কী আশ্চর্য, নিশ্চয় সময় আছে। আসুন সবাই," বলে মিউজিয়ামে যা-আছে সবই আমাদের দেখালেন। মিউজিয়ামটা ছোটো, কিন্তু ইন্টারেস্টিং।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা খোলা থাকে কতক্ষণ?"

উত্তরে মিস্টার কুমার জানালেন, "এটা প্রাইভেট কালেকশন, পাবলিকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।"

"তার মানে এগুলো বাইরের কেউই দেখতে পাবে না?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক তা নয়। কোনও স্পেশাল এক্সিবিশন হলে, বড় বড় মিউজিয়াম এখান থেকে এক্সিবিট ধার নিয়ে যায়।"

সুজয় মিত্র, মানে বিপাশার বাবার ইন্টারেস্ট ছিল পাথরের মূর্তি আর রেনেসাঁস পিরিয়ডের পেন্টিং-এ। সারা দেয়াল জুড়ে অজস্র পেন্টিং টানানো। পাথরের মূর্তিগুলোর বেশির ভাগই ইজিপ্ট আর গ্রীস থেকে আনা। কিছু চীন, তিব্বত এবং থাইল্যান্ডের। কম্বোডিয়ার শুধু ওই বিষ্ণুমূর্তিটাই ছিল।

এদিক ওদিক থেকে প্রচুর জিনিস সংগ্রহ করেছেন সুজয় মিত্র, বাদ শুধু ইন্ডিয়া। আমার একটু অবাকই লাগলো। বিপাশার ঠাকুরদা ইন্ডিয়াকে ভালোবাসতেন বলেই

বোধহয় ছেলের এই অহেতুক বীতরাগ। এরকম অনেক সময় ঘটে শুনেছি। কথায় কথায় জানলাম, সুজয় মিত্রের মৃত্যুর পর নতুন কিছুই মিউজিয়ামে যোগ করা হয়নি। বিপাশা মিত্রের মিউজিয়ামের ব্যাপারে কোনও উৎসাহই নেই। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই মিস্টার কুমার কথাটা বললেন।

"তাহলে আপনার এখানে কাজটা কী স্যার?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"যক্ষের ধন পাহারা দেওয়া," মজা করেই কথাটা বলার চেষ্টা করলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "অনেক পুরনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস আছে এখানে, সেগুলো নিয়ে একটু আধটু রিসার্চ করি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে এত কনট্রোভার্সি হল কেন?"

উত্তর যেটা পেলাম, সেটা অস্পষ্ট। পুরোনো জিনিসের ইতিহাস সব সময় সঠিক জানা যায় না, নানা মুনির নানা মত থাকে।

আমরা যখন বিল্ডিং-এর নীচে নেমে এসেছি, তখন দেখলাম বব ক্যাসেল লিফটে ওঠার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা বেরোচ্ছি, উনি ঢুকছেন। তারমধ্যেই একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটা পেলেন?"

প্রশ্নটা এত আকস্মিক। একেনবাবু একটু আমতা আমতা করলেন, "মানে স্যার...।"

"অ্যাডভান্স না নিয়ে কিছু করবেন না, মাই অ্যাডভাইস।" লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

।। ৩।।

শনিবার মে ১৪, ২০১১

বিপাশা মিত্রের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরের দিন যা ঘটল, তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। সকালে কফি খেতে খেতে বিপাশা মিত্রের হারানো ফটো, স্ট্যাম্প এসব নিয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ ডিং ডং বেল। ফোন টোন না করেই এক ভদ্রলোক একেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বছর চল্লিশের বেশি বয়স নয়। চুলগুলো একটু কোঁকড়ানো। মুখে চাপদাড়ি, হাতে কাঙ্গা, গায়ে দামি স্যুট। ভদ্রলোক যেই হোন, এভাবে না জানিয়ে উপস্থিত হওয়াতে আমার বিরক্তি লাগল। একেনবাবু ইতিমধ্যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাধ্য হয়ে বললাম, "ইনিই একেনবাবু।"

মুখে কিছু না বললেও একেনবাবুকে দেখে ভদ্রলোক মনে হল আশাহত। হওয়াটাই স্বাভাবিক, বেঁটেখাটো ক্যাংলা শরীর, খাড়া খাড়া চুল, চোখেমুখে কনফিউসড ভাব। প্রথম সাক্ষাতে একেনবাবুকে দেখে ইম্প্রেসড হতে এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। তবে চট করে সামলে নিলেন, নিজের পরিচয় দিলেন দেবরাজ সিং বলে।

"মাই গড! আপনিই কি স্যার নিউ হেরিটেজ হোটেল চেন-এর মালিক?"

“আপনি আমাকে চেনেন?” ভদ্রলোকের চোখেমুখে বিস্ময়।

“নামে চিনি স্যার।”

“বাঃ, আমিও তো আপনাকে নামে চিনি। বিপাশা, মানে বিপাশা মিত্রের সঙ্গে কাল রাত্রে আমার কথা হচ্ছিল। আপনার অনেক সুখ্যাতি করল। ফোন নম্বর আর ঠিকানাটাও দিল। আমি জানি ফোন না করে হঠাৎ এভাবে আসাটা উচিত হয়নি।”

“কী যে বলেন স্যার, আসুন আসুন, বসুন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ,” দেবরাজ সিং ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে একবার তাকিয়ে সোফায় বসতে বসতে বললেন, “ব্যাপারটা কী জানেন, সাত সকালে একটা জরুরী কাজে এদিকে আসতে হল। আপনার ঠিকানাটা মনে ছিল, কিন্তু ফোন নম্বরটা মনে পড়ল না। ভাবলাম একটু চান্স নিই।”

“বলুন স্যার, কী করতে পারি?”

“এঁরা?” প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমরা।

একেনবাবু সাড়ম্বরে আমার আর প্রমথর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। “এঁরা দু’জন হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, ফিলসফার এবং গাইড। আপনার যা বলার স্বচ্ছন্দে এঁদের সামনে বলতে পারেন।”

“নাইস টু মিট ইউ,” হাত এগিয়ে আমাদের দুজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন দেবরাজ। তারপর আর ভণিতা না করে একেনবাবুকে বললেন, “একটা বিশেষ দরকারে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি খবরের কাগজে পড়েছেন কি না জানি না, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে হোবোকেন-এ একজন ইন্ডিয়ানকে খুন করা হয়েছে। যে খুন হয়েছে সে আমার হোটেলের স্টাফ, অশোক দুবে।”

“এক অশোক দুবের খুন হবার খবর পড়েছি স্যার, কিন্তু উনি যে আপনার হোটেলে কাজ করতেন সেটা জানতাম না।”

“হ্যাঁ, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিল। খুব ভদ্র স্বভাবের, হার্ড ওয়ার্কিং ব্যাচেলার কোনও রকম নেশাফেশা ছিল না, সিম্পল লিভিং আর হাই থিঙ্কিং-এ বিশ্বাসী এক আদর্শ কর্মী।”

দেবরাজ যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখনই মনে পড়ে গেল অশোক দুবে নামটা কেন এত চেনা লাগছিল। গত বছর ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ক্লাব-এর অ্যানুয়াল পার্টি হয়েছিল নিউ হেরিটেজ হোটেলের ‘ইন্ডিয়া গ্রিল’ রেস্টুরেন্টে, সেখানেই অশোক দুবের সঙ্গে পরিচয় হয়। একটা জরুরি ই-মেইলের প্রিন্ট-আউট নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল। ওঁকে বলতেই হোটেলের বিজনেস সেন্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, “উনি কি আপনাদের ইন্ডিয়ান গ্রিল রেস্টুরেন্টটা দেখাশুনো করতেন?”

“রাইট। আপনি কি ওকে মিট করেছেন? বাই দ্য ওয়ে, ও কিছুটা আপনার মতো দেখতে ছিল।”

“তাই নাকি?” একটু অবাকই হলাম। “কিন্তু খুব হেল্পফুল ছিলেন ভদ্রলোক।”

“ইয়েস, হি ওয়াজ। এরকম একটা লোককে কে খুন করতে পারে মাথায় আসছে না। হোবোকেন পুলিশ তদন্ত করছে ঠিকই, কিন্তু ওদের কম্পিটেন্সি নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তার ওপর যে খুন হয়েছে সে এক ভারতীয় ইমিগ্র্যান্ট। ভগবান জানেন কতটা ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজটা করবে।”

দেবরাজের এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার ঠিক মানাও যায় না। আমরা

তিনজনই চুপ করে রইলাম।

দেবরাজ বলে চললেন, "অশোক আমার বহুদিনের কর্মী, ওর খুনি ধরা পড়বে না ভাবতেও পারি না। আমি চাই আপনি একটু দেখুন।"

একেনবাবু ইতস্তত: করে বললেন, "সেটা দেখতে পারলে তো খুশিই হতাম স্যার, কিন্তু এখুনি তো আমি ঠিক সময় দিতে পারব না।"

"একটা খুনের ব্যাপারে আপনি সময় দিতে পারবেন না?" দেবরাজ মনে হল কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"আসলে স্যার, আমি আরেকটা কাজে একটু ব্যস্ত আছি।"

দেবরাজ এক মুহূর্ত চুপ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটা কি বিপাশার?"

"মানে..." একেনবাবু আমতা আমতা করলেন।

"বিপাশার বিষ্ণুমূর্তিটা অদৃশ্য হয়েছে রাইট?"

একেনবাবু চুপ।

"শুনুন, বিপাশার বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া না গেলে পৃথিবী উলটে যাবে না, কিন্তু অশোকের খুনি বা খুনিরা যদি ধরা না পড়ে, সেটা হবে ট্র্যাভেস্টি অফ জাস্টিস।"

"তাতো বটেই স্যার। তবে,...।"

"'তবে' কী?"

"আরও একটা প্রব্লেম আছে স্যার। এসব কাজে পুলিশের সাহায্য লাগে। হোবোকেনের পুলিশ চিফ-কে আমি চিনি, উনি একটু ইয়ে টাইপের। নিউ ইয়র্কে ব্যাপারটা ঘটলে কোনও সমস্যা হত না। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সাহায্য আমি সব সময়ে পাই।"

"পুলিশকে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারব না। কিন্তু আমার হোটেলের চারজন স্টাফ হোবোকেনে থাকে। একজন অশোক-এর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টও শেয়ার করত। ওদের পুলিশ অনেক জেরা করেছে ওরা যা জানে সবই আপনি জানতে পারবেন।"

"তা বুঝলাম, স্যার। কিন্তু...।"

"প্লিজ আর 'কিন্তু' নয়, আমি না হয় বিপাশার সঙ্গে কথা বলব। আমি শিওর এতে ওর কোনও আপত্তি হবে না। শি ইজ সেন্সিবল। ও যদি আপনাকে রিলিজ করে দেয়, তাহলে তো আপনি ফ্রি, তাই না? আপনি যদি চান, এক্ষুনি আমি ফোন করছি।"

"না, না স্যার, ওঁকে এ নিয়ে বিরক্ত করার দরকার নেই। আসলে নিউ ইয়র্কের বাইরের কোনও কাজ আমি সাধারণত করি না। যাক সে কথা, যাঁদের কথা বলছিলেন, তাঁদের তো আপনার হোটেলেই পাব স্যার, তাই না?"

"নিশ্চয়। আপনি যখন বলবেন আমি ওদের সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেব। যতক্ষণ ইচ্ছে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, নো প্রব্লেম। এবার বলুন, কখন আসবেন?"

"আজ সন্ধেবেলায় কি ওঁদের পাব?"

"ইন্দ্র রায়কে পাবেন। ইন্দ্র বাঙালি, আপনাদের দেশের লোক। ওর সঙ্গেই অশোক থাকত। ইন্দ্রও আমার আরেকজন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার।"

"তাহলে আজকেই আসব স্যার, সন্ধের সময়।" বলে একেনবাবু আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কোনও অসুবিধা নেই তো স্যার?"

প্রমথ বলল, "আমি পারব না, কিন্তু গো অ্যাহেড।"

"আমার কোনও অসুবিধা নেই," আমি জানালাম।

"ক'টা নাগাদ আসবেন?" দেবরাজ সময়টা জানতে চাইলেন।

"ধরুন, সাড়ে ছ'টা সাতটার মধ্যে।"

"চমৎকার!" দেবরাজ সিং নিশ্চয় প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। পকেট থেকে একটা খাম বার করে একেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এইটে রাখুন অ্যাস এ রিটেইনার।"

"এটা এখন দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না স্যার।"

"না, না, এটা আমার প্রিন্সিপল। আমি কোনও ফেভার চাই না। আপনি আপনার সময় দেবেন, আমি সেই সময়ের দাম দেব। তাহলে পরে কোনও প্রশ্ন থাকবে না। নিন, ধরুন।"

একেনবাবু খামটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কথা স্যার, কী ভাবে অশোকবাবু খুন হলেন?"

"পুলিশের কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি, তা হল খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে কেউ ওর মাথায় গুলি করেছে।"

"আপনি বললেন বৃহস্পতিবার রাত্রে□ ক'টা নাগাদ?

"এক্স্যাক্ট টাইম বলতে পারব না। পুলিশ আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে কোথায় ছিলাম? তাই ধরে নিচ্ছি ওই সময়ের মধ্যেই খুন হয়েছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।"

"পুলিশ স্যার, কাউকেই সন্দেহ করতে ছাড়ে না। কিন্তু খুনের এই টাইমটা পুলিশ জানল কী করে?"

"আমার কোনও ধারণাই নেই। রাত বারোটার সময় আমি হোবোকেন পুলিশের কাছ থেকে একটা ফোন পাই, অশোকের বডি আইডেন্টিফাই করতে থানায় আসতে বলে। গিয়ে দেখি ইন্দ্র আর কয়েকজন হোটেল স্টাফ ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে সেখানে এসেছে। বডি আইডেন্টিফাই করার পর আলাদা আলাদা করে পুলিশ সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি তখন এত শকড পুলিশকে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করিনি।"

"ভালোই করেছেন স্যার না ঘাঁটিয়ে। তা আপনি কোথায় ছিলেন ওই সময়ে?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"দেয়ার ইউ গো," দেবরাজ সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে একেনবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "নাউ আই নো, আপনাদের এই বন্ধু এককালে পুলিশ ছিলেন। টু দেম□ এভরি ওয়ান ইজ এ সাসপেক্ট।"

"কী যে বলেন স্যার।" একেনবাবু লজ্জা পেলেন।

লজ্জাটা উপভোগ করে দেবরাজ সিং বললেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, বিপাশার বাড়িতে ছিলাম রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। ওর সঙ্গে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরি।"

"বিপাশা ম্যাডাম আর আপনি বোধহয় খুব বন্ধু□ তাই না স্যার?"

"আপনি কি এর মধ্যে রোমান্স খুঁজছেন নাকি? সরি, তাহলে নিরাশ হবেন। ওটা ছিল স্ট্রিক্টলি বিজনেস ডিনার। তবে বিপাশাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। এক সময়ে একটা জয়েন্ট প্রজেক্ট করার কথা ভেবেছিলাম, সেই সূত্রেই আলাপ। আর কিছু জানতে চান?"

"না স্যার, দরকার পড়লে তো আপনার দেখা পাব।"

"নিশ্চয় পাবেন। এই নিন আমার কার্ড□ এতে আমার মোবাইল নম্বরও আছে।" এই বলে দেবরাজ উঠে পড়লেন।

দেবরাজ চলে গেলে আমি বললাম, "এত বড়ো হোটেল চেইন-এর মালিক, দেখে বোঝার উপায় নেই।"

"তা নেই, কিন্তু চালু মাল।" প্রমথ টিপ্পনি কাটল। "সুন্দরী বিপাশা মিত্র রূপের ঝলক দেখিয়ে একেনবাবুকে নাচাতে গিয়েছিল। এ কিন্তু ঠিক জানে বিউটি দেখে পেট ভরে না, টু পাইস পকেটে আসা চাই। হাতে চেক ধরিয়ে বিপাশাকে অন্য লাইনে কেমন শান্ট করিয়ে দিল। ভালোকথা, কত ডলারের চেক?"

একেনবাবু খামটা খুলে লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন, "তিন হাজার।"

"তিন হাজার ডলার অ্যাডভান্স! বাঃ, তার মানে বিপাশার ফটো-চোর ধরা মাথায় উঠল। দেবরাজ যদি সত্যিই ফটোটা চুরি করে থাকে, তাহলে বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।"

"ননসেন্স। দেবরাজ যদি ফটো চুরিও করে থাকেন, সেটা ঢাকার জন্যে নিশ্চয় কাউকে দিয়ে অশোককে খুন করাতে যাননি!"

"তা ঠিক, কিন্তু দেবরাজ যদি সত্যিই ফটোটা বা তোর থিওরিতে মিলিয়ন ডলারের স্ট্যাম্প চুরি করে থাকে, তাহলে এই খুনে ওঁর উপকারই হল।" প্রমথ বলল।

"আমার মনে হয় না দেবরাজ ওই চুরির সঙ্গে জড়িত। ইনফ্যাক্ট, ওঁর সঙ্গে বিপাশা মিত্রের সম্পর্কও খুব খারাপ বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে বিপাশার বাড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ডিনার খেতেন না, আর বিপাশাও দেবরাজকে একেনবাবুর কথা বলতেন না।"

"সেটাই পাজলিং, স্যার," একেনবাবু এবার মুখ খুললেন। "বিপাশা ম্যাডামের নিশ্চয় অজানা নয় খুনের কেস হাতে এলে, সেদিকে আমাকে মন দিতে হবে। এদিকে বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়েছে অছিলায় একটা ফটো খোঁজের কাজে আমায় ডাকলেন, আবার দেবরাজকে আমার কাছে পাঠালেন খুনের তদন্ত করতে... অঙ্কটা স্যার, ঠিক মিলছে না।"

"আপনি সব্যসাচী হয়ে যান না।" প্রমথ গম্ভীরমুখে বলল।

"তার মানে স্যার?"

"সব্যসাচী দু-হাতে খেল দেখাতেন, আপনি দু-ব্রেন দিয়ে খেল দেখান। বাঁ দিকের ব্রেনটা কাজে লাগান দেবরাজের জন্যে। ওই দিকটা সব লজিক্যাল, অ্যানালেটিক্যাল, আর র‍্যাশেনাল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায়। আর ডানদিকটা লাগান বিপাশার কাজে, যেখানে র‍্যান্ডাম, ইনটিউটিভ, হলিস্টিক চিন্তাগুলো কাজ করে। এটা ফালতু কথা নয়, ইন্টারনেট খুলে দেখতে পারেন।"

প্রমথর ফাজলামি মাঝেমাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

।। ৪।।

আমাদের প্ল্যান ছিল সাড়ে ছ'টা নাগাদ নিউ হেরিটেজ হোটেলে যাব। প্রমথ আর আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে অশোক দুবে সম্পর্কে যেসব খবর পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে সেগুলো গুগল সার্চ করে পড়তে লাগলাম। সব জায়গাতেই প্রায় একই খবর। শুধু লোকাল পেপার, 'হোবোকেন উইকলি'-তে সংবাদটা একটু বড় করে পেলাম।

অশোককে গুলি করা হয়েছে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে। খুন খারাবি সাধারণত টাকার জন্যেই

হয়। মাগিং করতে গিয়ে বাধা পেলে ছুরিটুরি চলে, অনেক সময়ে গুলিও। এক্ষেত্রে পকেট থেকে মানিব্যাগ খোয়া যায়নি, যেটা পাজলিং। ডেডবডি পাওয়া গেছে বহু বছর বন্ধ হয়ে থাকা একটা পেপার ফ্যাক্টরির সামনে। সেখানে দিনের বেলাতেও লোকজন থাকে না, রাতে তো কথাই নেই। খানিক দূরে, ফ্যাক্টরির রাস্তা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেই মোড়ে কয়েকটা দোকান আছে। তাদের কর্মচারীদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। গুলির আওয়াজ কেউই শোনেনি। পুলিশ এখন ভাবছে, খুনটা হয়েছে হয়তো অন্য কোথাও, বডিটা শুধু ডাম্প করা হয়েছে ফ্যাক্টরির সামনে।

এই রিপোর্ট কতটা নির্ভরযোগ্য কে জানে! রিপোর্টার কী করে জানল, পুলিশ কী ভাবছে বা না ভাবছে? সে কথা থাক, তবু কিছুটা ইনফরমেশন পাওয়া গেল।

বাইশতলা নিউ হেরিটেজ হোটেল ম্যানহাটানের কলম্বাস সেন্টারের কাছে। ভাবতে ভালো লাগে এরকম একটা ঝা-চকচকে হোটেলের মালিক ভারতীয়। মার্কিন মুলুকে মোটেল ব্যাবসায়ে অবশ্য বহু গুজরাতি রয়েছে। মোটেল হল মোটরবিহারীদের জন্য হোটেল, দূর পথে যেতে অল্প-খরচায় একটা রাত কাটানোর জায়গা। ছোটো ছোটো শহরে হাই-ওয়ের পাশে বা কাছাকাছি এইসব গুজরাতি মোটেলগুলোতে ম্যানেজার, রুম-সার্ভিস, রিসেপশানিস্ট, ক্যাশিয়ার সব ‘অল ইন দ্য ফ্যামিলি’। মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, ওভার-টাইম দিতে হয় না, এমন কি মাইনেপত্র ঠিক মতো না পেলেও হ্যাঙ্গামা হয় না। ওদের সঙ্গে কম্পিটিশনে সাহেবরা পেরে উঠবে কেন। বলা বাহুল্য, সেগুলো আর নিউ হেরিটেজ এক লিগের নয়। নিউ হেরিটেজ হোটেলে থাকতে হলে পকেট ভারী না হলে চলবে না। শুনেছি কয়েকটা সুইট আছে, যেখানে এক একটা রাতের জন্যে কম করে দু-তিন হাজার ডলার লাগে! আমি তো কল্পনাই করতে পারি না কারা থাকে ওখানে! ভারতীয় মালিকানার আরও দুয়েকটা ভালো হোটেল যে নিউ ইয়র্কে নেই তা নয়, কিন্তু এত বড় হোটেল চেন আগে হয়নি। ক্যানাডা, আমেরিকা, মেক্সিকো এই তিনটে দেশ মিলিয়ে মোট বারোটা নিউ হেরিটেজ হোটেল চালু আছে। প্রত্যেকটাই ফাইভ স্টার প্লাস। আরও কয়েকটা খোলা হচ্ছে। নিউ হেরিটেজ হোটেল ইউরোপেও নাকি এবার যাচ্ছে।

নিউ হেরিটেজ হোটেলে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধে প্রায় সাতটা। দেবরাজকে বাইরে কোনও কাজে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু, লবির রিসেপশানিস্টদের সতর্ক করে রেখেছিলেন। আমরা নিজেদের পরিচয় দেওয়া মাত্র রিসেপশন ডেস্কের পিছনে অফিসঘর থেকে ইন্দ্র রায় বেরিয়ে এলেন।

ইন্দ্রর বয়স বেশি নয়, বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। লম্বা চওড়া চেহারা। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। তীক্ষ্ণ নাসা, তার নীচে বেশ পুরু একটা গোঁফ। চুল ছোটো করে ছাঁটা, ঘন ভুরুর নীচে চোখদুটো বেশ বড়। টিপিক্যাল বাঙালি বাঙালি চেহারা নয়। পরিচয় নিয়ে জানলাম ইন্দ্রর মা পাঞ্জাবী, দেবরাজ সিং-এর দূর-সম্পর্কের মাসি। অর্থাৎ দেবরাজ ওঁকে বাঙালি বলে পরিচয় দিলেও উনি হচ্ছেন হাফ-বাঙালি। তবে বড় হয়েছেন কলকাতায়। ইন্দ্র বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, রেস্টুরেন্ট বুকিং-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অনুরোধ করলেন মিনিট দশেক রেস্টুরেন্টে বসতে, তারমধ্যেই ওঁর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

রেস্টুরেন্টে একটা কর্নার টেবিল ফাঁকা ছিল। সেখানে আমাদের বসিয়ে ইন্দ্র চলে গেলেন।

যাবার আগে বলে গেলেন, “চা, কফি, যা-চান অর্ডার করুন, এভরিথিং ইজ অন দ্য হাউস।”

বসতে না বসতেই সারপ্রাইজ, প্রমথ রেস্টুরেন্টে ঢুকছে!

“তোর না কাজ ছিল?” আমি বললাম।

“ছিল, কিন্তু চুকে গেছে। বাড়িতেই যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে ভাবলাম একেনবাবুর যদি কোনও হেল্প লাগে, তোকে দিয়ে তো কিছু হবে না!” তারপর চেয়ার টেনে বসে বলল, “কফি অর্ডার করেছিস?”

“না।”

প্রমথই উদ্যোগী হয়ে সবার জন্য কফি অর্ডার করে একেনবাবুকে বলল, “এর জন্যে কিন্তু আপনাকে চার্জ করব। আপনি এই কেস থেকে গুচ্ছের ডলার কামাবেন, আর কফি খাবেন আমার পয়সায়, সেটা চলবে না!”

“তোর কোনও চিন্তা নেই,” আমি বললাম, “ইন্দ্র বলে গেছে, এভরিথিং ইজ অন দ্য হাউস।”

“ইস্‌স্‌, একটু আগে বলবি তো! আরও দু-চারটে জিনিস তাহলে অর্ডার করতাম!”

“তুই লেট-এ আসবি, তার কুফল কিছু ভোগ করবি না?”

প্রমথ এ নিয়ে আর কিছু বলার আগেই একেনবাবু বললেন, “একটা প্রশ্ন করব স্যার?”

“ইট ইজ এ ফ্রি কান্ট্রি, করুন। তবে উত্তর পাবার গ্যারেন্টি নেই।”

“তুই কি ভদ্রভাবে কিছু বলতে পারিস না?” আমি প্রমথকে ধমকালাম।

“অভদ্রতার কী দেখলি, এটা কি ফ্রি কান্ট্রি নয়? আর একেনবাবুর এই ভড়ং-এর কী দরকার, প্রশ্ন যা করার তা তো করবেনই!”

“আপনি এই প্রমথটাকে সহ্য করেন কী করে?” আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম।

“কী যে বলেন, স্যার। প্রমথবাবু হলেন ডিমের মতো। বাইরের খোলসটাই কঠিন, ভেতরটা কুসুমের মতো নরম।”

“থ্যাঙ্ক ইউ একেনবাবু,” একেনবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার উদ্দেশ্যে প্রমথ বলল, “একেনবাবু লোক চেনেন, তুইই শুধু আমায় চিনলি না।”

প্রমথকে পাত্তা না দিয়ে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী প্রশ্ন ছিল আপনার?”

“কলকাতায় এখন কটা বাজে?”

আমি হিসেব করে বললাম, “এখন এখানে ডে-লাইট সেভিংস চলছে, তার মানে সাড়ে ন'ঘণ্টার ডিফারেন্স। ঘড়িতে এখন সাতটা। তার থেকে আড়াই ঘণ্টা বাদ দিন। তার মানে বিকেল সাড়ে চারটে। এবার দিনকে রাত করে ফেলুন। বিকেল সাড়ে চারটের বদলে ভোর সাড়ে চারটে।”

“এটা দারুণ হিসেব দিয়েছেন স্যার, মাথা দোলাতে দোলাতে একেনবাবু বললেন। আড়াই ঘণ্টা বাদ রাতকে দিন, দিনকে রাত।” তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “এই ডে-লাইট সেভিংস-এর ব্যাপারটা কেন এল বলুন তো?”

“আমি শিওর নই, শুনেছি এনার্জি বাঁচাবার জন্যে এটা শুরু হয়েছিল।”

“তার মানে?”

“বসন্তকালে সূর্য যখন সকাল সকাল ওঠে, তখন ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দিলে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত আলো থাকে। আলো থাকতে থাকতেই অফিস-স্কুল-কলেজ,

দোকানপাট, সবকিছু চলে। অর্থাৎ আলো জ্বালানোর খরচা বাঁচে।"

"ব্যাপারটা বোঝা গেল না স্যার, তার থেকে বসন্তকালে সবকিছু এক ঘণ্টা আগে খুললেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

"তা যায়।"

"তাহলে?"

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই ইন্দ্র এসে হাজির।

কিছু কিছু লোক আছে, যারা বেশি কথা বলতে ভালোবাসে, ইন্দ্র সেই দলে। একটা প্রশ্ন করলে তিনটে প্রশ্নের উত্তর দেন! জানা গেল, ইন্দ্র আর অশোক দুবে ইন্ডিয়াতে ক্লাসমেট ছিলেন। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন একই বছরে। চাকরিতেও ঢুকেছিলেন একসঙ্গে, ওবেরয় হোটেলে ট্রেইনি হিসেবে। কয়েক বছর সেখানে কাজ করে নিউ হেরিটেজ হোটেল গ্রুপ-এ যোগ দেন। অশোক নিউ ইয়র্কে আসেন, ইন্দ্র যান সিঙ্গাপুরের ব্রাঞ্চে।

জিজ্ঞেস করলাম, "সিঙ্গাপুরেও আপনাদের হোটেল আছে?"

"আছে, কিন্তু ওটা নিউ হেরিটেজ হোটেল নয়, নিউ এজ হোটেল। মালিকানা এক, কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে নামটা অন্য। নিউ এজ হোটেল ইন্ডিয়াতেও আছে।"

"সবগুলোতেই 'নিউ' স্যার, বেশ ইন্টারেস্টিং।" একেনবাবু মন্তব্য করলেন। "হেরিটেজ আর এজ— দুটোই তো এমনিতে ওল্ড, কিন্তু নিউ লাগিয়ে কেমন জানি 'নতুন' হয়ে গেছে।"

'নিউ' লাগানোর কারণটা অবশ্য অনুমান করা যায়। নিশ্চয় হেরিটেজ হোটেল অন্য কোনও কোম্পানির নামে রেজিস্টার্ড। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে ইন্দ্র বললেন, এটা দেবরাজদার স্বভাব, সবকিছুতেই একটা টুইস্ট।"

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন স্যার।"

"মানে টুইস্টেড সেন্স অফ হিউমার। আমাদের কফি শপের নাম 'বিফোর এন্ড আফটার'। কফি শপ-এর এরকম নাম কেন বলুন তো?"

আমাদের চোখে বিস্ময় দেখে বললেন। "কারণ, মেইন কোর্স এখানে পাবেন না, পাবেন অ্যাপেটাইজার আর স্ন্যাকস— যা মেইন কোর্সের আগে অর্ডার করা হয়, সেই জন্য 'বিফোর'।"

"এবার বুঝেছি,"প্রমথ বলল, "চা, কফি, আইসক্রিম, কেক— এগুলো অর্ডার করা হয় মেইন কোর্সের পরে, তাই 'আফটার'। ভেরি ক্লেভার।"

এটা কতটা টুইস্টেড হিউমার জানি না, তবে নামটা নিঃসন্দেহে মজাদার।

"আরও শুনুন," ইন্দ্র বলে চললেন, "এখানে সবে জয়েন করেছি। প্রথম দিন দেবরাজদার অফিসে ঢুকে দেখি জানলায় তিনটে মাছি বসে, আর দেবরাজদা হাউসকিপিং-এর ম্যানেজারকে ধমকাচ্ছেন। "কী পরিষ্কার করেন অফিস, সেই তখন থেকে মাছিগুলো বসে আছে!"

ভদ্রলোক দৌড়ে একটা মাছি মারার স্প্রেয়ার নিয়ে জানলায় স্প্রে করলেন। কোথায় কী, কিচ্ছু হল না! ভদ্রলোক অবাক হয়ে আরও কয়েকবার স্প্রে করলেন, মাছিগুলোর নড়ার নাম নেই! তখন দেবরাজদা চটে উঠে বললেন, 'বেরোন তো, আমি দেখছি'। বলতে কি, প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভদ্রলোককে ঘর থেকে তাড়ালেন!

আসলে আঠা দিয়ে দেবরাজদাই কয়েকটা মরা মাছি জানলায় আটকে রেখেছিলেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর, কাগজ দিয়ে খুঁচিয়ে মাছিগুলোকে মাটিতে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, ‘এই রামলাল সব সময়ে বড়াই করে ওর মতো এফিশিয়েন্ট নাকি কেউ নয়, তাই একটু শিক্ষা দিলাম’।”

মনে হল ইন্দ্র ওঁর দেবরাজদার একজন বড় ভক্ত। এ নিয়ে হয়তো আরও গল্প চলত। আমিই প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলাম, “কতগুলো হোটেল আপনাদের?”

“নিউ হেরিটেজ আর নিউ এজ নিয়ে মোট আঠাশটা।”

“চেইনটা যে এত বড়ো জানতাম না।”

“এখন কী দেখছেন, আরও অনেক বড়ো হবে। বিপাশা মিত্রের সঙ্গে একটা ডিল চলছে অনেকদিন ধরে, সেটা হয়ে গেলে ওঁর সঙ্গে জয়েন্টলি আরও পনেরোটা হোটেল খোলা হবে দু’বছরের মধ্যে! বিশ্বাস করবেন, শুধু একটা টু-স্টার হোটেল নিয়ে দেবরাজদা ব্যবসা শুরু করেছিলেন দশ বছর আগে। আজ সেটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! সব নিজের চেষ্টায়□চটপট ডিসিশান নিতে পারেন, রিস্ক নিতে ভয় পান না। রিয়েলি একজন অ্যামেজিং পার্সন!”

“ম্যাডাম আর স্যার বুঝি খুব বন্ধু?” এবার একেনবাবু প্রশ্ন।

“দেবরাজদা আর বিপাশা মিত্রের কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ, স্যার।”

“বন্ধু-শত্রু দুইই। শি ইজ এ টাফ উওম্যান। এই ডিল নিয়ে দেবরাজদা যা হিমসিম খাচ্ছে, তা বলার নয়। অন্যদের কিছু বলে না, কিন্তু মাঝে মধ্যে আমায় দুঃখের কথা বলে।”

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আঠাশ প্লাস পনেরো, তার মানে দু-বছর বাদে দাঁড়াবে তেতাল্লিশটা! সবগুলোই এই ক্লাসের হোটেল, সত্যিই ইমপ্রেসিভ!

যাক সে কথা, এখন ইন্দ্রের কথায় ফিরে আসি। গত বছর ইন্দ্র এখানে চলে আসেন। অশোকের অ্যাপার্টমেন্টে একটা ঘর ফাঁকা ছিল। সেখানেই ইন্দ্র এসে ওঠেন। প্রথমে টেম্পোরারি বন্দোবস্ত হিসেবে। কিন্তু অশোকের আগ্রহে, সেটাই পার্মানেন্ট হয়ে যায়। একথা সেকথার পর একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “অশোকবাবু কি কোনও দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন স্যার?”

“দুশ্চিন্তা? না, তেমন তো কিছু নজরে পড়েনি! মাঝে মাঝে আমাদের সবারই একটু-আধটু মন খারাপ হয়, সেগুলো ধরছি না। তবে হ্যাঁ, টাকাপয়সা নিয়ে ওর একটা সমস্যা চলছিল। তা নিয়ে একটু চিন্তাও ছিল।”

“কী ধরণের সমস্যা স্যার, আপনি জানেন?”

“সমস্যা মানে অশোক যা রোজগার করত, সবই খরচ করে ফেলত। না, না, নিজের জন্য নয়, নানান সৎ কাজে জড়িয়ে ছিল ও। ফলে টাকার টানাটানি প্রায়ই ওর হত।”

“আই সি, ওঁর কোনও শত্রু ছিল স্যার?”

“অশোকের শত্রু? মানুষের উপকার ছাড়া অন্য কিছু তো ওকে করতে দেখিনি। আমাকে ধরুন, চাকরি পেয়েই একটা গাড়ি কিনে ফেললাম। অশোক চাকরি পেয়ে বাড়ি বানাবার প্রজেক্ট নিল। নিজের বাড়ি নয়, অনাথদের জন্যে একটা স্কুল বাড়ি। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের জন্যে প্রায় কিছুই করত না। ওকে দেখে মনে হত কত ক্ষুদ্র মনের লোক আমরা!”

“বরাবরই উনি এরকম ছিলেন স্যার?”

“বরাবর। যখন ছাত্র ছিল তখনও অনাথ-আতুর দেখলে মুভ্ড হত।”

"ওঁর ছেলেবেলা কি খুব কষ্টে কেটেছিল স্যার?"

মনে মনে ভাবছিলাম, শুধু একেনবাবুই এ ধরণের ফালতু প্রশ্ন করতে পারেন!

"নট অ্যাট অল। বড়লোক না হলেও সচ্ছলতার অভাব ছিল না ওদের বাড়িতে। যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। ওদের বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি। ও ছিল আন্টি আর আঙ্কলের একমাত্র ছেলে, চোখের মণি। কালকেই আঙ্কলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওঁর মৃত্যুর খবরে আন্টি এত ভেঙ্গে পড়েছেন, ডাক্তারকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে সামলাতে হচ্ছে।"

"ভেরি ট্র্যাজিক স্যার," একেনবাবু বললেন, "এন্ড কনিফিউসিং।"

"কনফিউসিং?" ইন্দ্র বিস্ময়ভরে তাকালেন।

"মানে অশোকবাবুকে এইভাবে গুলি করাটা। আচ্ছা স্যার, উনি কি ব্যাগে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে ঘুরতেন?"

"না, বেশির থেকে কমই বরং থাকত। আমরা প্রায়েই একসঙ্গে ট্রেনে বাড়ি ফিরতাম কতদিন হয়েছে, রাস্তায় বা ট্রেন স্টেশনে কিছু কিনতে হলে আমার কাছে টাকা ধার নিয়েছে। বাড়ি গিয়েই অবশ্য শোধ দিয়ে দিত। এ নিয়ে আমি ওকে ঠাট্টা করেছি। ও বলত 'পকেটে টাকা থাকলেই আজেবাজে জিনিসে খরচা করতে ইচ্ছে করবে। ধার করতে হলে কেনার আগে সাতবার ভাবব।' পকেটে টাকা না থাকায় ঝামেলাতেও পড়েছে, তবু ক্রেডিট কার্ড করায়নি।"

"বুঝলাম না। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করাও তো ধার করা, ব্যবহার করার আগে সাতবার ভাবতে পারতেন?" প্রমথ বলল।

"ঠিক, কিন্তু সেটা ভার্চুয়াল ধার, কারো কাছ থেকে হাত পেতে পয়সা নেওয়া নয়। তাই ধার করছি বলে মনে হয় না।"

"যেদিন উনি মারা যান স্যার, সেদিন উনি আপনার সঙ্গে ফেরেননি?"

"না, বৃহস্পতিবার আমার ডে অফ। সেদিন অশোক একাই ফিরছিল।"

"আপনি কি জানেন স্যার, অশোকবাবু খুন হয়েছেন আটটা থেকে দশটার মধ্যে?"

"সেটাই শুনলাম। আমি পুলিশের ফোন পাই রাত এগারোটা নাগাদ। অশোক ওর ব্যাগে এমার্জেন্সি কতগুলো নম্বর রেখেছিল। প্রথমেই আমার নম্বর ছিল।"

"আপনি কোথায় ছিলেন স্যার ওই সময়ে মানে আটটা থেকে দশটার মধ্যে?"

"বাড়িতে।"

"একা?"

"না, অশোক ছাড়া আমাদের হোটেলের আরও তিনজন হোবোকেনে থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবার আমার বাড়িতে সবাই তাস খেলতে আসে। কাজ থেকেই সোজা চলে আসে। তার আগেই আমি পিৎসা বা চাইনিজ অর্ডার করে আনিয়ে রাখি। খেয়ে দেয়ে খেলা শুরু করি।"

"ক'টা পর্যন্ত তাস খেলেছিলেন স্যার?"

"পুলিশের ফোন না পাওয়া পর্যন্ত।"

"বৃহস্পতিবার সবাই কখন এসেছিলেন?"

"এক্স্যাক্ট টাইম বলতে পারব না। রাস্তায় ভীড় ছিল বলে এডের একটু দেরি হয়েছিল আসতে, কিন্তু তাও আটটার আগেই এসেছিল।"

"আপনার এই কলিগদের নামগুলো বলতে পারেন?"

"নিশ্চয়। এডের কথা তো বললাম, এড গুয়াঙ্গিয়াল। অন্য দু'জন হল---শেখর পাণ্ডে,

আর জিম ভেস্পি।”
“এঁরা কী করেন স্যার?”
“এড আর জিম আমাদের কিচেন স্টাফ। শেখরদা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে।”
“ট্রেন স্টেশন আপনাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কতদূরে?”
“কাছেই, হাঁটা পথে মিনিট পনেরো“।
“ওঁরা সবাই স্যার আপনার কাছাকাছি থাকেন?”
“জিম আর শেখরদার বাড়ি কাছেই। এড থাকে হোবোকেনের অন্য প্রান্তে। কিন্তু ও ট্রেনে যাতায়াত করে না, গাড়ি নিয়ে যায়।”
“ধরে নিচ্ছি স্যার, সেদিন অশোকবাবু শেখরবাবুদের সঙ্গে এক ট্রেনে ফেরেননি।”
“না, ফিরলে শেখরদা বা জিম দেখতে পেত।”
“আপনারা হোটেল থেকে বাড়ি ফেরেন কখন?”
“নির্ভর করছে ডিউটি কখন। ডে ডিউটি থাকলে ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাড়ে ছ’টা সাতটা।”
“অশোকবাবু এত দেরি করে কেন ফিরছিলেন জানেন?”
“না। তবে অশোককে একটা কাজে বুধবার পেনসিলিভ্যানিয়া যেতে হয়েছিল জানি। বৃহস্পতিবার বিকেলে অফিসে রিপোর্ট করে তারপর বাড়ি ফিরবে বলেছিল। দেরিটা তার জন্য হতে পারে। কিন্তু ওর বডি পাওয়া গিয়েছিল ওল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে, যেটা বাস বা ট্রেন স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে পড়ে না। তাই বুঝে উঠতে পারছি না কেন ওই পথ দিয়ে আসছিল!”
“হয়তো স্যার বাড়িতে আসছিলেন না, কারোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?”
“ওই নির্জন জায়গায়?”
“হয়তো যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রশ্নটা একবার করেছি স্যার, তাও আরেকবার করি... ওঁর টাকাপয়সার সমস্যা কি শুধু সৎকাজ নিয়ে?”
“মাই গড!” একেনবাবু কোনদিকে যাচ্ছেন এবার মনে হল ইন্দ্র বুঝেছেন।
“আপনার ধারণা ওঁকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল? কিন্তু কেন?”
একেনবাবু উত্তর দিলেন না।
ইন্দ্র এবার বললেন, “একটা দুশ্চিন্তার কথা আমি জানি, কিন্তু তার সঙ্গে ব্ল্যাকমেল-এর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর স্কুল বিল্ডিং প্রজেক্ট শেষ করা যাচ্ছিল না টাকার অভাবে সেটা নিয়ে খুব দুর্ভাবনা ছিল। আমি অবশ্য এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। এর আগেও এরকম নানান প্রজেক্ট নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে দেখেছি।”
“কোথাকার স্কুল বিল্ডিং স্যার?”
“তা বলতে পারব না।
“কী ভাবে টাকা পাঠাতেন উনি?”
“তাও বলতে পারব না। মনে হয় ব্যাঙ্ক-ড্রাফট করে।”
“আপনি করতে দেখেননি?”
“না।”
“এসব প্রজেক্টের জন্যে উনি কি কারও কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন স্যার?”
“কার কাছ থেকে নেবে? বন্ধু বলতে তো আমরা। আমাদের কারোরই অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই।”

"টাকা ধার তো অন্য জায়গা থেকেও করা যায়, যায় না স্যার?"

"তা যায়।" ইন্দ্র একটু থতোমতো খেয়ে বললেন।

"এই নিয়ে দেবরাজবাবুর সঙ্গে কি ওঁর কথাবার্তা হয়েছিল?"

"তা হয়েছিল। ও হাজার দশেক ডলার অ্যাডভান্স চেয়েছিল দেবরাজদার কাছ থেকে। আমাকেও একটু তদবির করতে বলেছিল।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে টাকার দরকারটা খুব জরুরি ছিল।"

"হ্যাঁ, সেটা ঠিক।"

"আগে এরকম টাকা জোগাড়ের জন্যে ব্যস্ত হতে দেখেছিলেন?"

"না, তা দেখিনি।

"আপনি কি দেবরাজবাবুকে টাকার কথাটা বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ, দেবরাজদা বলেছিল একটু ভেবে দেখবে।"

"এটা কবেকার কথা স্যার?"

"অশোক মারা যাবার কয়েকদিন আগের কথা।"

"আই সি। বাড়িতে অশোকবাবুর ফোনটোন আসত স্যার?"

"কাজের বাইরে অশোক খুব একটা মিশুকে ছিল না। বাড়িতে এক আধটা ফোনই ওর জন্যে আসত। মিশেল বলে একজন মেয়ে মাঝে মাঝে ফোন করত। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটা ওর গার্লফ্রেন্ড। ইনফ্যাক্ট, আমি একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম, কারণ অশোকের সঙ্গে আমাদের এক কলিগের এক সময়ে বেশ ভাব ছিল। ইন প্যারালাল অশোক আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে সেটা অশোকের মতো ছেলের কাছে আশা করা যায় না। যাই হোক, পরে জানলাম মিশেল কমবয়সী মেয়ে নয়, আশি বছরের এক বৃদ্ধা হোবোকেনের ওয়েস্ট সাইডে গরীবদের জন্যে একটা স্যুপ কিচেন চালান। ওখানে অশোক মাঝেমাঝে গিয়ে সাহায্য করত।"

"আপনাদের সেই কলিগ, যাঁর সঙ্গে অশোকবাবুর ভাব ছিল স্যার, তাঁর নামটা কি?"

"সীমা শ্রীমালী। এখন সে অন্য হোটেলে কাজ করে।"

"এক সময়ে ভাব ছিল বললেন স্যার, তার মানে পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?"

"রাইট। কেন, তার উত্তর আমি জানি না।"

"এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি?"

"না। অশোক আমার বহুদিনের বন্ধু ঠিকই, কিন্তু আমি যেমন মুখে যা আসে বলে ফেলি, অশোক তার সম্পূর্ণ উলটো। ভেরি প্রাইভেট পার্সন।"

"আর কার ফোন আসত স্যার?"

"ওর এক পিসতুতো দিদি ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকে, সে প্রায়েই ফোন করত। তার বিয়ে নিয়ে বেশ সমস্যা চলছিল, অশোককেও সেই দিদির জন্য দুশ্চিন্তা করতে দেখেছি। পিসি-পিসেমশাই দেশ থেকে চলে আসায় সেই চিন্তাটা যায়।"

"আই সি।"

"এছাড়া... ও হ্যাঁ, আরেকটা ফোন আসে... মারা যাবার একদিন আগে। জন সামথিং... লাইনটা খারাপ ছিল, কথাগুলো কেটে যাচ্ছিল। কোনও নম্বরও দেয়নি। অশোক বাড়ি নেই শুনে পরে আবার ফোন করবে বলেছিল।"

"কখন ফোনটা এসেছিল স্যার?"

"এক্স্যাক্ট টাইম বলতে পারব না। সকাল এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে।"

"সেটাতো বুধবার ছিল স্যার?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনি তো একটু আগে বললেন বৃহস্পতিবার আপনার ডে-অফ।"

"রাইট, কিন্তু সেদিন সকালে জ্বর জ্বর করছিল বলে আমি ছুটি নিয়েছিলাম।"

"পরে কি ভদ্রলোক আবার ফোন করেছিলেন স্যার?"

"না, বোধহয় ওর মৃত্যুর খবরটা জেনে গিয়েছিল।"

ইন্দ্রকে এবার একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর বাড়িতে আমরা যেতে পারি কিনা, যদি অশোকবাবুর ঘর থেকে কোনও ক্লু আবিষ্কার করা যায়।

পুলিশ এর মধ্যেই তন্ন তন্ন করে ঘরটা দেখেছে, ইন্দ্র জানালেন। কিছুই পায়নি। তবে আমরা আসতে চাইলে ওঁর কোনও সমস্যা নেই। শুধু কাল হোটেল থেকে ফিরতে ওঁর একটু দেরি হবে, রাত আটটার আগে বাড়ি পৌঁছবেন না।

ঠিক হল, রাত আটটার পরেই আমরা যাব।

ফেরার পথে প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝছেন?"

"বেশ কনফিউসিং স্যার।"

"আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, অশোকের এই টাকার সমস্যা শুধু দান খয়রাত করার জন্যে নয়।"

"তবে কিসের জন্যে?"

"আই ডোন্ট নো। মে বি হি গট ইনটু ড্রাগ্স। পয়সা টয়সা উড়িয়ে পরে ধারকর্জ করে ড্রাগ্স কিনেছে। তারপর পাওনার টাকা দিতে না পারায় খুন হয়েছে। নইলে রাত্রিবেলা ওরকম নির্জন জায়গায় কেন যাবে ও? ড্রাগ্সের কেনাবেচা তো ওসব জায়গাতেই চলে, তাই না?"

একেনবাবু একটু উদাসীন ভাবে বললেন। "কে জানে স্যার, আটোপ্সির রেসাল্টটা তো আমরা জানি না। অ্যাডিক্ট ছিল প্রমাণিত হলে অবশ্য খুনের একটা ব্যাখ্যা খাড়া করা যায়। নেশা বড় বিষম বস্তু।"

"অশোক ড্রাগ অ্যাডিক্ট হলে ইন্দ্র সেটা জানত," আমি বললাম। "এই থিওরি আমি ঠিক মানতে পারি না।"

।। ৫ ।।

বাড়ি ফিরে দেখলাম ফোনের মেসেজ লাইটটা জ্বলছে। মেসেজটা একেনবাবুর জন্য, ফোন করতে বলেছেন একেনবউদি।

আমি আর প্রমথ বহু চেষ্টা করেও একেনবাবুকে মোবাইল ফোন কেনাতে পারিনি। কথাটা তুললেই বলেন, 'কে আর আমায় ফোন করে স্যার। আর রাখলেই তো একটা খরচা।'

প্রমথ মাঝে মাঝে চটে গিয়ে বলে, 'ও, আপনি কনভিনিয়েন্স চাইবেন, কিন্তু তার জন্যে

পয়সা খরচা করবেন না, তাই তো?'

'কী মুশকিল স্যার, আমি তো কনভিনিয়েন্স চাইছি না।'

'আমরা তো চাই। আপনাকে কোনও খবর দিতে হলে, হয় আপনার অফিসে ছুটতে হয়, নয় ফোনে মেসেজ রাখতে হয়। তারপর আশায় থাকতে হয়, যদি আপনি খেয়াল করে মেসেজ চেক করেন। অবশ্য যদি সেটা কেয়ার না করেন, তাহলে অন্য কথা।'

'দেখুন স্যার,' একেনবাবু তখন আমাকে সাক্ষী মানেন, 'প্রমথবাবু জিনিসটা এত ঘুরিয়ে বলেন... আচ্ছা বলুন তো স্যার, আপনারা ছাড়া আমার আর কে আছে এখানে যে কেয়ার করব না?'

'ওসব ছেঁদো কথা ছাড়ুন। ঠিক আছে, আমরাই না হয় আপনাকে একটা মোবাইল উপহার দেব, দায়টা যখন আমাদের।'

'না না স্যার, এবার একটা কিনব।'

এ ভাবেই মোবাইল প্রসঙ্গ শেষ হয়। আজকে একেনবউদির ফোন মিস করায় প্রমথ বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, "দেখলেন, বউদিও আপনাকে ধরতে পারছেন না। এখুনি ফোন করুন। হোপ এভরিথিং ইজ ওকে।"

"করছি স্যার করছি, সেইজন্যেই তো আপনাদের কাছে ইন্ডিয়ার টাইম জানতে চেয়েছিলাম।"

"কী ব্যাপার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

একেনবাবু উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকলেন ফোন করতে। টিপিক্যাল একেনবাবু প্রশ্নের উত্তর দেবার ইচ্ছে না থাকলে, না শোনার ভান করে এড়িয়ে যান।আমি নিজেকে খানিকটা আস্বস্ত করার জন্যেই প্রমথকে বললাম, "নিশ্চয় সিরিয়াস কিছু নয়, একেনবাবু বোধহয় জানেন, কেন ফোন করেছেন।"

প্রমথ উত্তর দিল না। দেখলাম টাইমস পত্রিকা খুলে কী জানি পড়ছে। ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় ৯ টা। আমার মা খুব ভোরেই ওঠেন। ভাবলাম আমিও একটু ফোন করি। অনেকক্ষণ রিং করার পর ফোন ধরল চম্পা। ভুলে গিয়েছিলাম মা দিন কয়েকের জন্যে ছোটোমাসির কাছে বেড়াতে গেছে। আমার গলা শোনা মাত্র চম্পা শুরু করল, 'কিছু হয়নি তো দাদা', 'সব ঠিক আছে তো', 'মাকে কিছু বলতে হবে', ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন।

চম্পা বহুদিন আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। মা যদিও শুনলে রাগ করে, কিন্তু সত্যি শি ইজ নট দ্য শার্পেস্ট নেইল ইন দ্য বাকেট। জাস্ট 'হ্যালো' বলার জন্যে ফোন করেছি, সেটা ওর মাথায় ঢোকাতেই মিনিট পাঁচেক চলে গেল। যখন বাইরে এলাম, তখন প্রমথ টাইম ম্যাগাজিনের একটা পাতা খুলে এগিয়ে দিল।

"কী?"

"পড়ে দেখ। এডওয়ার্ড স্টাইচেন-এর 'পন্ড-মুনলাইট' আবার নিলাম হবে। ২০০৬ সালে ওটা ২.৯ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছিল, এখন কত দাম হবে সেই নিয়ে স্পেকুলেশন চলছে।"

আমি বললাম, "এটা জেনে আমার কী লাভ, আমি তো আর কিনতে যাচ্ছি না।"

"পাতাটা ওলটা না, ইডিয়ট!"

পরের পাতায় পন্ড-মুনলাইটের ফটো। একটা পুকুরের উলটো পারে কতগুলো গাছ, আর তার ফাঁক দিয়ে চাঁদ হয় ডুবছে নয় উঠছে। ১৯০৪ সালে তোলা রঙিন ফটো, রঙগুলো অবশ্য চাপা। ফটোটা যখন দেখছি প্রমথ বলল, "আমি ভাবছি বিপাশা মিত্রের

ফটোটার কথা। মনে আছে, কী ডেসক্রিপশন দিয়েছিল চুরি যাওয়া ফটোটার?”

“লেকের সামনে দাঁড়ানো দু’জনের ফটো।”

“রাইট। রঙিন ছবি, কিন্তু এখনকার মতো ব্রাইট রঙিন নয়। আর লেক না হয়ে ধর, সেটা ছিল পুকুর। এবার পন্ড-মুনলাইট ফটোতে দুটো লোককে দাঁড় করিয়ে দে।”

“তুই ভাবছিস ত্রিপুরার মহারাজ স্টাইচেনকে দিয়ে নিজেদের ফটো তুলিয়েছিলেন ওই একই পুকুরের সামনে? হতে পারে না বলছি না, কিন্তু হবার সম্ভাবনা খুবই কম।”

“কেন? যদি মনে করি, মহারাজ ছিলেন স্টাইচেনের বন্ধু। তিনজনে বেড়াতে গিয়ে ওই পুকুরের সামনে দুটো ফটো তুলেছিলেন। তারমধ্যে একটা ‘পন্ড-মুনলাইট’ স্টাইচেন রেখে দিয়েছিলেন। আর অন্যটা, যেটাতে মহারাজ আর বিজয় মিত্র ফ্রেমের মধ্যে ছিলেন, সেটা মহারাজকে দিয়েছিলেন। সেটা সত্যি হলে বিপাশা মিত্র ফটো ফিরে পেতে কেন এত আকুল, তার কারণটা ক্লিয়ার হয়।”

“তা হয়, কিন্তু সেরকম কোনও ফটোর কথা কি এখানে লিখেছে?”

“না, আর সেইজন্যেই ওটা মহামূল্য। এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে নিশ্চয় বলতে পারবে দুটো ফটো একই ক্যামেরায় তোলা কি না। আমি কী ভাবছি জানিস, এই পরীক্ষাটা বিপাশা হয়তো আলরেডি করিয়েছেন। হয়তো ঠিকও করেছিলেন ফটোটা নিলামে দেবেন। এখন খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন ওটা মিসিং!”

এটা প্রমথর অবিশ্বাস্য কল্পনা না হলে, ফটোটা যে কেউই চুরি করতে পারে। আর সেটা বিপাশাকে কষ্ট দিতে নয়, নিজেরা লাভবান হতে। প্রশ্ন, বিপাশা কথাটা একেনবাবুকে খুলে বললেন না কেন? তিনজন সাস্পেক্টের নামই বা দিলেন কেন? যদি না ফটোটা যে এডওয়ার্ড স্টাইচেন-এর তোলা□ বিপাশা শুধু এই তিনজনকেই বলে থাকেন।

এরমধ্যে একেনবাবু ফোন সেরে এলেন। মুখটা একটু খুশি খুশি।

“কি ব্যাপার, বউদি কী সুখবর দিলেন?” জিজ্ঞেস করলাম।

“আপনারা ঠিকই বলেন স্যার, এই ইন্টারনেট একেবারে ট্রুলি অ্যামেজিং।”

“এত ক্রিপ্টিক্যালি কথা না বলে একটু বুঝিয়ে বলুন।” প্রমথ টাইম ম্যাগাজিনটা আমার হাত থেকে নিতে নিতে বলল।

“আমি কাল অনলাইনগিফ্ট.কম-এ গিয়ে ফ্যামিলিকে ফুল আর কেক পাঠাতে বললাম, আজ সকালেই ওদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে গেছে, ৯-টার সময় ডেলিভারি দেবে।”

একেনবাবু বউদিকে ফ্যামিলি বলেন। প্রথম দিকে বুঝতেই পারিনি কার কথা বলছেন! সাধারণত ওয়াইফ, স্ত্রী বা ওল্ড ফ্যাশন্ড মিসেস শুনে আমি অভ্যস্ত। কয়েকবার কথাটা শোনার পর কানেকশনটা ক্লিয়ার হয়েছিল। অনেক চেষ্টা সত্বেও ওঁর ফ্যামিলি বলার হ্যাবিটটা পাল্টাতে পারিনি।

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, “বউদিকে ফুল আর কেক□ব্যাপারটা কী?”

“আজ স্যার, আমাদের টেন-ইয়ার অ্যানিভারসারি।” একেনবাবু সলজ্জ মুখে জানালেন।

“কংগ্রাচুলেশনস, কিন্তু আমরা বাদ পড়ছি কেন? বউদি না হয় এত বছর আপনাকে সহ্য করেছেন, কিন্তু আমি আর বাপিও তো কম দিন আপনাকে সহ্য করছি না!”

“কী যে বলেন স্যার, আপনাদের তো খাওয়াব আমি ঠিকই করেছি।”

“আহা, এসব সদিচ্ছার কথা শুনতেও ভালো লাগে, কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডসে নিয়ে গিয়ে সস্তায় সারবেন না।”

"আপনি যেখানে চান নিয়ে যাবেন, প্রমথর কথায় কান দেবেন না।" আমি ওঁকে আশ্বস্ত করলাম।

"না না স্যার, আপনাদের 'বুখারা গ্রিল'-এ নিয়ে যাব। ফ্যামিলিই বলল, আপনাদের ভালো কোথাও খাওয়াতে। ও আপনাদের দু'জনকে যা ভালোবাসে!"

"বাসবেন না কেন, বউদি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী," প্রমথ বলল। "শুধু বুঝি না, কেন আপনার মতো লোককে বউদি বিয়ে করলেন? যাক গে, দশ বছরের পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। কখন খেতে যাব?"

"পরশু, স্যার। কালকে সন্ধ্যাবেলায় তো আমরা ইন্দ্রবাবুর বাড়ি যাচ্ছি। আপনি ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কাকে ফোন করুন, ওঁকেও তো ফ্রি থাকতে হবে।"

"ফ্রান্সিস্কাও ইনভাইটেড?"

"কী যে বলেন স্যার, আপনাকে খাওয়াব, কিন্তু ম্যাডামকে খাওয়াব না □ সেটা হয় নাকি?"

ফ্রান্সিস্কা সুইটজারল্যান্ডের মেয়ে, প্রমথর গার্লফ্রেন্ড। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতেই পিএইচ ডি করছে। ও আবার একেনবাবুকে খুব পছন্দ করে।

"সেটা আমি ম্যানেজ করছি, কিন্তু 'বুখারা গ্রিল'-এ ভীষণ ভিড় হয়, আপনি আগে থেকে রিজার্ভেশান করে রাখুন। শেষে রিজার্ভেশান পেলাম না বলে ফালতু জায়গায় নিয়ে যাবেন না।"

একগাল হেসে একেনবাবু বললেন, "রিজার্ভেশান আমি করে রেখেছি ইন অ্যান্টিসিপেশান স্যার। তবে এর মধ্যে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে, ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কার হেল্প লাগবে।"

"কী ঝামেলা?"

"নীলাকে ইংরেজিতে কী বলে স্যার?"

"নীলা! মানে পাথরের কথা বলছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, স্যার।

"ব্লু স্যাফায়ার।"

"ওটা কিনতে হবে। ফ্যামিলি খুব ধরেছে।"

"আপনি মশাই সামথিং," প্রমথ বিরক্ত স্বরে বলল। "এদিকে মোবাইল ফোন কিনবেন না, কিন্তু ব্লু স্যাফায়ার কিনতে অসুবিধা নেই। যাই হোক, পরশু খাওয়াচ্ছেন, তাই আর গালমন্দ করব না। তা হঠাৎ নীলার দরকার পড়ল কেন?"

"আসলে স্যার, আমার শনির দশা শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত বছর খুব বাজে যাবে। ফ্যামিলির বাড়ির জ্যোতিষী বলেছেন নীলা ধারণ করলে সেটা কেটে যাবে। নীলা স্যার দারুণ জিনিস□ প্রচণ্ড পাওয়াফুল।"

"এসব বুজরুকি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"কী যে বলেন স্যার, জ্যোতিষশাস্ত্র বলে কথা, তার ওপর ফ্যামিলির হুকুম□ না মেনে যাই কোথায়?"

"তা মানি," প্রমথ বলল। "বিশেষ করে বিপাশা মিত্রের নজর যখন আপনার ওপর পড়েছে, তখন আপনার একটু সাবধান হওয়াই ভালো। এটা দেখেছেন?" বলে টাইম ম্যাগাজিনের পাতাটা খুলে একেনবাবুকে এগিয়ে দিল।

একেনবাবু পড়ে বললেন, "মাই গুডনেস স্যার, একটা ফটোগ্রাফ এত দামে বিক্রি হয়?"

"একটু আগে বাপিকে বলছিলাম, বিপাশা মিত্র ছবিটার যা ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এর তফাৎ হল দু'জন লোক শুধু ছবিতে নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ফটোটা ফেলনা নয়।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

"এক্স্যাক্টলি। দেখতেই পাচ্ছেন দুটো সম্ভাবনা হয় দামি ফটো, নয় দামি স্ট্যাম্প। অশোক দুবেকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিপাশা মিত্রের সমস্যাটার সমাধান করুন কদিন বাদেই তো সুন্দরী ফোন করবেন।"

"সেই জন্যেই স্যার নীলাটা দরকার। এই শনির দশার জন্যেই বোধহয় মাথাটা ঠিক খেলছে না।"

।। ৬।।

রবিবার মে ১৫, ২০১১

হোবোকেনে রওনা হবার একটু আগে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে একেনবাবুর ফোন এল। অকারণে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ফোন করেন না।

"কী বললেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অশোকবাবুর পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটার জন্যে ওঁকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম। সেটা পেয়েছেন। কিন্তু একটা স্যাড নিউজ দিলেন স্যার, বব ক্যাসেল মারা গেছেন।"

"বব ক্যাসেল! মানে বিপাশা মিত্রের সেক্রেটারি?"

"হ্যাঁ স্যার, সম্ভবত সুইসাইড।"

"কিন্তু বব ক্যাসেলের খবরটা হঠাৎ আপনাকে দিলেন কেন?"

"বিপাশা মিত্রের অফিসে বব ক্যাসেলের সঙ্গে হয়তো আমাদের পরিচয় হয়েছে স্যার, এই ভেবে। বিপাশা মিত্র তো আমাদের ডেকেছিলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের রেকমেন্ডশনে।"

নিউজটা এত আকস্মিক, আমাদের কারোর মুখেই কোন কথা নেই। আমি একটু বাদে জিজ্ঞেস করলাম, "'সম্ভবত' সুইসাইড মানে? ওঁর কি ধারণা এটা খুনও হতে পারে?"

"এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সময় লাগে স্যার।"

"কী করে মারা গেলেন?"

"হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে লাফ দিয়ে।"

"মাই গড! কোন জায়গায়?"

"থার্ড অ্যাভেনিউ আর ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিটের কাছাকাছি।"

"আপনার সাহায্য চাইলেন নাকি?"

ম্যানহাটানে আমাদের দেশের কেউ খুন হলে, অনেক সময়ে কনসাল্টেন্ট হিসেবে একেনবাবুর ডাক পড়ে। কালচারাল অ্যাঙ্গেল থেকে কিছু কিছু বিচার বিবেচনা এসে

পড়তে পারে সমস্যার সমাধানে। এক্ষেত্রে তার অবশ্য কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রমথ শুধু বলল, "আশাকরি খুন নয়, খুন হলে...।" বলে চুপ করল।

"খুন হলে কী?"

"কে জানে, হঠাৎ মনে হল এর সঙ্গে বিপাশার ফটো চুরি জড়িয়ে নেই তো?"

এলোমেলো কিছু কথা হল এই নিয়ে।

"বিপাশা নিশ্চয় খুব আপসেট। কালকে ওকে একটা ফোন করা উচিত আপনার," আমি একেনবাবুকে বললাম। "তাছাড়া অন্য দু'জন সাসপেক্টের ফোন নম্বরও তো আপনাকে ওঁর দেবার কথা।"

"অবশ্যই স্যার, অবশ্যই।"

হোবোকেনে আমরা গাড়ি করেই গেলাম। রবিবার সন্ধ্যে সাতটা, লাকিলি রাস্তায় আজ ভিড়টা একটু কম। আমাদের বাড়ি থেকে হোবোকেনে যাবার সবচয়ে সহজ রাস্তা হাডসন নদীর নীচ দিয়ে হল্যান্ড টানেল ধরা। টানেলের মুখ প্রায় সবসময়েই একটু জ্যাম থাকে, তাই হাতে একটু সময় নিয়েই বেরিয়েছি। কিন্তু আজকে দেখি টানেলের মুখ ফাঁকা, বলতে গেলে সাঁ করে বেরিয়ে গেলাম। আটকা যেটা পড়লাম সেটা টানেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে মেইন বুলেভার্ডে ঢুকে। রাস্তায় কিছু কাজ হচ্ছে বলে একটা লেন বন্ধ। তাও আটটার অনেক আগেই হোবোকেনে পৌঁছে গেলাম।

ইন্দ্রকে আটটার আগে পাওয়া যাবে না। একেনবাবু বললেন, "চলুন স্যার, অশোকবাবু যেখানে খুন হয়েছেন, সে জায়গাটা একটু দেখা যাক।"

রাস্তার নামটা মনে ছিল। আমার গাড়িতে একটা জিপিএস আছে। সেখানে রাস্তার নাম ঢুকিয়ে দিলে, কম্পিউটার ভয়েস-এ ডিরেকশন পাওয়া যায়। বাঘের বাচ্চা টেকনোলজি, খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হল না।

বহু বছর ধরে অবহেলিত নির্জন রাস্তা, ওয়ান-ওয়ে। এক দিকে একটা পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি। দুটো উঁচু শেড, সঙ্গে লাগোয়া বিল্ডিং। বিল্ডিং-এর পলস্তারাগুলো জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে। জানলাগুলোর কাচ বেশির ভাগই ভাঙ্গা। পুরো চত্বরটা ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে তালা দেওয়া লোহার গেট। এককালে রঙ বোধহয় সবুজ ছিল। মরচে ধরে এখন সবুজত্বের প্রায় কিছুই নেই। রাস্তার উলটো দিকে ভাঙাচোরা কংক্রিটের পার্কিং লট। সেটা কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। ফাটা কংক্রিটের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এখানে সেখানে আগাছা গজিয়েছে। চতুর্দিকে প্ল্যাস্টিক, ভাঙ্গা কাচ, বিয়ারের বোতল, কাগজ আর হাবিজাবি জিনিস ছড়ানো। পার্কিং লটের পাশে বেশ কয়েকটা দোকান এককালে ছিল। এখন সবগুলোই উঠে গেছে। দোকানগুলোর দরজা-জানলা প্লাইউডের বোর্ড দিয়ে ঢাকা। তার উপর চিত্রবিচিত্র নানা রঙের গ্র্যাফিতি। বোর্ডগুলোরও জরাজীর্ণ অবস্থা, দুয়েকটা প্রায় খুলেও এসেছে। আটটা এখনো বাজেনি। মে মাসের মাঝামাঝি বলে সূর্য অস্ত যায়নি, চারিদিকে যথেষ্ট আলো। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরলাম। ভাবছিলাম রাস্তার ধারে যদি কোথাও রক্তের দাগ থাকে। আর কিছু না থাক, পুলিশের আঁকা চকের মার্কিং থাকবে। কিছুই না, ক'দিন আগে এখানে একটা খুন হয়ে গেছে, তার কোনও চিহ্নই নেই। একেনবাবু দেখলাম লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারছেন।

"কী খুঁজছেন?"

"কিছু না স্যার, চলুন যাওয়া যাক প্রায় আটটা বাজতে চলল।"

আমি যাবার জন্যে রেডি। এতক্ষণ এখানে আছি, এর মধ্যে একটা গাড়িও এখান দিয়ে যায়নি! চারিদিকে একটা থমথমে ভাব কী জায়গারে বাবা!

যখন গাড়িতে উঠছি তখন দেখি পার্কিং লটের পাশে পরিত্যক্ত দোকানগুলোর পেছন থেকে একটা লোক আমাদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে আসছে। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, চুলে চিরুনি পড়েনি বহুদিন, গায়ে নোংরা সার্ট, প্যান্টটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। লোকটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। হাতে খয়েরি কাগজে ঢাকা একটা বোতল। সেখান থেকে এক ঢোঁক খেয়েও নিল। নিশ্চয় ভাঙা দোকানগুলোর পেছনে বসে এতক্ষণ মদ্যপান করছিল।

প্রমথ ফাজলামি করল, "একেবারে জনশূন্য নয়। কথা বলবি নাকি লোকটার সঙ্গে? মনে হচ্ছে আই-উইটনেস হতে পারে!"

"তুই বল," গাড়ি স্টার্ট করে লোকটাকে যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, 'হেই' বলে চেঁচিয়ে জানলায় দুয়েকটা থাবড়া মারল। মাতালের সঙ্গে ঝগড়া করার কোন অর্থ হয় না। একেনবাবু দেখলাম পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন। প্রমথকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন স্যার, দোকানগুলোর পেছনে?"

আমরা যে অ্যাঙ্গেলে আছি সেখান থেকে দোকানগুলোর পেছন ভালোভাবে দেখা অসম্ভব। আমি বললাম, "দেখতে পান বা না পান, আমি গাড়ি থামাচ্ছি না।"

ইন্দ্রের বাড়ি গাড়ি করে পৌঁছতে প্রায় মিনিট দশেক লেগে গেল। হোবোকেনের বাস-সার্ভিস সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। কাছাকাছি বাস না পেলে ওই ভাঙাচোরা ফ্যাক্টরি থেকে হাঁটা পথে বাড়িতে আসতে অশোকবাবুর অনেক সময় লাগত। কেন উনি ওরকম নির্জন জায়গায় গিয়েছিলেন কে জানে? মনে হয় মৃত্যু রহস্যটা সেখানেই লুকিয়ে আছে।

ইন্দ্রদের বাড়িটা পুরোনো, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারতলার ওপরে একটা টু-রুম ফ্ল্যাট। একটা বসার ঘর, তার সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট কিচেন। বসার ঘর থেকে একটা প্যাসেজ চলে গেছে ভিতরের দিকে। তার দু'পাশে দুটো বেডরুম। প্যাসেজের শেষে একটা কমন বাথরুম। বসার ঘরটা একেবারে ছবির মতো সাজানো। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলে প্রথমেই চোখ পড়বে কফি টেবিলে ডাঁই করে রাখা নিউ ইয়র্ক টাইমস, আধ-খাওয়া কফির কাপ, যত্রতত্র কাগজের টুকরো, কোকাকোলার খোলা ক্যান,...। আমরা সবাই এর কন্ট্রিবিউটার, তবে একেনবাবু নিঃসন্দেহে আমাদের লিডার।

আমি তো বসার ঘর দেখে মুগ্ধ। বলেই ফেললাম, "আপনার অ্যাপার্টমেন্ট খুব গোছানো।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

ইন্দ্র আমাদের জন্যে কফি বানানোর চেষ্টা করছিলেন, সবাই মিলে নিরস্ত করলাম। বেশি সময় নষ্ট না করে অশোকের ঘরটা দেখে চলে যাব।

অশোকের বেডরুমে ফার্নিচার বলতে একটা টুইন সাইজের বেড, চেস্ট অফ ড্রয়ার্স আর পড়ার টেবিল। চেস্ট অফ ড্রয়ার্স-এর ওপর দুটো বুক-এন্ড-এর মধ্যে বেশ কয়েকটা বই। টেবিলটা বেশ বড়। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ওয়েবক্যাম লাগানো বিশাল কম্পিউটার মনিটর। তার এক দিকে ক্রিস্টালের একটা সুন্দর ফুলদানি। অন্য পাশে

বয়স্ক দম্পতির ফ্রেমে বাঁধানো ফটো, সম্ভবত অশোকের বাবা-মা। এই সাইজের মনিটর বা ক্রিস্টালের ফুলদানি খুব একটা সস্তা নয়। আমি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ইন্দ্র বলল, "কম্পিউটার আমরা হোটেল থেকে পাই।"

"ফুলদানিটা মনে হচ্ছে ক্রিস্টালের তাই না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, এটা ক'দিন আগে বিপাশা মিত্র অশোককে উপহার দিয়েছিলেন ওঁর একটা পার্টি অশোক খুব ভালো ভাবে অর্গানাইজ করেছিল বলে।"

"আপনারা বিপাশা মিত্রকে চেনেন?" আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"চিনি মানে কাজের সূত্রে। ওঁর অনেক পার্টি আমরা অর্গানাইজ করি। গতবারের পার্টি অশোক করেছিল। অশোক অবশ্য ঝিনচাক্ পার্টি পছন্দ করে না। কিন্তু বিপাশা মিত্র সেটাই চেয়েছিলেন বলিউড স্টাইলের পার্টি, মানি নো অবজেক্ট। অশোক হল প্রফেশানাল। নিজের রুচির সঙ্গে না মিললেও মোস্ট গ্ল্যামারাস একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছিল। হলিউডের বেশ কয়েকজন সেলিব্রেটি এসেছিলেন।"

"কতদিন আগে ওই পার্টিটা হয়েছিল স্যার?" একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"এই সপ্তাহ তিনেক হবে।"

"বব ক্যাসেলকেও আপনি নিশ্চয় চেনেন স্যার?"

"চিনি, তবে তেমন করে নয়।"

"অশোকবাবু চিনতেন?"

"খুব ভালো করে। বিপাশা মিত্রের পার্টির ব্যাপারে অশোকের প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট ছিলেন উনিই। সেই সূত্রেই এক আধবার আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। আপনারা চেনেন বব ক্যাসেলকে?"

"অল্পই স্যার।" বলে আর কিছু বললেন না একেনবাবু। মনে হল একেনবাবু ওঁর মৃত্যুর খবরটা দিতে চান না। আমরাও ব্যাপারটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না।

পুলিশ যে জিনিসপত্রগুলো লণ্ডভণ্ড করেছে সেটা বোঝা যায়। বিশেষ করে চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ভিতরে সবকিছুই ওলট-পালট। ওপরে বইগুলো স্থানচ্যুত হয়নি ঠিকই, কিন্তু সাজানো অবস্থাতেও নেই কয়েকটা আপসাইড ডাউন, মনে হয় পুলিশের বাংলা না জানার ফল। বিছানাটা শুধু পরিষ্কার করে পাতা। বেড-কভার টান টান। ওগুলোতে হয় পুলিশ হাত দেয়নি অথবা পরে ঠিক ঠাক করেছে।

একেনবাবু বিছানার তোশকটা তুলে তুলে দেখলেন নীচে কিছু আছে নাকি। বইপত্রগুলো একটু ঘাঁটলেন। ইন্টারেস্টিং তেমন কিছু আমার চোখে পড়ল না। হোটেল ম্যানেজমেন্টের গোটা দুই বই, ক্রস-ওয়ার্ড পাজল-এর বেশ মোটা একটা বই, আর যে দুয়েকটা ইংরেজি বই ছিল, সেগুলো মনে রাখার মতো নয়। তবে 'ব্যোমকেশ সমগ্র' আর ফেলুদার কয়েকটা বই ছিল। অশোক বোধহয় 'ব্যোমকেশ সমগ্র' পড়ছিল, বইয়ের মাঝামাঝি পেজমার্ক করার জন্যে একটা কার্ড গোঁজা। একেনবাবু সেটা বার করে পড়লেন। অশোকের কোম্পানির দেওয়া কার্ড, কিন্তু তাতে ওর নিজের পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেসও কালি দিয়ে লেখা। অ্যাড্রেসটা বেশ মনে রাখার মতো ashoknhhny@hotmail.com। হটমেল-এ অজস্র অশোক আছে, তাই এই লেজুড়। নামের পেছনে সংক্ষেপে নিউ হেরিটেজ হোটেল নিউ ইয়র্ক দিয়ে নামটাকে একমেবাদ্বিতীয়ম করা হয়েছে। একেনবাবুকে কার্ডটা রেখে দিচ্ছিলেন, কী ভেবে ওটাকে পকেটে পুরলেন। একেনবাবু যখন ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন, তখন আরেকটা বই আমার চোখে

পড়ল, ‘হাউ টু প্লে পোকার’। বইটার পাতা উলটে দেখলাম ওটা অশোককে দেওয়া এড গুয়াঙ্গিয়ালের উপহার।

আমি পাতাটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ইন্দ্র বললেন, “আমরা অশোককে দলে টানার চেষ্টা করছিলাম। তাই এড বইটা এনে ওকে দিয়েছিল।”

“পোকার বাজি রেখে খেলতে হয় না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

প্রশ্নটাতে ইন্দ্র একটু যেন বিচলিত। “আমরা মাত্র দু-এক পয়সা বাজি রাখি, খেলার শেষে পাঁচ দশ ডলারের বেশি কেউ জেতে না।”

প্রমথ বলল, “চিপসের বদলে পয়সা ব্যবহার করলেও সেটা কিন্তু গ্যাম্বলিং। নিউ জার্সিতে এটা কি লিগ্যাল?”

প্রশ্নটাতে ইন্দ্র একটু নার্ভাস হয়ে গেলেন। “এড তো বলল, অল্প বেটে কোনও অসুবিধা নেই। ওর কাছেই আমি পোকার খেলতে শিখেছি।”

“তা শিখুন, কিন্তু অল্প-প্রেগনেন্ট বলে কোনও কথা নেই, হয় প্রেগনেন্ট কিংবা নয়। সেরকম অল্প-গ্যাম্বলিং বলে কোনও কথা নেই, অল্প-গ্যাম্বলিংও গ্যাম্বলিং। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন। দু-চার পয়সার জন্যে হাজতবাস করবেন কেন?”

প্রমথটার সত্যি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। চেনা হোক, অচেনা হোক অকারণে মানুষকে ঘাবড়ে দিতে ভালোবাসে। ইন্দ্রের মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল।

আমি ইন্দ্রকে ভরসা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই ড্রয়ারগুলো বন্ধ করতে করতে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, “এখান থেকে কি কোনও জিনিস পুলিশ নিয়ে গেছে স্যার?”

“তা তো বলতে পারব না। যখন পুলিশ এসেছিল, তখন আমি ছিলাম না, দেবরাজদা ছিল।”

“অশোকবাবু কি অফিসে ওঁর পার্সোনাল জিনিস কিছু রাখতেন?”

“তাও বলতে পারব না। একটা পার্সোনাল লকার আমাদের আছে। সেখানে যদি কিছু থেকে থাকে।”

“তার চাবি?”

“অফিস সিকিউরিটির কাছে একটা থাকবে। আর সব কিছু এখন পুলিশের হেফাজতে।”

“পুলিশ কী কী নিয়েছে তার লিস্ট কি আপনার কাছে আছে?”

“না, দেবরাজদার কাছে বোধহয় কপি আছে।”

“ফাইনাল প্রশ্ন স্যার, অশোকবাবুর কাছে বা ওঁর ঘরে কোনও ফটোগ্রাফ দেখেছিলেন?”

“হ্যাঁ, ওই তো। আঙ্কল আর আন্টির ছবি।” ইন্দ্র আঙুল দিয়ে দেখালেন।

“না, না, স্যার, এটা না। এই ধরুন, একটা পুকুরের সামনে দু’জন লোকের ছবি।”

“না, তেমন কোনও ফটো তো চোখে পড়েনি!” ইন্দ্রর চোখে বিস্ময়।

“কোনও খাম দেখেছিলেন স্যার, স্ট্যাম্প লাগানো পুরোনো খাম?”

“ইন্ডিয়ার?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“ইন্ডিয়া থেকে এক আধটা চিঠি আসতে দেখেছি।”

“ওঁর চিঠিপত্রগুলো কোথায় থাকে?”

“যা থাকার ঐ ড্রয়ারেই থাকে। বহু চিঠি ও ফেলে দিত।”

"ড্রয়ারে কোনো চিঠি নেই স্যার।"
"যেগুলো ছিল, সেগুলো হয়তো পুলিশ নিয়ে গেছে।"

ইন্দ্রের বাড়ি থেকে যখন বেরোচ্ছি, তখন একেনবাবু হঠাৎ থেমে মুখ ঘুরিয়ে যে প্রশ্নটা করলেন, সেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি। কারণ পোকার নিয়ে যখন আমরা কথা বলছিলাম, উনি তখন ড্রয়ার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কানে একটা কথাও ঢুকছিল বলে মনে হয়নি। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ও হ্যাঁ স্যার, আরেকটা প্রশ্ন করতে তো ভুলে গেলাম, অশোকবাবু কি কোনোদিন আপনাদের সঙ্গে পোকার খেলতে বসেছিলেন?"

আবার পোকার নিয়ে প্রশ্নে ইন্দ্রের মুখেচোখে অসোয়াস্তিটা পরিষ্কার। বললেন, "একবার এড প্রায় জোরজুলুম করে বসিয়েছিল।"

"হেরেছিলেন, না জিতেছিলেন?"

"ঠিক মনে নেই।"

"কতদিন আগের কথা স্যার?"

"প্রায় দিন কুড়ি।"

"কিন্তু আপনার মনে নেই স্যার?"

"বোধহয় জিতেছিল। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জিতেছিল। বিগিনার্স লাক।"

"তারপর উনি আর খেলেননি?"

"না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার?" বলে হাঁটা দিলেন একেনবাবু। আবার থামলেন। মাথা চুলকোতে চুলকোতে ফিরে তাকিয়ে একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কি স্ট্যাম্প জমাতেন স্যার?"

ইন্দ্র ঘরের দরজা প্রায় ভেজিয়ে ফেলেছিলেন। মুখটা বার করে বললেন, "না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ স্যার।"

ইন্দ্রর মুখের এক্সপ্রেশনটা দেখার মতো। আমরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত উনি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাছে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ফটো আর স্ট্যাম্প নিয়ে এত প্রশ্ন করলেন যে? আপনার কি ধারণা বিপাশার ফটো চুরির সঙ্গে অশোকের মৃত্যুর কোনো যোগ আছে?"

"আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার। বিপাশা ম্যাডামকে অশোক চিনতেন জানলাম, সুতরাং ফটোটা দেখে থাকতে পারেন। টাকার লোভে হয়তো চুরিও করতে পারেন। হু নোজ?"

"করে থাকলে তো আপনার সুবিধাই হয়, এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়!" প্রমথ বলল।

"এটা ভালো বলেছেন স্যার।"

"হয়তো বব ক্যাসেলও ফটো চুরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন।" প্রমথ ঠাট্টার ছলেই কথাটা বলল।

"কিছুই অসম্ভব নয় স্যার।"

"বিশেষ করে অশোক আর বব ক্যাসেল যখন দু'জনে দু'জনকে চিনতেন। বব ক্যাসেল যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকেন ইট উড বি টু মাচ অফ এ কোয়েন্সিডেন্স। আপনি এটা নিয়ে সিরিয়াসলি একটু খোঁজ খবর করুন," আমি বললাম।

"তা তো করতেই হবে স্যার, আপনারা যখন সন্দেহ করছেন ফটো চুরির সঙ্গে দুটো খুনের যোগ আছে।"

"ও, আর আপনি করছেন না? শুধু আমরা বলছি বলেই আপনি ওতে মাথা গলাবেন! আপনি মশাই সামথিং!" প্রমথ বলল।

একেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!"

"প্রমথর কথা ছাড়ুন," আমি বললাম, "ওর শুধু একটাই গুণ আমাদের রান্না করে খাওয়ায়। সেই গুণে সব দোষ মাপ।"

"তোদের পছন্দ করি বলেই, খোঁচাগুলো দিই। মনে রাখিস, 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নয় তো অবহেলা' প্রমথ গুনগুন করে গেয়ে উঠল।"

"ওরে ব্বাবা, একেবারে গুরুদেবের গান ধরলি, আমি ইমপ্রেসড!"

"শুনলেন," একেনবাবুকে প্রমথ বলল, "কে কাকে খোঁচা মারছে?"

।। ৭।।

সোমবার, মে ১৬, ২০১১

এই সময়টা আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি। ক্লাস থাকে না ঠিকই, তবে কাজ থাকে
সেমিনার, ছাত্রদের অ্যাডভাইস দেওয়া, নিজের রিসার্চ, এছাড়া ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু কাজ। আজ একটা সেমিনার ছিল, তার ওপর কয়েকটা ছাত্রের সঙ্গে মিটিং। কোনও মতে কফি খেয়ে কলেজ চলে এসেছি। পত্রিকাটাও ভালো করে পড়তে পারিনি। তবে বব ক্যাসেলের মৃত্যুর খবরটা দেখেছি বেরিয়েছে। ছোট্ট করেই দিয়েছে, তবে নতুন কিছু তথ্য পেলাম। যে হাই রাইজ বিল্ডিং থেকে উনি পড়ে যান সেটা বিপাশা মিত্রেরই প্রপার্টি। ওখানে কিছু কনস্ট্রাকশন চলছে, সেই সূত্রেই বব ওখানে মাঝে মাঝে যেতেন। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ উনি যখন বাইশ তলায় উঠেছিলেন, তখন সেই তলায় সম্ভবত আর কেউ ছিল না, কারণ রবিবারে ওখানে কোনও কাজ হয় না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখানে খবরের সঙ্গে বয়সটাও থাকে। ববের বয়স হয়েছিল ৩৫। এটা যে সুইসাইড, তার কোনও উল্লেখ অবশ্য দেখলাম না। তবে যে ভাবে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে, তাতে সেটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ নিয়ে একেনবাবু বা প্রমথ কারো সঙ্গেই কথা বলার ফুরসত পাইনি।

সকালের কাজগুলো সেরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে ক্যাফেটেরিয়াতে ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে এক ঝলক দেখা। আজ সন্ধ্যায় যে একেনবাবু আমাদের সবাইকে খাওয়াচ্ছেন ইতিমধ্যেই ও জানে। এমন কি একেনবাবুকে যে একটা ব্লু সাফায়ার কিনে দিতে হবে, সেটাও প্রমথ ওকে বলেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি রাজু চুগানিকে চেন?"

"না।"

"শি নোজ ইউ!" এমন ভাবে আমায় কথাটা বলল, যেন আমি ইচ্ছে করে পরিচয়টা

চেপে যাচ্ছি।

আমাকে একজন মেয়ে চেনেন, আর আমি তাঁকে চিনি না! হঠাৎ মনে পড়ল লাইব্রেরিতে একজন নতুন ভারতীয় মেয়ে কাজ করছেন, তাঁর ডেস্কে বোধহয় ওই নামেরই একটা নেমপ্লেট দেখেছি।

"লাইব্রেরিতে যিনি কাজ করছেন?"

"ইয়েস। ওর বর হেমন্ত একজন বড় ডায়মন্ড মার্চেন্ট। ইস্ট ফর্টিফিফথ স্ট্রিটে তার একটা দোকান আছে। রাজু প্রমথ আর আমাকে একবার নিয়েও গেছে ওখানে। ওখানেই ডিনারের আগে সবাই মিলে যাব।"

সকালের মধ্যে যে এতগুলো প্ল্যান হয়ে গেছে আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। কিন্তু প্রমথ ফ্রান্সিস্কাকে নিয়ে ডায়মন্ডের দোকানে গেছে, ব্যাপারটা কি? ব্যাটা নিশ্চয় ফ্রান্সিস্কাকে এনেগেজমেন্ট রিং দেবার কথা ভাবছে? রাস্কেলটা তো একবারও আমাকে বলেনি! আমি একটু চোখ টিপে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "শুড আই এক্সপেক্ট সাম গুড নিউজ সুন?"

"মে বি," বলে মুচকি হেসে ফ্রান্সিস্কা চলে গেল।

চারটে বাজতে না বাজতেই ওরা সবাই আমার অফিসে এসে হাজির। মেয়েদের গয়নার প্রতি আকর্ষণ একেবারে ইউনিভার্সাল। ফ্রান্সিস্কারই এ ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহ। একেনবাবুকে বলল, "ডিটেকটিভ (ওই নামেই ফ্রান্সিস্কা একেনবাবুকে সম্বোধন করে), যখন জুয়েলরি শপ-এ যাচ্ছ, তখন তোমার বৌয়ের জন্যেও একটা আংটি কেন। দশ বছর একটা বড় মাইলস্টোন।"

বেচারা একেনবাবু। প্রমথই বাঁচাল। "একে শনির দশা চলছে, তার ওপর আমাদের খাওয়াতে হবে, নীলা কিনতে হবে। এর ওপর যদি আর একটা আংটি কেনার চাপ দাও, উনি হার্টফেল করবেন শনির দশা একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ হবে।"

"ডোন্ট বি সিলি!" প্রমথকে একটা ধমক দিল ফ্রান্সিস্কা। তারপর একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ডিটেকটিভ, এই স্যাটার্নের ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, ম্যাডাম। কুষ্ঠি মানে বার্থ চার্টের একটা বাজে গ্রহ হল শনি। সময়ের সাথে সাথে চার্টে শনির পজিশন বদলায়। এক একটা পজিশনে শনি তার কুদৃষ্টি ফেলে, সেটাই ডেঞ্জারাস সময়। কঠিন কঠিন অসুখ শ্বাসরোগ, যক্ষ্মা, হাড়ের রোগ... এগুলো তো আছেই, এমন কি মৃত্যুও এই শনির হাতে।"

"মাই গড!"

"কিছু বুঝলে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"নট রিয়েলি।"

"বোঝার কিছু নেই, পুরো জিনিসটাই ধাপ্পাবাজি।"

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর কথা কানে তুলল না। বলল, "সত্যি ডিটেকটিভ! ব্লু স্যাফায়ার সঙ্গে থাকলে শনি কিছু করতে পারবে না? তাহলে তোমার সঙ্গে আমিও একটা ব্লু স্যাফায়ার কিনব।"

নিশ্চয় মজা করেই বলল। কিন্তু একেনবাবু খুব সিরিয়াস হয়ে গেলেন। "না, না ম্যাডাম, নীলা সবার স্যুট করে না, আপনি অন্য কিছু পরবেন।"

বোঝা যায় রাজুর বর হেমন্ত চুগানি বেশ পয়সা-অলা ডায়মন্ড মার্চেন্ট। কুড়ি তলার ওপর একটা পেন্ট হাউসে ওঁর দোকান। ছোটো ছোটো অনেকগুলো ঘর, সেখানে প্রাইভেটলি কাস্টমারদের ডায়মন্ড দেখানো হয়। কিছু ডায়মন্ড ডিসপ্লেতে দেখলাম। ডায়মন্ডের দাম সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে ম্যানহ্যাটানে এত বড় জায়গা

জুড়ে যার দোকান, তার ভাড়া মেটাতে গেলে বেশ ভালো রকমের রোজগার দরকার, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বৌয়ের চাকরির ওপর ভরসা করা চলে না। লাকিলি আমরা যখন গেছি, দোকানে কেউই ছিল না। ফ্রান্সিস্কাকে দেখে হেমন্ত ওঁর নিজের ঘরে আমাদের নিয়ে বসালেন। কথায় কথায় জানলাম যে, ওঁর স্ত্রী রাজু কিছুদিন এখানে সেলস-এ ছিলেন, কিন্তু কাজটা তেমন ভালো না লাগায়, হেমন্তই রাজুকে লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়ান। একটু গর্বভরেই হেমন্ত জানালেন রাজুর ভালো নাম রাজশ্রী, এক কালে নাকি বলিউডের দুয়েকটা ছবিতে হিরোইন হিসেবে নেমেছিলেন। আমি অবশ্য মনে করতে পারলাম না। একজন রাজশ্রীর নাম আমি বাবা-মার কাছে শুনেছি। ষাটের দশকে খ্যাতির তুঙ্গে একজন আমেরিকানকে বিয়ে করে লস এঞ্জেলেস না কোথায় চলে এসেছিলেন। এই রাজশ্রীর বয়স বড় জোর তিরিশ হবে। তবে কিনা বলিউড থেকে অজস্র ছবি রিলিজ করে, অল্প-কটিই হিট হয়। আমাদের এইসব কথাবার্তার মধ্যেই রাজু এসে হাজির। ফ্রান্সিস্কাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন, আমাদেরও 'হায়' বললেন। বলিউডের কি ম্যাজিক! আমি এতদিন রাজুকে দেখে তেমন সুন্দরী ভাবিনি। এখন মনে হল, না, একটা আকর্ষণীয়তা ওঁর মধ্যে আছে।

আমাদের দোকানে আসার কারণ দেখলাম হেমন্ত আগে থেকেই জানেন। ফ্রান্সিস্কা নিশ্চয় রাজুকে বলেছে, রাজু হেমন্তকে। হেমন্ত বললেন, "ব্লু স্যাফায়ার আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি ওগুলো চেনাজানা লোককে দিতে একটু দ্বিধা বোধ করি।"

এই প্রথম একেনবাবু মুখ খুললেন, "কেন স্যার?"

"এটা সবার ঠিক স্যুট করে না। কিনে নেবার পর নানান সমস্যা হয়।"

"এটা কি কোনও সায়েন্টিফিক স্টাডি থেকে বলছেন, না আপনার ধারণা?" প্রশ্নটা প্রমথর।

"সায়েন্টিফিক স্টাডি আমরা কী করব বলুন, বাপ-ঠাকুরদার কাছে যা শুনেছি সেই থেকে বলছি।"

"আপনার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা আছে?"

"তেমন নেই, তবে কিছুদিন আগে আমার পরিচিত এক সাহেব আমার দোকান থেকে একটা ব্লু-স্যাফায়ারের আঙটি কিনে নিয়ে গেলেন। আমি তাকেও বিক্রি করার আগে একই কথা বলেছিলাম। উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। সেদিন শুনলাম ইন্ডিয়াতে গিয়ে খুন হয়েছেন।"

"সেটা কি ব্লু-স্যাফায়ারের জন্যে না ভাগ্যের দোষে?"

"হু নোজ। কিন্তু আপনারা রাজুর বন্ধু, তাই সতর্ক করছি। আপনারা কিনলে তো আমারই লাভ।"

"ভদ্রলোকের নামটা কী স্যার যিনি মারা গেলেন?"

"জন হেক্টার। এক সময়ে ইন্ডিয়াতে প্রায়েই যেতেন। তখনই আমার বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। বেশ নামকরা লোক, পত্রিকাতেও খবরটা বেরিয়েছিল।"

"ইনিই কি বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক। ওই আর্ট নিয়েই বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ। বাবারও আর্ট, স্কাল্পচার, ইত্যাদিতে নেশা ছিল। আমি তখন খুব ছোটো ত্রিচি-তে থাকতাম। উনি এসেছিলেন তামিলনাড়ুর মন্দিরগুলোর উপরে একটা বই লিখবেন বলে। এনিওয়ে এসব আমার মনেও ছিল না। হঠাৎ করে একটা পার্টিতে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমার পদবী শুনে আমার বাবার নাম জানতে চান, তখনই পুরোনো সূত্রটা বেরিয়ে পড়ে। তারপর আমাদের বাড়িতে কয়েকবার

এসেছেন। এই দোকানেও।”

কথাগুলো বলতে বলতে হেমন্ত ড্রয়ার থেকে কয়েকটা জুয়েলারি বাক্স বার করলেন। তার একটা খুলে বড়সড় নীলার একটা আংটি দেখালেন।

“কী রকম দাম এটার?”

“তিন হাজার।”

“তিন হাজার... মানে ডলার!” একেনবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

আমি বললাম, “এর থেকে সস্তা কিছু নেই?”

“এটা আছে দু’হাজারের মধ্যে।” আরেকটা বাক্স খুলে দেখালেন হেমন্ত।

“দু-তিনশোর মধ্যে কিছু নেই?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“আসল নীলা ওই দামে পাবেন না। খুব ছোটো সাইজের নীলা একসঙ্গে সেট করা অবস্থায় যদি পান। আমি সে সব জিনিস রাখি না। আর্টিফিশিয়াল নীলায় যদি চলে, তাহলে একশো ডলারের কমেও পাবেন। অন-লাইনেই কিনতে পাবেন।”

“আর্টিফিশিয়াল নীলা কি স্যার ইকুয়ালি এফেক্টিভ?”

“আপনাকে কি কেউ এটা পরতে বলেছেন?” হেমন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ স্যার।”

“তা হলে মনে হয় জেনুইন জিনিসই ব্যবহার করা উচিত।”

বেচারা একেনবাবু, মুখটা দেখলাম কাঁচুমাচু। শনির দশা কাটাবেন, না দু’হাজার ডলার গচ্চা দেবেন! প্রমথ একেনবাবুকে অনবরত বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেও, সত্যিকারের বিপদের সময় ঠিকই এগিয়ে আসে। বলল, “আপনি শুধুই দুশ্চিন্তা করছেন। ন্যাচারাল নীলা আর আর্টিফিশিয়াল নীলার কেমিস্ট্রির কোনও তফাৎ নেই দুটোই আসলে কার্বন। দুটোই তৈরি হয়েছে প্রবল চাপের ফলে। খনিতে পাওয়া যায় ন্যাচারাল নীলা, আর্টিফিশিয়াল নীলা বানানো হয় ফ্যাক্টরিতে, কার্বনকে কৃত্রিম ভাবে চাপ দিয়ে। দুটোর এফেক্টই এক হওয়া উচিত।”

কথাটা একেনবাবুর মনে ধরল। “এটা ভালো বলেছেন স্যার একেবারে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল থেকে। তাহলে তাই করি।” তারপর হেমন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম স্যার।”

“এতটুকু নয়। আপনারা রাজুর বন্ধু এটুকু সময় আপনাদের দিতে পারব না!”

ফেরার পথে আমিই প্রশ্নটা তুললাম। “আচ্ছা, জন হেক্টার হঠাৎ নীলা কিনতে গেলেন কেন?”

“প্রশ্নটা আমাদের না করে হেমন্তকে করলেই পারতিস,” প্রমথ বলল।

“হেমন্ত উত্তরটা জানে সেটা কেন ভাবছিস?”

“কারণ জানার তবু একটা সম্ভাবনা আছে, যা আমাদের একেবারেই নেই।”

।। ৮ ।।

শুক্রবার মে ২০, ২০১১

[একেনবাবুর কাহিনি আমি আমার ডায়রির নোটগুলো দেখে লিখি। লিখতে বসে দেখছি সোমবারের পরে কোনো এন্ট্রি নেই। পরের এন্ট্রি শুক্রবার থেকে আরম্ভ হয়েছে। এখন মনে পড়ছে একেনবাবু দিন চারেক অন্য একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন।]

আমাদের ডিপার্টমেন্টে দু'জন অফিস অ্যাসিস্টেন্ট। যে সিনিয়র, তার নাম হেলেন ওয়েবার। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের ব্রুনেট, মোটাসোটা মেট্রন টাইপ। অসম্ভব এফিশিয়েন্ট। ডিপার্টমেন্টের সবকিছু ওর নখদর্পণে। মাস চারেক হল একটি নতুন মেয়ে কাজে ঢুকেছে, নাম বেভার্লি বেসিমার। বেভার্লি বা বেভের বয়স তেইশ কি চব্বিশ। সোনালি চুল, নীল চোখ, সুন্দর ফিগার, অ্যাট্রাক্টিভ চেহারা। লো-কাট টপ আর শর্ট স্কার্ট ছাড়া কখনো ওকে দেখিনি। আগে ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে ছিল, সেখান থেকে বোধহয় তাড়িত হয়ে এখানে এসেছে। সবসময়েই দেখি চেয়ারে বসে নানারকম খুটখাট করে নিজেকে আরও সুন্দরী করার চেষ্টা করছে। কোনও কাজ করতে বললেই মুখটা ভারী হয়ে যায়। ফলে যা দরকার তা হেলেনকেই বলি। এর ওর মুখে শুনি বেভ নাকি ভীষণ পার্টি গার্ল, হাজার হাজার ছেলেকে নাচায়। কথাটায় সত্যতা কিছুটা নিশ্চয় আছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টে আসছে জেনে ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের রামসুন্দর রেড্ডী আমাকে সাবধান করেছিল, 'অ্যাভয়েড হার লাইক এ প্লেগ'। এটা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। আমার এক সিনিয়র কলিগ বেভকে ফাদারলি অ্যাডভাইস দিতে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এত লো-কাট টপ পরে এসো না, এটা অ্যাকাডেমিক ইনস্টিট্যুশন অনেকে এতে অসুবিধা বোধ করে।'

'ডিস্ট্রাক্টেড হয়' কথাটা বোধহয় বলেনি। বেভ নাকি মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'আমাকে কেন বদলাতে বলছ, প্রব্লেমটা তো ওদের'।

কথাটা যে খুব ভুল তা নয়। প্রাচীন কালে অপ্সরাদের দেখে মুনিঋষিদের যখন পদস্খলন হত, তখন পাপ বা দোষটা মুনিঋষিদের ওপরেই বর্তাত, অপ্সরাদের ওপরে নয়। যাক সে কথা, আমার এক পুরানো ক্লাস ফ্রেন্ড কিশোর রাও হঠাৎ বেভের প্রেমে পড়েছে। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনই নিশ্চয় পরিচয় হয়েছিল ডিটেলটা আমি জানি না। যেটা জানি, কিশোরের অবস্থা এখন বেশ শোচনীয়। বেভ নিশ্চয় প্রেমের ব্যাপারে উদারপন্থী। একজনের সঙ্গে প্রেম করছে বলে, অন্য কারো প্রেম ফিরিয়ে দেবে, এমন সঙ্কীর্ণমনা সে নয়। ফলে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই জটিলতার মধ্যে অনিচ্ছাসত্বেও আমি জড়িয়ে পড়েছি। প্রেমের ব্যাপারে আমি যে কমপ্লিট ফেইলিওর, বার বার জানিয়েও কিশোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি। ওর ধারণা আমি খুব ধীরস্থির বিচক্ষণ লোক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সব কিছু যাচাই করতে পারি। তার ওপর বেভকে আমি চিনি, তাই তার কথা বা হাবভাবের পেছনে সত্যিকারের যে সঙ্কেত লুকিয়ে আছে সেটা আমিই একমাত্র ধরতে পারব। কোয়ায়েট এ কমপ্লিমেন্ট, যদিও রংলি প্লেস্ড। এই চারমাসে আমি বেভের সঙ্গে সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি কিনা সন্দেহ। যখন করেছি, নিতান্ত দায় ঠেকে। কিন্তু সেগুলো সবিস্তারে জানিয়েও নিষ্কৃতি পাইনি। আমার ধারণা কিশোর একজন শ্রোতা চায়। ইদানীং তাই ওর সঙ্গে বসে মাঝেমাঝেই আমায় কফি খেতে হয়।

কিশোরের সঙ্গে কফি খাব বলেই বেরিয়েছিলাম। কফি কর্নারটা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে যাবার পথেই পড়ে, কলেজ থেকে মাত্র দু'ব্লক দূরে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দোকানটা নজরে পড়ল। এতদিন এই পথে কত হেঁটেছি, কিন্তু চোখে পড়েনি। চোখে না পড়ারই

মতো। ঢোকার মুখটা সরু, সাইনবোর্ডটাও সাদামাটা। 'ফিলাটেলিস্ট কর্নার' এমন ভাবে লেখা, সেটা উদ্ধার করতে যে সময়টা লাগবে ম্যানহাটানের ব্যস্ত পথচারীদের তা নেই। আজকেও নজরে পড়ত না, যদি না সেখান থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াতেন!

"হ্যালো দেয়ার, আপনাকেই খুঁজছি, আপনার স্ট্যাম্পের একজন কাস্টমার পাওয়া গেছে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার স্ট্যাম্পের কাস্টমার? কী বলছেন আপনি?"

ভদ্রলোক একটু যেন থতোমতো খেয়ে গেলেন। "আপনি যে স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে এনেছিলেন, সেটার কথা বলছি।"

"আপনি নিশ্চয় লোক ভুল করছেন।"

"ও, আই অ্যাম সো সরি, কিছু মনে করবেন না", ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে দ্রুত দোকানে ঢুকে গেলেন।

পাঁচটার সময় কিশোরকে বলেছি কফি কর্নারে আসব, কী একটা নতুন ডেভালপমেন্ট হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চায়! কফি হাউসে পৌঁছে দেখলাম কিশোর নেই। ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। নিশ্চয় অধৈর্য হয়ে চলে গেছে! যাবার আগে আমাকে একটা ফোন করতে পারল না?

শেষবারের মতো উঁকিঝুঁকি মেরে বেরোতে যাব, দেখি রাজু আর তার বর হেমন্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে কফি খাচ্ছেন। আমাকে দেখে রাজু হাত নেড়ে ডাকলেন।

"আপনার ফোন তো সুইচ্‌ড অফ?"

সুইচ্‌ড অফ! ফোনটা পকেট থেকে বার করতে করতেই মনে পড়ল দুপুরে একটা সেমিনারে ঢোকার আগে ওটা বন্ধ করেছিলাম, তারপর চালু করা হয়নি। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এই গোপন তথ্যটা জানলেন কী করে?"

মুচকি হাসলেন রাজু। "কিশোর আমাদের সঙ্গেই এতক্ষণ বসে ছিল, আপনাকে ধরার চেষ্টা করছিল।"

"আপনি কিশোরকে চেনেন?"

"কিশোর আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু। যেটা জানতাম না, সেটা হল কিশোরভাই আপনার এত বন্ধু।"

"স্মল ওয়ার্ল্ড।"

হেমন্ত বললেন, "বসুন না, একটু কফি খান আমাদের সঙ্গে।" বলে কফির অর্ডার করলেন।

খুব একটা বসার ইচ্ছে ছিল না, তাও বসলাম।

"মিস্টার সেন কি নীলার আংটি কিনেছেন?" হেমন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

"ইন্টারনেটে সেদিন খুঁজছিলেন দেখেছি, কিন্তু আঙুলে ফিট করবে কি না, সে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন।"

"আপনারা সেদিন চলে যাবার পর রাজু রাগ করল। বলল, আমার আরও হেল্পফুল হওয়া উচিত ছিল। একশো দু'শো ডলারের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল নীলা নিশ্চয় জোগাড় করে দিতে পারতাম। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? শনির দশা কাটাতে চাইলে জেনুইন জিনিসের উপরই ভরসা করা উচিত।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, “সেদিন অবশ্য এ নিয়ে একবার কথা হয়েছে, তাও আরেকবার জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি সত্যি সত্যি নীলার এফেক্টে বিশ্বাস করেন?”

“করি। আমি জুয়েল বেচে খাই, এগুলো বিশ্বাস না করলে বেচব কেন? ওই যা, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি আমার আঙ্কল মিস্টার বিলাস চুগানি। ইন্ডিয়া থেকে বেড়াতে এসেছেন। আর ইনি প্রফেসর দে, রাজুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ান।”

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণ ক্লু-লেস মুখ করে আমাদের কথা শুনছিলেন। হেমন্ত পরিচয় করিয়ে দিতেই হাত জোড় করে বললেন, “নমস্তে।”

আমিও নমস্কার করলাম।

হেমন্ত ওঁর আঙ্কলকে সংক্ষেপে আমাদের কথাগুলোর সূত্র ধরিয়ে দিলেন। সেটা শুনে মিস্টার চুগানি বললেন, “তুমি ঠিকই করেছ হেমন্ত, নীলা নিয়ে ছেলেখেলা নয়। সবাইকে ওটা বিক্রি করা ঠিক নয়, দেখলে তো জন হেক্টারের কী হল?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি জন হেক্টারকে চিনতেন?”

“খুব ভালো করে। সেকি আজকের কথা ১৯৭০ সাল থেকে চিনি। সাউথ ইন্ডিয়ার টেম্পেল আর্কিটেকচার নিয়ে একটা বই লিখবে বলে এসেছিলেন। মন্দিরের প্রচুর ছবি তুলেছিলেন। ত্রিচিতেও ছিলেন বেশ কিছুদিন, সেখানেই আমার আর হেমন্তের বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ। ত্রিচিতে থাকতে থাকতেই ইংল্যান্ডের একটা কাগজের স্টাফ রিপোর্টারের কাজ পেয়ে গিয়ে বেশ কয়েক বছর ইন্ডিয়াতে ছিলেন।”

“উনি মারা গেলেন কী ভাবে?”

“সেটাই রহস্য। কিছুদিন আগে উনি আবার ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন। আমি যেদিন দেশ থেকে রওনা দিই, তার ঠিক দু’দিন আগে আমার বাড়ি এসে খুব হইচই করলেন। পুরোনো দিনের অনেক কথা হল। তখনই হেমন্তের কাছ থেকে কেনা আংটিটা দেখালেন। আমি অবশ্য সাবধান করলাম জ্যোতিষ না দেখিয়ে নীলা ধারণ করার ব্যাপারে। একেবারেই পাত্তা দিলেন না। যেদিন আমার ফ্লাইট, সেদিন সকালে নিউজে শুনি হোটেলে কেউ ওঁকে গুলি করেছে!”

“আশ্চর্য! আচ্ছা, ওঁর কথাবার্তায় এরকম যে কিছু ঘটতে পারে আঁচ করতে পেরেছিলেন কি?”

“একেবারেই নয়। সাউথে বহুদিন উনি কাটিয়েছেন, এসেছিলেন পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথম দিনই ফোনে পরিচিত অনেকের খবর নেন। যাদের ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল সেগুলো দিই। শুধু একজনের খবর আমি জানতাম না। জানতে চেয়েছিলেন, কল্পনা কোথায় আছে? প্রথমে বুঝিনি কার কথা বলছেন। তারপর মনে পড়ল বহু বছর আগের ঘটনা। ত্রিচিতে একটা টেম্পল মার্ডার কেসে যে কনভিক্টেড হয়েছিল তার কথাই নিশ্চয় হবে। কল্পনাকে আমি চিনতাম না। তবে ওর বাবাকে আমার বাবা চিনতেন। তিনি ছিলেন সেই মন্দিরের পুরোহিত।”

“মাই গড, টেম্পলে এরকম মার্ডার হয়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আপনি সাউথ ইন্ডিয়ায় মন্দিরগুলো দেখেছেন কিনা জানি না, সেখানে ভক্তদের দেওয়া সোনাদানা হীরে জহরৎ যা থাকে, তা যে কোনও ব্যাঙ্কের ভোল্ট বা রাজা-মহারাজার সিন্দুককে হার মানাতে পারে। চুরি-ডাকাতির বড় টার্গেট।”

“কিন্তু জন হেক্টার ওই মহিলার খোঁজ করছিলেন কেন? উনিও কি চুরি-ডাকাতি করার প্ল্যান করছিলেন? নিশ্চয় ওই নীলা-ধারণের ফল!” আমি একটু ফাজলামি করেই কথাটা

বললাম।

মিস্টার চুগানি বোধহয় ঠাট্টাটা বুঝলেন না। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, "তুমি ইয়ং ম্যান, তার ওপর বাঙালি□ তুমি বা তোমরা হয়তো ভাব এগুলো কুসংস্কার। কিন্তু ট্রাস্ট মি, নীলা সবার স্যুট করে না, এটা নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়, এর এফেক্ট কুড বি ডেঞ্জারাস।"

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিশ্বাসে আর আঘাত করতে চাইলাম না, কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, "ইউ মে বি রাইট। কিন্তু একটা জিনিস এখনো স্ট্রেঞ্জ লাগছে, মিস্টার হেক্টার হঠাৎ ওই মহিলার প্রসঙ্গ তুললেন কেন, ওঁরা কি বন্ধু ছিলেন?"

"তা বলতে পারব না। পরিচয় নিশ্চয় থাকতে পারে, মন্দির নিয়ে যখন বই লিখছিলেন।"

এমন সময় আমাকে অবাক করে দিয়ে হেমন্ত বললেন, "আমি কিন্তু জানতাম জন হেক্টার কল্পনার খোঁজ করবেন। উনি ক্রিমিনালদের নিয়ে ফলো-আপ স্টোরি লিখছিলেন। অপরাধ করে দোষী ধরা পড়লে, তার শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত খুব হইচই হয়। তারপরে তাদের কথা সবাই ভুলে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা কে কী করছে, সেই খবরটা আর পাওয়া যায় না। ওঁর লেখা সেই সব গল্প কাহিনি পত্রিকায় মাঝে মাঝে বেরোয়। যাবার আগে আমায় কল্পনার গল্পটা বলেছিলেন।"

"কী গল্প?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"বিরাট কোনও গল্প নয়। আঙ্কল যা বললেন তাই... ইট ওয়াজ এ রবারি, সেটা আটকাতে গিয়ে একজন খুন হয়। তবে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল কল্পনা একা কাজটা করেনি, কিন্তু দলে আর কারা জড়িত□ সেটা উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশের অনুমান অন্য যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন কল্পনার বয়ফ্রেন্ড।" এটা বলে হেমন্ত ওর আঙ্কলকে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও কি এটা শুনেছিলে?"

"হ্যাঁ, এরকমই কিছু একটা শুনেছিলাম। এও শুনেছিলাম জেলে কল্পনা খুব মানসিক কষ্টে ছিল, একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। তখন নাকি জেলার আর জেলারের স্ত্রীর চেষ্টায় অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাঝেমাঝেই নাকি মাথায় গোলমাল হত, সত্যি কি না□ জানি না।"

"এটা আমি জানতাম না," বলে ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হেমন্ত উঠে পড়লেন। "আই অ্যাম সরি, আমায় এখন দোকানে যেতে হবে, আপনারা বসে বসে গল্প করুন।"

আমি বললাম, "না, না, আমাকেও উঠতে হবে।"

কফির পয়সা দিতে চাইলাম হেমন্ত কোনও কথা কানে তুললেন না। বললেন, "আঙ্কল থাকতে থাকতেই একদিন বাড়িতে আসুন না, ভালো করে গল্প করা যাবে।"

"আসব।"

"গুড, তাহলে রাজু আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুবিধা মতো একটা দিন ঠিক করে নেবে।"

।। ৯ ।।

বাড়ি পৌঁছে দেখি একেনবাবু ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন।

"কী ব্যাপার?"

"বুঝলেন স্যার, নীলাটা না কিনলে চলছে না।"

"কিনুন না, আপত্তি করছে কে, সেদিন তো অন-লাইনে দেখলেন আপনার বাজেটের মধ্যেই পাচ্ছেন।"

"তা পাচ্ছি স্যার, কিন্তু ওগুলো জেনুইন নয়।"

"কম্পোজিশন তো এক, প্রমথর লেকচার শুনলেন না সেদিন?"

প্রমথ যে রান্নাঘরে আমি বুঝিনি। একটা হুঙ্কার দিল সেখান থেকে, "আমার নামে একটা বাজে কথা বলেছিস তো, তোর মাথা ভাঙব।"

"বাজে কথা বলব কেন, তোকে সাপোর্ট করেই তো বলছি।"

"টোনটা সাপোর্টের নয়।"

"বেশ, সাপোর্টিং টোনেই বলছি।" বলে একেনবাবুকে বললাম, "দুশ্চিন্তা না করে, প্রমথের উপদেশ মতো আর্টিফিশিয়াল নীলা কিনে ফেলুন। কিছু উপকার তো হবে, আর যদি কোনও কারণে স্যুট না করে, বড়সড় ক্ষতি অন্তত হবে না।"

"বুঝলাম না স্যার।"

"কেন, সেদিন শুনলেন না, জেনুইন নীলা ধারণ করায় জন হেক্টারের ট্র্যাজেডি? আজ আরও ভালো করে জানলাম।"

প্রমথ দুকাপ কফি হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল, "কী জানলি?"

আমি চুগানীদের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে বললাম।

সাধারণত একেনবাবু আর প্রমথকে একসঙ্গে কিছু বলা সহজ ব্যাপার নয়। প্রমথ শুনতে চায় সামারি বা চুম্বক, আর একেনবাবু চান পুংখানুপুঙ্খ ডিটেলে। পদে পদেই থামিয়ে প্রশ্ন করে চলেন... 'এ কথাটা যখন বললেন স্যার, তখন কি ওঁর মুখটা খুব গম্ভীর ছিল?', 'উনি কি খুব রিল্যাক্সড ছিলেন না উত্তেজিত ছিলেন?', 'বডি ল্যাঙ্গোয়জ কিরকম ছিল স্যার?'... এরকম হাজারো প্রশ্ন। ফলে ওঁকে কিছু বলতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা। আজ দেখলাম একেনবাবু অন্যমনস্ক। বিশেষ কোনও প্রশ্ন করলেন না, যা বললাম চুপচাপ শুনে গেলেন। বলা শেষ হলে প্রমথই জানতে চাইল, "জন হেক্টার খুন হলেন কেন সে সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?"

"তার উত্তরটা শোনা হয়নি। আমার মনে হয় হেমন্তের আঙ্কল জানেন না, কারণ যেদিন খুন হবার খবর পান সেদিনই তিনি দেশ ছেড়েছেন।"

"আই, সি," প্রমথ টেবিল থেকে ল্যাপটপটা তুলে চালু করল।

"কী দেখছিস?"

"কয়েকদিন আগে কিছু ঘটলেও ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে।"

প্রমথ যখন হেক্টারের খবর খুঁজছে, তখন হঠাৎ মনে পড়ল... বললাম, "ও আরেকটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, একটু মজারই। কফি কর্নারে যাবার সময় অচেনা একটা লোক আচমকা আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলল, আমার স্ট্যাম্পের এক খদ্দের পেয়েছে। পরে অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে অদৃশ্য হল।

এই প্রথম একেনবাবু মুখ খুললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। রাস্তায় আপনাকে ধরে

হঠাৎ এই কথা বলল?”

“ওয়েল, রাস্তাতেই, তবে একটা স্ট্যাম্পের দোকানের সামনে। নিশ্চয় দোকানের কোনও লোক, আমায় দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছিল।”

“দোকানটা কোথায় স্যার?”

“সালিভ্যান স্ট্রিটে।”

“ও হ্যাঁ, ফিলাটেলিস্ট কর্নার।”

“আপনি দোকানটা দেখেছেন?”

“পথেই তো পরে স্যার।”

“আমি তো খেয়ালই করিনি আগে!”

প্রমথ আমাদের কথা কানে দিচ্ছিল না। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “ইউরেকা, পেয়েছি!”

“কী পেলি?”

“কী করে নিউজটা মিস করেছিলাম জানি না, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এই বেরিয়েছিল। জন হেক্টারকে খুনই করা হয়েছে। পড়ছি, শোন

> ওঁর হোটেলের ঘর থেকে টাকাকড়ি, ক্যামেরা, ঘড়ি, ল্যাপটপ সবকিছু নিয়ে কেউ অদৃশ্য হয়েছে। পুলিশের ধারণা চুরি করাই ছিল উদ্দেশ্য। শুক্রবার রাত্রে উনি কারোর সঙ্গে ডিনার খেতে বেরিয়েছিলেন। অজ্ঞাত কারণে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। ঘরে ঢুকে আততায়ীদের দেখতে পান, তখনই ওঁকে খুন করা হয়। সম্ভবত সিকিউরিটি গার্ডের কেউ এর সঙ্গে জড়িত, তদন্ত চলছে। ইন্ডিয়া জন হেক্টারের অতি পরিচিত ও প্রিয় জায়গা। সত্তর দশকে গিয়ে উনি প্রায় বারো বছর ওখানে ছিলেন বেশ কিছুদিন দ্য টাইমসের রিপোর্টার হিসেবে। পরেও বহুবার বেড়াতে গেছেন। ...

“হেমন্তের আঙ্কল তাহলে ভুল কিছু বলেননি,” আমি বললাম।

“মার্ডারের ব্যাপারটা ভুল বলেননি, তবে...”, প্রমথ কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

“তবে কী?”

“ভাবছি, এই হেক্টার লোকটা ঠিক কে?”

“তার মানে?”

“একটা লোক মন্দিরের ওপর বই লিখবে বলে ইন্ডিয়াতে গেল, প্রচুর ছবি তুলল, শুধু বইটা লিখল না। অথচ রিপোর্টার হয়ে বারোটা বছর কাটিয়ে দিল! এখনও মাঝে মাঝেই ইন্ডিয়ায় যায়। হোয়াই? এটা কি ইন্ডিয়া-প্রেম, না হি ওয়াজ ইনভল্ভড ইন সামথিং এল্স।”

“কী সামথিং এল্স?”

“নিশ্চয় সিআইএ এজেন্ট, তা ছাড়া কি? রিপোর্টার সেজে থাকত, চমৎকার কাভার। নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, যত্রতত্র ছবি তোলা, সবকিছুই রিপোর্টিং-এর মধ্যে পড়ছে। আমি বাজি ধরছি, ওঁর খুনিরা সিম্পলি চুরি করতে ঢোকেনি, ঢুকেছিল হয় ইনফরমেশনের খোঁজে, নয় ওঁকে খতম করতে। সাধারণ চোর নয়, আলকায়েদা বা অন্য কোনও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক।”

প্রমথর কল্পনাশক্তি যে আমার থেকে বেশি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু মাঝে

মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়!

"আপনি কী বলেন একেনবাবু?" জিজ্ঞেস করলাম।

একেনবাবু পা নাচাতে নাচাতে ওঁর ফেভারিট লাইনটা আওড়ালেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মনে পড়ল কিশোরের কাছে অ্যাপলাইজ করা হয়নি। যখন দেরি হচ্ছিল তখনই ওকে ফোন করা উচিত ছিল। যাইহোক, এখন অন্তত করি। মোবাইলটা পকেট থেকে বার করতে যাচ্ছি, প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কাকে ফোন করছিস?"

"কিশোরকে।"

প্রমথ বেভ আর কিশোরের ব্যাপারটা জানত। কিশোর যে মাঝে মধ্যে এ ব্যাপারে আমার অ্যাডভাইস নেয় সেটাও অজ্ঞাত নয়। আমায় খোঁচা দিল, "আবার অ্যাডভাইস? এক অন্ধ পথ দেখাচ্ছে আরেক অন্ধকে!"

"চুপ কর, রাস্কেল," বলে আমি কিশোরের নম্বর বার করে কল বাটন টিপলাম। কয়েকটা রিং-এর পরেই কিশোর ফোন ধরল।

আমি 'সরি' বলতে না বলতেই বলল, "আরে, আমি তো বুঝতেই পেরেছিলাম কিছুতে আটকা পড়েছ, এত সরি বলার কী আছে!"

কিশোরের গলার স্বর শুনে মনে হল বেশ উজ্জীবিত, বেভের সঙ্গে নিশ্চয় পজিটিভ কিছু ঘটেছে। বলল, "অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, ফোনে হবে না।"

"তুমি যদি চাও, কালকে কফি খেতে পারি," ওকে বললাম।

"কালকে হবে না। বেভকে নিয়ে হোবোকেনে ওর আন্টি মিশেলের কাছে যাচ্ছি। রবি, সোম থাকছি না। মঙ্গলবারও নয়, ওই দিনও বোধহয় বেভকে নিয়ে আন্ট মিশেলের কাছে যেতে হবে। হাউ অ্যাবাউট বুধবার সেইম টাইম, সেইম প্লেস।"

"দ্যাট্স ফাইন।"

মিশেল নামটা শুনে আমার খট্কা লাগল। ফোন নামিয়ে একেনবাবুকে বললাম, "হোবোকেনের এক মিশেল আমাদের সেক্রেটারি বেভের মাসি।"

"তাতে হলটা কি?" প্রমথ বলল। "হোবোকেনে হয়তো পাঁচশো মিশেল আছে, তাদের মধ্যে শ-দুয়েক হয়তো কারো না কারো মাসি।"

এর উত্তরে কিছু বলার আগেই একেনবাবু প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পালটে দিয়ে বললেন, "ভালো কথা স্যার, সোমবার কখন আপনি ইউনিভার্সিটি যাবেন?"

"সকাল দশটা নাগাদ। কেন?"

"আমিও আপনার সঙ্গে বেরোবো।"

"বেশ তো, কোথায় যাবেন?"

"একবার ওই স্ট্যাম্পের দোকানটায় যাব ভাবছিলাম।"

আমি আঁচ করতে পারছি, একেনবাবুর মাথায় কী ঘুরছে। কিন্তু এমন সময়ে মিত্রা মাসির একটা ফোন আসায় সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হল না। মিত্রা মাসি মায়ের মাসতুতো বা পিসতুতো বোন, শিকাগোতে ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছেন। মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করেন। ব্রেভিটি ইজ নট হার স্ট্রং পয়েন্ট। এক থেকে দু'ঘণ্টা আমার সময় নষ্ট করে তারপর ফোন ছাড়েন। কথা শেষ হতে হতে একেনবাবু দেখলাম কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন।

।। ১০।।

শনিবার / রবিবার মে ২১/২২, ২০১১

আমি দেখেছি, মাথায় যদি কোনও প্রশ্ন জাগে, যতক্ষণ সেটার উত্তর না মেলে, মনটা ছটফট করতে থাকে। খুবই অকিঞ্চিৎকর প্রশ্ন, বেভের আন্টিই অশোক দুবের সেই মিশেল কিনা□ সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাতে ভালো ঘুম হল না। সকালে উঠে দেখি প্রমথ বা একেনবাবু কেউই বাড়িতে নেই। আজকাল শনি-রবিবার প্রমথর দেখা পাওয়া ভার। সাত সকালে ফ্র্যান্সিস্কার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। মাঝে মাঝে উইক-এন্ডটা সেখানেই কাটিয়ে আসে। আমার ধারণা দে আর স্লিপিং টুগেদার। নট দ্যাট আই কেয়ার। আজ বাদে কাল তো বিয়েও করবে। একেনবাবু সাধারণত বাড়িতেই থাকেন। তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন কে জানে? একটু বাদে একেনবাবুর ফোন পেলাম। উইক-এন্ডে আমার প্ল্যান জানতে চান।

"কোনো প্ল্যান নেই।"

"তাহলে, চলুন না, কুইন্সে উইক-এন্ডটা কাটাই।"

"কুইন্স? অফ অল দ্য প্লেসেস?"

"আসলে স্যার, আমার খুড়তুতো শ্যালক কলকাতা থেকে কাল রাতে এসেছে। কুইন্সে ওর এক বন্ধুর কাছে আছে। আমি ওঁদের সঙ্গেই এখন গল্প করছি। আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন সেই বন্ধু□ উইক-এন্ডটা এক সঙ্গে কাটাবার জন্যে।"

"আপনি যান। প্রমথ তো নেই, আর আমারও কলেজের কিছু কাজ বাকি পড়ে আছে, সেগুলো এই ফাঁকে সেরে নেব।"

"আপনি একা একা থাকবেন স্যার?"

"তাতে কী হয়েছে? আপনার কি রাইড লাগবে? আমি আপনাকে কুইন্সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।"

"ছি, ছি, স্যার, কী যে বলেন! ওঁরাই আমাদের নিয়ে যেতেন।"

"ব্যাস, তাহলে তো চুকেই গেল।"

একেনবাবু কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। বুঝলাম আমাকে একা ফেলে রেখে যেতে একেনবাবুর খারাপ লাগছে। প্রমথ যখন উইক-এন্ডগুলো বাইরে কাটায়, তখন এক আধ সময় একেনবাবুকে আমি বলেছি, 'এটা হল ট্রায়াল, ধীরে ধীরে প্রমথকে ছাড়াই আমাদের থাকতে হবে। উই উইল মিস হিম।' এক বছর বাদে একেনবাবুরও দেশে ফিরে যাবার কথা। ওঁর ফুলব্রাইট ফেলোশিপ শেষ হচ্ছে। ওঁরা চলে গেলে এই তিন বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে ছোটোখাটো কিছু খুঁজতে হবে। এই নিয়ে একেনবাবুর সঙ্গে আগে কয়েকবার কথাও হয়েছে। প্রতিবারই একেনবাবু বলেছেন, 'আপনি স্যার, কলকাতায় চলে আসুন। প্রমথবাবুর ম্যাডাম আছেন, ওঁর পক্ষে দেশে ফিরে আসা হবে না। আপনি তো স্যার মুক্ত পুরুষ।' আমি একেনবাবুকে বলেছি, 'কেন, আমি কি এখানে কোনও ম্যাডাম জোগাড় করতে পারি না?' একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বলেছেন, 'কী যে বলেন স্যার, তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

সত্যি কথা বলতে কী, কেউ না থাকায় দিব্বি কাটল। নিজের কাজগুলো হল, সুচিত্রা-উত্তমের ডিভিডি 'চাওয়া-পাওয়া' দেখলাম। আমার এখনও মায়েদের সময়কার রোম্যান্টিক

ছবিগুলো ভালো লাগে। প্রমথর জ্বালায় ওগুলো আনা যায় না। ওর মতে পুরোনো ছবিগুলো সব সিলি সেন্টিমেন্টাল ট্র্যাশ। একজনকে মুখ ফুটে ভালোবাসি বলতে যদি দু'ঘণ্টা কেটে যায়, সেটা আবার একটা সিনেমা হল নাকি? বাংলা বইও ও পড়ে না। একবার শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে পড়িয়েছিলাম। পড়ে ক্ষেপে আগুন! ওর কনক্লুশন বিজয়াকে যদি বা ক্ষমা করা যায়, নরেন একটা ইডিয়ট। আর আমার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করানো উচিত এইসব পুরানো বস্তাপচা রাবিশ এখনো পড়ি বলে!

শনিবার সন্ধ্যায় একটা ফোন পেলাম। এক ভদ্রলোক একেনবাবুর খোঁজ করছিলেন। নামটা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথমে ঠিক শুনতে পাইনি। দুয়েকটা কথার পরে চিনতে পারলাম। বিপাশা মিত্রের ফ্যামিলি মিউজিয়ামের কিউরেটর সতীশ কুমার। বব ক্যাসেলের মৃত্যুতে খুব আপসেট দেখলাম সতীশ কুমারকে। দু'জনে বোধহয় ভালো বন্ধু ছিলেন।

একেনবাবুকে কিছু বলতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে সতীশ বললেন, বব ক্যাসেলের মা ক্যাথি ক্যাসেল একেনবাবুর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে একটু কথা বলতে চান, কবে এলে দেখা হবে। কারণটা অবশ্য সতীশ আমার কাছে ভাঙলেন না। তবে বললেন, বিপাশা মিত্রের কাছে সতীশ শুনেছেন যে, একেনবাবু একজন ভালো ডিটেকটিভ। সতীশই ক্যাথিকে একেনবাবুর নামটা দিয়েছেন। ক্যাথি ক্যাসেলের বয়স পঁচাত্তর পার্কিনসন্স, আরথ্রাইটিস ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। একেনবাবু একটা সময় দিলে সতীশ কুমার নিজেই ওঁকে নিয়ে আসবেন। একেনবাবুকে আমি চিনি। উনি কখনোই চাইবেন না যে, একজন বৃদ্ধা এত কষ্ট করে আসবেন ওঁর কাছে। আমি ক্যাথি ক্যাসেলের নম্বরটা নিয়ে নিলাম। বললাম একেনবাবু যোগাযোগ করবেন।

রবিবার রাত্রে প্রমথ ফিরল। হাতে একটা প্যাকেট। ফ্র্যান্সিস্কা একটা ফ্রুটকেক বানিয়েছে। তার থেকে পেল্লায় সাইজের একটা অংশ প্যাক করে দিয়েছে আমার আর একেনবাবুর জন্যে। ভেরি সুইট। একেনবাবু ফিরলেন প্রমথর একটু পরেই। তিনিও মিষ্টির একটা প্যাকেট এনেছেন। আমি কফির সঙ্গে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে করতে একেনবাবুকে বললাম, "বব ক্যাসেলের মা ক্যাথি ক্যাসেল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"কেন স্যার?"

"ঠিক জানি না, তবে একজন ডিটেকটিভের খোঁজ করছিলেন। সতীশ কুমার আপনার নাম সাজেস্ট করেছেন। বৃদ্ধা অসুস্থ, সতীশ কুমার নিজেই ওঁকে নিয়ে আসতেন এখানে। বললাম, আপনি ফোন করবেন।"

"নম্বরটা দিন স্যার। এখন রাত্রি হয়ে গেছে, কাল ফোন করব।"

ফ্রুটকেকটা ফ্র্যান্সিস্কা দুর্দান্ত বানিয়েছে। প্রমথকে বললাম, "তুই মাঝে মাঝে প্লিজ ফ্র্যান্সিস্কার কাছে গিয়ে থাকিস। হোয়াট এ ট্রিট!"

"রাস্কেল!" বলে প্রমথ শুতে চলে গেল।

সোমবার মে ২৩, ২০১১

সোমবার একটু দেরি করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দশটা নাগাদ আমি আর একেনবাবু বেরোলাম। ফিলাটেলিস্ট কর্নার আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে মিনিট দশেকের পথ। একেনবাবুকে বললাম, "আমি বুঝতে পারছি কেন স্ট্যাম্পের দোকানে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু যেটা বুঝছি না, আমাকে কেন দরকার?"

"আপনাকে স্যার একটু অভিনয় করতে হতে পারে।"

"কী অভিনয়?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"না না, তেমন কিছু নয় স্যার।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, এদিকে বলছেন অভিনয় করতে হবে, অথচ পার্ট বলছেন না ব্যাপারটা কী?"

"আঃ, ঘাবড়াচ্ছেন কেন স্যার, চলুন না?"

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, দোকান তখন সবে খুলেছে। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দোকানে বসেছিলেন তিনি উঠে এগিয়ে এলেন। আমি একেনবাবুকে চট করে সতর্ক করে দিলাম, "ইনি কিন্তু অন্য লোক।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

"মে আই হেল্প ইউ উইথ এনিথিং?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা দোকানটা একটু দেখতে এসেছি স্যার।"

"নিশ্চয়, দেখুন। আমাদের দোকান ছোটো, কিন্তু স্টক ভালো। কিসে আপনাদের ইন্টারেস্ট?"

"জেনারেল ইন্টারেস্ট স্যার, খুব জেনারেল। আসলে স্যার, আমাদের বাজেট খুব লিমিটেড।"

"পাঁচ ডলারের মধ্যে আমাদের অনেক স্ট্যাম্প আছে। কুড়ি, পঁচিশ□ এমন কি একশো ডলারের স্ট্যাম্পও বেশ কয়েকটা আছে। বেশি দামের স্ট্যাম্পও জোগাড় করে দিতে পারি। তবে একটু সময় লাগতে পারে।"

দোকানটা বাইরে থেকে যতটা ছোটো মনে হয়েছিল ততোটা নয়। ভেতরটা বেশ লম্বা হলের মতো, দু'ধারে ডিসপ্লে-তে অজস্র স্ট্যাম্প। পেছনে কাচের আলমারিতে ফাইলের পর ফাইল সাজানো। ইন্ডিয়ার প্রচুর স্ট্যাম্প রয়েছে দেখলাম, দামও বেশি নয়। বেশি দামের মধ্যে একটাই শুধু চোখে পড়ল, পঞ্চান্ন ডলার।

"সত্যি স্যার, এক্সেলেন্ট কালেকশন আপনাদের। আমি তো ভাবিইনি এত স্ট্যাম্প আছে এখানে। আজ তাড়া আছে, আরেকদিন এসে ভালো করে দেখব।"

"বেশ তো, আমরা শুধু রবিবার বন্ধ থাকি।"

বেরোবার পথে একেনবাবু হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "ভালো কথা স্যার, আপনারা তো স্ট্যাম্প কেনেন না□ তাই না?"

"কেন কিনব না? নিশ্চয় কিনি।"

একেনবাবু এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলেন স্যার? আপনি যে বলেছিলেন কাস্টমার না থাকলে এঁরা কেনেন না? সেটা ঠিক কথা নয়।"

আমি উত্তরে কী বলব বুঝে উঠতে পারার আগেই দোকানের ভদ্রলোক বললেন,

“সেটা বেশি দামের স্ট্যাম্পের বেলায়। পাঁচ দশ ডলারের স্ট্যাম্প আমরা নগদ দিয়ে কিনি। একশো বা তার বেশি দামের স্ট্যাম্প সাধারণত নিলামে বিক্রি হয়। আমাদের চেনাজানা কিছু বড় কালেক্টর আছেন, তাঁরা পছন্দসই স্ট্যাম্পের খবর পেলে অনেক সময়ে আমাদের কাছ থেকে সোজাসুজি কিনে নেন।”

“এবার বুঝেছি স্যার, আসলে এঁর এক বন্ধু কিছুদিন আগে আপনাদের দোকানে একটা দামি স্ট্যাম্প বিক্রি করতে এসেছিলেন, তখন সেটাই বোধহয় আপনারা বলেছিলেন।”

“কবে এসেছিলেন?”

“টাইমটা তো ঠিক বলতে পারব না।”

“কী নাম বলুন তো?”

“মিস্টার অশোক দুবে।”

“ও ইয়েস, লজেন্স ক্যানসেলের ছাপ মারা হাফ-অ্যানা সিন্ডে ডক স্ট্যাম্প। ইট ওয়াজ ইন এক্সেলেন্ট কনডিশন।” তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “উনি আপনার বন্ধু?”

আমি কিছু বলার আগেই একেনবাবু বললেন, “হ্যাঁ, স্যার।”

“বাঁচালেন! কয়েকজন ইন্টারেস্টেড, কিন্তু আপনার বন্ধু যে ফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা নট-ইন-সার্ভিস, তাই যোগাযোগ করতে পারছি না। ওঁর অন্য কোনও ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?”

“থাকলেও লাভ হত না স্যার, হি ইজ ডেড।” একেনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন।

“ও মাই গড! সো সরি টু হিয়ার দিস!”

“কবে উনি এসেছিলেন স্যার, মনে আছে?”

“না, ঠিক কবে মনে নেই। শুধু ফোন নম্বরটা লিখে রেখেছিলাম।”

“চলি স্যার।” বলে দোকানদার ভদ্রলোককে প্রায় হতভম্ব অবস্থায় রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম।

আমার কাছে ব্যাপারটা এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। বাইরে বেরিয়েই আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “তাহলে কি অশোকই বিপাশা মিত্রের ছবির খামটা চুরি করেছিলেন?”

“সেটাই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে স্যার। কাল যখন আপনি বললেন, এই দোকানের কেউ আপনাকে ভুল লোক ভেবে বলেছে, আপনার স্ট্যাম্পের খরিদ্দার পাওয়া গেছে□তখনই সন্দেহটা হল।”

“তা বুঝলাম, কিন্তু সেটা অশোকবাবু হতে যাবেন কেন?”

“কারণ, দেবরাজ সিং প্রথম দিন এসে বলেছিলেন, আপনার চেহারার সঙ্গে অশোকবাবুর মিল আছে।”

“কে জানে, আমার কিন্তু সেরকম মনে হয়নি, অবশ্য আমি অশোককে দেখেছি খুব অল্প সময়ের জন্যেই।”

“আমি কিন্তু একটু কনফিউসড স্যার।”

“কেন?”

“আপনি তো স্ট্যাম্পের অনেক খবর রাখেন, সিন্ডে ডক-এর কথা আপনি জানতেন?”

“আমি স্ট্যাম্পের খবর কিছুই জানি না।”

“সে কি স্যার, আপনি যে সেদিন ট্রেসকিলিং ইয়েলো স্ট্যাম্পের কথা বললেন!”

"ওই একটা নামই জানতাম।"

"ইন্টারেস্টিং," একটু মাথা চুলকোলেন একেনবাবু। "আসলে স্যার, যাঁরা স্ট্যাম্প জমান তাঁরা এসব জানেন। কিন্তু অশোকবাবু জানলেন কী করে? মনে আছে, অশোকবাবু স্ট্যাম্প জমান কিনা জানতে চেয়েছিলাম ইন্দ্রবাবুর কাছে? তিনি তো বললেন, 'না'।"

"হয়তো ছেলেবেলায় জমাতেন।"

"তা হতে পারে স্যার।" একেনবাবু মাথা নাড়লেন।

"এছাড়া অশোক নিশ্চয় যখন খামটা দেখেছিলেন, ভিতরের চিঠিটাও পড়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল না□তোমাকে অমূল্য ধন পাঠালাম?"

"ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড পয়েন্ট স্যার।"

"আমার কী মনে হয় জানেন, অশোক যখন বিপাশা মিত্রের পার্টিটা অ্যারেঞ্জ করছিলেন, তখন নিশ্চয় বার কয়েক ওঁর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন। বিপাশা মিত্র হয়তো এক সময়ে ভিতরে ছিলেন না বা কিছু, তখনই অশোক খামটা পায়। ও ক্রিমিন্যাল নয়, তবে বড়লোকদের টাকা নিয়ে গরিবদের কাজে লাগানোর মধ্যে বোধহয় কোনও অপরাধ দেখেনি।"

"খুবই সম্ভব স্যার। কিন্তু অশোকবাবুকে খুন করল কে?"

"সেটাই বার করতে হবে। ইন ফ্যাক্ট, সেটা বার করলে, আপনার দুটো কেসই সল্ভড হয়ে যাবে।"

"আপনার কী মনে হয় স্যার, খুনি ওই স্ট্যাম্পের লোভেই অশোকবাবুকে খুন করেছে?"

"তাই তো মনে হয়। অশোকের মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড□ কিচ্ছু চুরি যায়নি। চুরি গেছে একটা খাম, যার খবর কারোরই জানার কথা নয় খুনি ছাড়া।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, তার মানে খুনিকে অশোকবাবু স্ট্যাম্পের কথা বলেছিলেন।"

"নিশ্চয়, একজনকে তো বলেইছিলেন।"

"কাকে স্যার?"

"কাকে আবার, ফিলাটেলিস্ট কর্নারের ওই দোকানদারকে!"

"ও হ্যাঁ, ঠিক কথা। বন্ধু ইন্দ্রবাবুকে কি বলেছিলেন?"

"ইন্দ্র তো অস্বীকার করলেন, কোনও চিঠি বা স্ট্যাম্প দেখেছেন বলে। তাছাড়া ওঁর অ্যালিবাই আছে, বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন।"

"ট্রু স্যার। তবে কিনা, এই অ্যালিবাই আর থাকে না, যদি ওঁরা সবাই এই মার্ডারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।"

"সেটা কি সম্ভব?"

"নাথিং ইজ ইমপসিবল স্যার। কাউকেই সাসপেক্ট লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যায় না। এই দোকানদারকে দেখে আপনার কী মনে হল?"

"মনে হয় ভদ্রলোক ইনোসেন্ট, নইলে আমাদের এই স্ট্যাম্পের কথা বলতেন না, চেপে যেতেন।"

"একটা প্রশ্ন করা হল না স্যার। অশোকবাবু যখন স্ট্যাম্পটা এনেছিলেন, তখন দোকানে আর কেউ ছিলেন কিনা। খুনি হয়তো একজন স্ট্যাম্প কালেক্টর স্যার। অশোকবাবু যখন স্ট্যাম্পটা দেখাচ্ছেন, তখন নিশ্চয় খুনি সেটা দেখেছিলেন। সে ক্ষেত্রে খুনিকে ধরা সহজ ব্যাপার হবে না।" বলতে বলতে একেনবাবু হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে আমরা ইউনিভার্সিটির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি।

"আপনি যান স্যার, আমি একটা কাজ সেরে আসি।"

কী কাজ, কোথায় চললেন, কিছু না জানিয়েই অদৃশ্য হলেন। টিপিক্যাল একেনবাবু!

।। ১২ ।।

কলেজে আমার ঘরে ঢোকার মুখে যে অফিস রয়েছে সেখানেই বেভ বসে। সাধারণত, আমি চট করে 'হায়' বলে ঘরে ঢুকি। আজকে তা না করে বেভের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপর হাতটা রেখে বললাম, "হ্যালো।"

বেভ কম্পিউটারে কিছু একটা টাইপ করছিল। সেটা থামিয়ে মুখ তুলে উত্তর দিল, "হ্যালো।"

কয়েক সেকেন্ড চলে গেল কী ভাবে কথাটা শুরু করব ভাবতে গিয়ে।

বেভের চোখ ভাসা ভাসা, "ইয়েস?"

হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করতে পারি?"

"পারো, তবে আমার সেক্স-লাইফ নিয়ে কোনও কোয়েশ্চেন নয়।" তারপর একটু দুষ্টু হেসে যোগ করল, "অন্তত আরেকটু পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত।"

নো ওয়ান্ডার রামসুন্দর রেড্ডী কেন সতর্ক করেছিল! লাল হচ্ছি দেখে আলতো করে আমার হাতটা ছুঁল বেভ।

"জাস্ট কিডিং, কী কোয়েশ্চেন বলো?"

"কিশোরের কাছে শুনেছি, তোমার আন্ট মিশেল হোবোকেন-এ থাকেন। উনি কি কোনও স্যুপ কিচেনের সঙ্গে যুক্ত?"

"ইয়েস," বেভের মুখ-চোখের ভাব হঠাৎ পালটে গেল। সহজ খুশিতে ঝকমক করে উঠল। "তুমি আন্টি মিশেলকে চেন? আমি ওর কাছেই বড় হয়েছি। আমার মায়ের মতো।"

"আই নো অফ হার। আমার একজন পরিচিত ওঁকে চিনতেন।"

"হু ইজ হি অর ইজ ইট শি?"

"ইজ নয় ওয়াজ, হি ইজ ডেড।"

"ওয়েট এ মিনিট, তুমি কি সেই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ম্যানেজারের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, অশোক দুবে।"

"ও মাই গড! আন্টি মিশেল এত আপসেট হয়েছে ওঁর মৃত্যুর খবরে... কিছুতেই ভাবতে পারছে না, ওরকম একজন চমৎকার ইয়ং ম্যানকে কে খুন করল!"

"হোপফুলি সেটা জানা যাবে, আমার পরিচিত একজন ভালো প্রাইভেট ডিটেকটিভ অশোকের মৃত্যুর তদন্ত করছেন।"

"সত্যি? খুব ভালো কথা, আন্টি মিশেল শুনলে খুশি হবে। হোবোকেনের পুলিশের উপর ওর একেবারেই ভরসা নেই।"

"ওঁর সঙ্গে একবার হয়তো আমাদের কথা বলার দরকার হতে পারে। উনি কি রাজি

হবেন?”

“কেন হবে না, আমাকে আগে থাকতে জানিও, আমি বলে রাখব। আর কিছু?”

“আপাতত আর কিছু নয়।”

“তাহলে কি পরে?” চোখে আবার সেই দুষ্টুমির ঝিলিক।

আমি একটু হেসে আমার ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছি, বেভের গলার স্বর হঠাৎ নিচু হয়ে গেল। “থ্যাঙ্ক ইউ ফর স্টপিং বাই, এন্ড সেইং হ্যালো টু মি।”

ঠাট্টা নয়, আন্তরিক ভাবেই কথাটা বলল।

কিছু কিছু মেয়ে আছে, যারা ছেলেদের একটু খেলাতে ভালোবাসে— ওয়ান্টস টু প্লে উইথ মেন, কিন্তু মনের ভেতরটা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। কে জানে, বেভ হয়তো সে রকম ধরনেরই মেয়ে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখলাম একেনবাবু আর প্রমথ ইন্টারনেটে কী জানি দেখছে।

“কী দেখছিস?” কাঁধের ব্যাগটা নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করলাম।

“সিন্ধ ডাক-এর দাম,” প্রমথ উত্তর দিল।

“নামটা সিন্ডে ডক,” আমি বললাম। “ফিলাটেলিস্ট কর্নারে ওই নামটাই শুনেছি।”

“জায়গাটার নাম সিন্ধ, সিন্ডে নয়। আর পোস্টাল সার্ভিসকে বলা হয় ডাক— ডক নয়। তোকে তো সায়েবরা ব্যাপি ডে বলে ডাকে— তোর নাম কি ব্যাপি ডে?”

প্রমথর সঙ্গে তর্ক করার কোনও অর্থ হয় না। সংসারে দু’ধরণের লোক আছে। একদল, যারা ভাবে তারা জানে। আরেকদল, যারা জানে তারা জানে। প্রমথ হল দ্বিতীয় দলের লোক। প্রথম দলের লোকদের তবু যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে সে চেষ্টা বৃথা।

চোখে কিছু একটা পড়েছিল, সেটা ধুতে বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী আবিষ্কার করলি?”

“কোন আবিষ্কারের কথা জিজ্ঞেস করছিস? আবিষ্কার তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু করি।”

“চ্যাংড়ামি করিস না, স্ট্যাম্পের দামের কথা জানতে চাইছি।”

“তেমন দামি নয়। ছাপ-মারা স্ট্যাম্প হলে বড়জোর আট ন’হাজার ডলার। ছাপ-মারাই তো বলেছিল, তাই না?”

“হ্যাঁ, লজেন্স ক্যানসেল বা ওই জাতীয় কিছু।”

“ওই হল, মানে পোস্ট অফিসে ক্যানসেল হওয়া স্ট্যাম্প, মিন্ট কনডিশন নয়। মিন্ট কনডিশন হলে আরও বেশি হত।”

“কিন্তু আট ন’হাজার ডলার কম হল নাকি?”

“ও, তার মানে তুই হলে ওই টাকার জন্যে একটা লোককে খুন করতিস?”

“আমার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি কোটি টাকা পেলেও কাউকে খুন করব না।”

“শুনুন একেনবাবু, একটু আগে তো আপনি বাপিবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছিলেন— কী বিনয়ী, কী ভদ্র! এখন শুনলেন তো নিজের মরালিটি নিয়ে কিরকম বড়াই করছে!”

“যাই বলুন স্যার, আমি কিন্তু কনফিউসড,” একেনবাবু বললেন।

“কনফিউশনটা কিসে?” প্রমথ এবার একেনবাবুকে নিয়ে পড়ল। “সিন্ধ ডাক নিয়ে, ন’হাজার ডলার কম কি বেশি নিয়ে, না বাপি কোটি টাকা পেলেও খুন করবে না - তাই নিয়ে?”

"তা নয় স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে এই নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল। ওঁর কাছ থেকে খবর পেলাম, হোবোকেনের কাছে গোটা ছয়েক স্ট্যাম্প ডিলার আছে। নিউ হেরিটেজ হোটেলের কাছাকাছিও আছে অনেকগুলো। তাদের কাছে না গিয়ে এতদূরে অশোকবাবু এলেন কেন?"

"হয়তো এদিকে কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন," আমি বললাম।

"পসিবল স্যার, কিন্তু প্রবাবল নয়। সত্যিই যদি টাকার জন্যে স্ট্যাম্প চুরি করে থাকেন, তাহলে সেই দামি স্ট্যাম্প সঙ্গে নিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

"আপনি কী বলতে চান?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"হয়তো আমরা ভুল দিকে এগোচ্ছি স্যার। যিনি স্ট্যাম্প বিক্রি করতে এসেছিলেন, তিনি অন্য লোক। এই স্ট্যাম্পের সঙ্গে অশোকবাবুর কোনও সম্পর্কই নেই।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, তা কী করে সম্ভব! দোকানদার তাহলে অশোকের নাম করল কেন?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

"আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার, আই অ্যাম টোটালি কনফিউসড।"

"তার মানে তো আপনি ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান," প্রমথ বলল। "যেই তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন।"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে স্যার।"

"তাহলে এখন কী করবেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখি স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে যদি কোনও খবর পাই।"

"আর কী খবর দেবেন?"

"উনি খোঁজ নিচ্ছেন নিউ ইয়র্কের স্ট্যাম্প ডিলারদের কেউ দিন পনেরোর মধ্যে এই সিন্ধ ডাক স্ট্যাম্প কেনাবেচা করেছে কিনা।"

"যদি করে থাকে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"বেচাকেনার ব্যাপারটা ১৩ তারিখে আগে হলে তিনি অশোক, পরে হলে অশোকের খুনি।"

"তার মানেটা কী দাঁড়াল? সিন্ধ ডাক স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে যে ফিলাটেলিস্ট কর্নারে এসেছিল, সে অশোক নয়, অশোকের খুনি? তাই বলতে চান?"

একেনবাবু নির্বিকার ভাবে বললেন, "জানি না স্যার, কারণ কবে এসেছিলেন সেই ডেটা পয়েন্ট মিসিং। কিন্তু ভেরি কনফিউসিং।"

"ফটোটার কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? বিপাশা তো ফটোটার কথাই বলেছিল, স্ট্যাম্পের কথা নয়। ছবিটা যদি স্টাইচেনের হয়, তাহলে তো লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যাপার!" আমি বললাম।

"তাও ঠিক স্যার।"

"তাহলে?"

"সেটা আরেকটা কনফিউইসিং ব্যাপার স্যার। স্টাইচেনের ছবির দাম এখন হয়তো অনেক হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ যখন ওটা বিপাশা মিত্রের ঠাকুরদার বাবাকে দিয়েছিলেন, তখন তার দাম কি এত ছিল? রঙিন ছবি তো অনেকেই তুলতেন সেকালে। চিঠিতে 'একটা অমূল্য ধন পাঠালাম' লিখলেন কেন?"

"ওই চিঠিটা হয় তো একটা ঠাট্টা," আমি বললাম। "কথাটা মহারাজ হয়তো মজা করেই লিখেছিলেন। আমরা সেটা নিয়ে এত অ্যানালিসিস করছি দেখে উনি স্বর্গে বসে

হাসছেন।”

“এটা মোক্ষম বলেছেন স্যার, চিঠিটাকে বেশি ভ্যালু দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু স্ট্যাম্প আর ফটোটা স্যার ফেলনা নয়। ওগুলো যদি দামি হয়, তাহলে চিঠিতে যাই লেখা থাকুক ওগুলো দামিই থাকবে।”

“মানছি, কিন্তু স্ট্যাম্পের ব্যাপারে যদি বা কিছু লিড পেয়েছি, ফটোর ব্যাপারে তো কিছুই পাওয়া যায়নি?”

“তা যায়নি স্যার।”

“আমার একটা নতুন চিন্তা মাথা এসেছে,” প্রমথ ঘোষণা করল।

“কী স্যার?”

“অশোকের খুনি অশোককে খুন করতে চায়নি, চেয়েছিল বাপিকে খুন করতে। দেবরাজবাবু বললেন না, বাপির মতো চেহারা ছিল অশোকের? বাপি ছাত্রদের যেরকম আজেবাজে গ্রেড দেয়, ওর তো শত্রুর অভাব থাকা উচিত নয়। আপনি সেই অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটা দেখুন।”

“আপনি না স্যার, সত্যি!” একেনবাবু বেশ অ্যামিউজড স্বরে বললেন।

আমি প্রমথকে ধমকে বললাম, “আজেবাজে না বকে, একটু সিরিয়াস হ।”

তারপর বেভের সঙ্গে আমার সকালের কথাবার্তা জানিয়ে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “একবার এই মিশেলের সঙ্গে কথা বলতে চান?”

“আমি বেভের সঙ্গেও কথা বলতে চাই, খাসা চেহারা মেয়েটার,” প্রমথর উত্তর।

“চ্যাংড়ামি করিস না! কি একেনবাবু, বেভকে বলব?”

“বলুন না স্যার, ক্ষতি তো কিছু নেই। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলা হয়নি, ম্যাডাম ক্যাথি ক্যাসেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি মিস্টার ক্যাসেলের মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের একটু সাহায্য চান।”

“কী সাহায্য?”

“সত্যি কথা বলতে কি স্যার, ওঁর কথা পরিষ্কার বুঝলাম না। মনে হয় ভোকাল কর্ডের কোনো সমস্যা আছে। যাই হোক, কাল বিকেলে পাঁচটা নাগাদ ওঁর কাছে যাব বলেছি। ম্যাডাম একটা ঠিকানা বললেন, ধরতে পারলাম না। তবে সতীশবাবু, মানে মিস্টার সতীশ কুমার এর মধ্যে ফোন করে সব ডিটেলস দিয়ে দেবেন বললেন। আপনারা পারবেন আসতে?”

।। ১৩।।

মঙ্গলবার মে ২৪, ২০১১

ঘুম থেকে উঠে দেখি, একেনবাবু কোথাও বেরিয়েছেন। প্রমথকে জিজ্ঞেস করতেই খ্যাঁকখেকিয়ে উঠল, “আমি কি একেনবাবুর গার্জেন, কোথায় যাচ্ছেন, না-যাচ্ছেন তার খবর রাখব?”

“কী ব্যাপার, সাত সকালে মেজাজটা এত গরম কেন?”

“দেখবি আয়,” প্রমথ আমায় টেনে নিয়ে কিচেনে গেল। “দেখছিস?”

কী দেখাতে চায় মাথায় ঢুকল না। “কীসের কথা বলছিস?”

“চিনির কৌটোটা!”

চীনেমাটির কৌটোটা অক্ষত অবস্থাতেই আছে, চিনিও রয়েছে সেখানে।

“ঠিকই তো আছে,” আমি বললাম।

“চামচটা তোল।”

চামচটা তুলতেই প্রমথর অসন্তোষের কারণ স্পষ্ট হল। চামচের মুখে একগাদা চিনি লেপটে আছে। একেনবাবু চায়ে চিনি দিয়ে ঘেঁটে সেই চায়ে-ভেজা চামচটাই আবার চিনির কৌটোতে ঢুকিয়ে রেখেছেন! চা ঘাঁটার জন্যে অন্য চামচ ব্যবহার করেননি। প্রমথর কাছে এটা সিম্পল কেস অফ নেগলিজেন্স নয়, একটা ফেডারেল ক্রাইম।

“বার বার বললাম, ‘একটু অপেক্ষা করুন, আমি কফি বানাচ্ছি’। ‘না, আমার তাড়া আছে’ বলে নিজে ওস্তাদি করে কফি বানালেন আর দেখ তার পরিণাম।”

“ঠিক আছে, আমি চামচটা ধুয়ে দিচ্ছি।”

“থাক, আমিই ধুচ্ছি। কফি খাবি?” প্রমথ কফি মেকারে জল ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করল।

“খাওয়ালেই খাব। তা, একেনবাবুর ওঁর তাড়ার কারণ নিয়ে কিছু বললেন?”

“পরিষ্কার করে কি উনি কিছু বলেন? নিউ হেরিটেজ হোটেলে কী একটা কাজ আছে বলে ছুটলেন।”

“নিউ হেরিটেজ হোটেলে আবার কী কাজ?” আমি একটু অবাক হয়েই বললাম। “কোনও ফোন এসেছিল?”

“না।”

“কখন ফিরবেন কিছু বলেছেন?”

“না। এখনও মোবাইল ফোন কেনেননি, সুতরাং কন্ট্যাক্ট করারও উপায় নেই। যাই বলিস, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আমার একটু আস্থা ডেভালাপ করছে। শনির দশাই চলছে ওঁর, মাথাটা একেবারে গেছে! কালকে কি রকম সব উলটো-পালটা কনক্লুশান করছিলেন দেখেছিলি?”

আমি অবশ্য মনে করতে পারলাম না কোন কনক্লুশনের কথা প্রমথ বলছে, কিন্তু এ নিয়ে এখন তর্ক শুরু করার কোনও মানে হয় না। কফি খেয়ে আমি স্নান করতে চলে গেলাম।

স্নান করে বেরিয়ে দেখি প্রমথ কলেজ চলে গেছে। আরেক কাপ কফি নিয়ে একমাস ধরে যে পেপারটা লেখার চেষ্টা করছি সেটা নিয়ে বসলাম। এটা কেউ পড়বে কিনা, বা পড়ে উপকৃত হবে কিনা সেটা বলতে পারব না। তবে এটা জানি, না লিখলে আমার ক্ষতি হবে। ইউনিভার্সিটিতে চাকরি বজায় রাখতে গেলে সায়েন্টিফিক জার্নালে দুয়েকটা পেপার প্রতি বছর বার করতেই হবে, নো চয়েস। লেখাটা নিয়ে লড়াই করতে করতে প্রায় এগারোটা বাজল, কিন্তু কিছুই বিশেষ এগোলো না। “ধুত্তোর“ বলে যখন কলেজ যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, একেনবাবু এসে হাজির।

“কোথায় গিয়েছিলেন সাত-সকালে?”

“দেবরাজবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।”

“এত সকালে?”

"কী করব স্যার, উনি বললেন ন'টার সময় একটা মিটিং-এ যাবেন। সেখান থেকে সোজা বস্টন না কোথায়।"

"কী এমন জরুরি ব্যাপার ছিল আপনার?"

"কয়েকটা জিনিস ক্ল্যারিফাই করলাম স্যার।"

"যেমন?"

"অশোকবাবু ওঁর কাছে টাকা অ্যাডভান্স চেয়েছিলেন কিনা, অশোকবাবুর পার্সোনাল রেকর্ড দেখা যায় কিনা□এইসব আর কী।"

"উত্তর পেলেন?"

"হ্যাঁ স্যার। ইন্দ্রবাবু ঠিকই বলেছিলেন। তবে দশ হাজার নয়, আট হাজার ডলার অ্যাডভান্স চেয়েছিলেন দেবরাজবাবুর কাছ থেকে। ইন্দ্রবাবুও এ নিয়ে তদবির করেছিলেন অশোকবাবুর হয়ে। যেদিন অশোকবাবু মারা যান, সেদিন বিকেলে দেবরাজবাবু অশোককে জানিয়েছিলেন টাকাটা দেবেন। কিন্তু অফিস থেকে নয়, পার্সোনাল লোন হিসেবে। অফিস থেকে এই ভাবে অ্যাডভান্স দিলে, অনেকেই অ্যাডভান্স চেয়ে বসবে। একজনকে দিলে অন্যজনকে 'না' বলা যাবে না।"

"ইন্টারেস্টিং," আমি বললাম। "ইন্দ্র বলেছিলেন দশ হাজার, কিন্তু দেবরাজ বলছেন আট হাজার। তফাৎটা কেন?"

"হু নোজ স্যার। যাইহোক, অশোকবাবুর পার্সোনেল রেকর্ডের ফাইলটা দেখলাম। ওঁর বাবার ঠিকানা আর ফোন নম্বর টুকে এনেছি। অশোকবাবুর পিসতুতো দিদির ফোন নম্বরও রেফারেন্স হিসেবে রেকর্ডে ছিল। আরেকটা জিনিস রেকর্ডে ছিল সেটা হল, ওঁর কী কী হবি, তার লিস্ট। সেই লিস্টে রিডিং রিলিজিয়াস বুকস আর ফটোগ্রাফি ছিল।"

"ফটোগ্রাফি, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং।"

একেনবাবু উত্তরে কিছু বললেন না। তবে দেখে মনে হল, খবরগুলো জোগাড় করে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

"কত বয়স হয়েছিল ওঁর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"মাত্র ৩৬ বছর। সো স্যাড স্যার□ ডায়েড ইন দ্য প্রাইম অফ হিস লাইফ।"

"সত্যিই স্যাড।"

"কিন্তু এই তো জীবন, স্যার□ আসে আর যায়!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিলসফিক্যাল কমেন্ট করলেন একেনবাবু। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এখন কলেজ যাচ্ছেন স্যার?"

"হ্যাঁ, একটার সময় একটা মিটিং আছে।"

"যান স্যার, যান। আমি একবার তিনটে নাগাদ হয়তো আপনার অফিসে আসব।"

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে বললেন, "দেবরাজবাবু সস্তায় নীলা পাবার একটা সোর্স দিয়েছেন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু কিনতে চাই না।"

"তার জন্যে অফিসে আসতে হবে কেন? বাড়িতে ফিরে আসার পরেও তো আলোচনা করতে পারেন!"

"না স্যার, সাড়ে তিনটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দেবরাজবাবুই করে দিয়েছেন। একশো পঁচিশ ডলারে জেনুইন নীলা, সাইজ অবশ্য ছোটো।"

"কিনে ফেলুন, এতে এত ভাবার কি আছে?"

"ঠিক আছে স্যার, কিন্তু তাও একবার আসব। তারপর তো ম্যাডাম ক্যাথি ক্যাসেলের কাছে যেতে হবে। আপনি আসছেন তো?"

"দেখি।
দেখি, আবার কী স্যার! আপনি না এলে কী করে চলবে? প্রমথবাবুর কী একটা কাজ আছে, উনি আসবেন না।"
"ঠিকানাটা পেয়েছেন?"
"হ্যাঁ স্যার, সতীশবাবু দিয়েছেন। এই দেখুন," বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।
ওয়েবার অ্যাভেনিউয়ে 'গোল্ডেন লজ' অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ওয়েবার অ্যাভেনিউ নিউ ইয়র্ক সিটিতেই, কিন্তু ম্যানহাটানে নয় ব্রঙ্কসে। জায়গাটা মোটামুটি কোথায় জানা ছিল। ট্রেন বা বাসে যেতে গেলে একাধিক বার চেঞ্জ করতে হবে।
"ওখানে তো গাড়ি নিয়েই যেতে হবে মনে হচ্ছে।"
একেনবাবু চুপ করে রইলেন। আমাকে সঙ্গে নেবার প্রয়োজনীয়তা এবার স্পষ্ট হল।

।। ১৪।।

অফিসে ঘরে ঢুকে দেখি রামসুন্দর রেড্ডী আমার ঘরে বসে আছে।
"আরে তুমি, কী খবর?"
"হেলেন বলল একটার সময়ে তোমার একটা মিটিং আছে, হয়তো এখনই চলে আসবে। ভাবলাম একটু অপেক্ষা করেই যাই, দেখা হয়ে যাবে।"
আমি টেবিলে ব্যাগটা রাখতে রাখতে বললাম, "ভালো করেছ। আছ কেমন? অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।"

রামসুন্দর আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এসে বলল, "কিশোর রাও তো তোমার বন্ধু, তাই না?"
"একসঙ্গে পড়েছি, কেন বল তো?"
"ও সুইসাইড করতে চলেছে, তোমার ঠেকানো উচিত।"
"সুইসাইড?"
"হ্যাঁ, শুনলাম ও নাকি বেভকে প্রোপোজ করেছে।"
"ইট ইজ নিউজ টু মি, তুমি জানলে কী করে?"
"আই হ্যাভ মাই সোর্সেস, কিন্তু সেটা আন-ইম্পর্টেন্ট। ইট মাস্ট বি স্টপড।"
"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? হোয়াই শুড ইট বি স্টপড? একজন প্রেম করে যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাতে আমরা বাধা দেবার কে? আর দিলেও বা সে শুনবে কেন?"
"হি উইল বি রুইনড, সেইজন্যে।"
রামসুন্দরের মুখের অবস্থা দেখে আমার প্রায় হাসি পেয়ে গেল। আমি বললাম, "শোন, রামসুন্দর, তোমার সাবধানবাণী আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। যদিও কাল বেভের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, বাইরে থেকে যাই মনে হোক, আসলে বেশ সহজ আর খোলামেলা মনের মেয়ে।"

“ও, তার মানে তোমাকেও ও মজিয়েছে,” বেশ তিক্তভাবেই রামসুন্দর কথাটা বলল।

ওর বলার ধরণটা আমার ভীষণ বাজে লাগলো, আমিও একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, তখন বাইরের থেকে দরজায় কেউ টোকা দিল।

দরজা খুলে দেখি বেভ। রামসুন্দর আর কোনও কথা না বলে প্রায় হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেভ বলল, “আই অ্যাম সরি, জেরাল্ড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান, দরকারটা জরুরি।”

টেড জেরাল্ড আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড। আমার কয়েকটা ঘর পরেই ওর ঘর। ঘরে যেতেই টেড বলল, “সরি, তোমায় তাড়া দিয়ে নিয়ে এলাম। নেক্সট ইয়ারের মাস্টার রুটিন দু’দিন বাদে পাঠানোর কথা ছিল, এখন বলছে আজকেই তিনটের মধ্যে পাঠাতে হবে। তোমার জন্যে এই ক্লাসগুলো আছে। সই করে দাও, নইলে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে।”

চোখ বুলিয়ে দেখলাম, এমন কিছু অসুবিধার নেই, একটু আধটু সময়ের হেরফের করলে হয়তো সুবিধা হত, কিন্তু তারজন্যে টেডকে ক্ষিপ্ত করার কোনও মানে হয় না।

“ফাইন, আর কিছু?”

“নাথিং, থ্যাঙ্কস।”

ঘরে ঢুকতে যাব দেখি বেভ নিজের ডেস্ক থেকে উঠে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঘুরে বললাম, “আমার কিন্তু একটার সময় মিটিং আছে।”

“আই নো দ্যাট, আমি তোমার অফিস অ্যাসিস্টেন্ট না?”

“ইয়েস,” একটু হেসে ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

“এবার বলো যা বলতে চাও।”

বেভ প্রথমে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বলল, “আমি জানি, রামসুন্দর নিশ্চয় আমার সম্পর্কে অনেক যা-তা তোমায় আগে বলেছে...।”

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, “তুমি কী করে জানলে?”

“ইভেন এ ডাম্ব অফিস অ্যাসিস্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস, কেউ যদি চার মাস ধরে কাউকে অ্যাভয়েড করে!”

বেভের এই সোজাসাপ্টা অভিযোগের উত্তরে চট করে কোনও জবাব মুখে এল না। কিন্তু ধাক্কাটা কাটিয়ে বললাম, “দেখ, অফিসে তোমাদের প্রয়োজন আমার খুব অল্প, যেটুকু দরকার সেটা হেলেনই করে দেয়। তাই তোমায় অ্যাভয়েড করার প্রশ্ন উঠছে না।”

“ইউ আর ভেরি কাইন্ড,” বেভ নিচু গলায় বলল, “তোমাকে আমি রেস্পেক্ট করি, যদি কিছু শুনেও থাক কিশোরকে সেটা বলনি বলে।”

আমি আর বেভকে লুকোলাম না। রামসুন্দর শুধু বলেছিল, “তোমাকে এড়িয়ে চলতে, অন্য কিছু নয়।”

“কিন্তু ও অনেক কথা বলেছে অন্যদের, আমার রেপুটেশন ও রুইন করেছে। ইয়েস, আই অ্যাম প্লেফুল, মজা করতে ভালোবাসি, বাট আই অ্যাম নট চিপ, আই হ্যাভ ভ্যালুজ।” ক্ষোভে দুঃখে বেভের গলা প্রায় বুজে এল।

আমার মিটিং আরম্ভ হতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, তাও জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার উপর ওর এত রাগ কেন?”

“বিকস, আই রিফিউস্ড টু স্লিপ উইথ হিম।” বেভের চোখটা জ্বলে উঠল। “ওর

ধারণা আমরা সাদা মেয়েরা সব স্লাট্স, হি মেড মি ড্রাঙ্ক, যাতে বাধা না দিতে পারি। বাট আই স্ল্যাপড হিম।"

"মাই গড!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আজ লাঞ্চে একজন বলল, ও নাকি কাউকে দিয়ে কিশোরকে বলাবে, আমায় বিয়ে করে দেশে বেড়াতে নিয়ে গেলে, হি উইল গেট বোথ অফ আস অ্যারেস্টেড... ওর বাবা নাকি ইন্ডিয়ার বিগ শট।"

"কীসের জন্য অ্যারেস্ট করবে?"

"তা জানি না। ওর বাবা পুলিশের একজন বিরাট অফিসার। একটা ফল্স চার্জ এনে জেলে পুরবে। আই নো তুমি বিজি, তোমার মিটিং আছে। এভাবে আমার পার্সোনাল প্রব্লেম বলে তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না।" ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। আর দেরি করা যাবে না, আমাকে এবার যেতে হবে। "দ্যাটস ওকে," বলে দরজার দিকে এগোলাম। ওই দরজাটা খুলে দিল। বেরিয়ে যাবার আগে, নিজের অজান্তেই বেভের কোনুইটা ছুঁয়ে বললাম, "আই অ্যাম সো সরি টু হিয়ার অল দিজ।"

মিটিং-এর পরেও আটকা পড়লাম। দুয়েকটা লোক মিটিং শেষ হয়ে গেলেও ঘোঁট পাকাতে ভালোবাসে। তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পেতে প্রায় তিনটে বাজল। ঘরে এসে দেখি একেনবাবু বসে আছেন।

"বুঝলেন, স্যার, প্রমথবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। ভেবে দেখলাম নীলা-ফিলা না কেনাই ভালো।"

"এত উত্তম কথা।"

"আসলে কী জানেন স্যার, আমার ফ্যামিলি এগুলো ভীষণ মানে।"

"আপনি মানেন না?"

"আমি মানি না বলব না স্যার, তবে কিনা অতটা মানি না। আর ভাগ্যে কিছু থাকলে নীলা কি আর আটকাতে পারবে?"

"এটাও খাঁটি কথা। তা বউদিকে কী বলবেন?"

"সেটাই সমস্যা ছিল। কিন্তু প্রমথবাবু তার সমাধান করে দিয়েছেন।"

"কী সমাধান?"

"ওঁর ল্যাবে আর্টিফিশিয়াল নীলার একটা ছোট্ট টুকরো ছিল, সেটা আমায় মানিব্যাগে রেখে দিতে বললেন। সুতরাং ফ্যামিলিকে নিশ্চিন্ত করতে পারব।"

"বাঃ, প্রব্লেম মিটল আবার পয়সাও তো বাঁচল।"

"তা বাঁচল স্যার, আবার ঠিক বাঁচলও না।"

"তার মানে?"

"প্রমথবাবু একটা কন্ডিশনে নীলাটা দিয়েছেন। আমাকে মোবাইল ফোন কিনতে হবে। উনিই তার ব্যবস্থা করবেন। যাই হোক স্যার, নীলা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না এতেই আমি খুশি। ওটার জন্যেই কিছুতে কনসেন্ট্রেট করতে পারছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে মাথাটা ক্লিয়ার হতে শুরু করেছে।"

"সেটা তো চমৎকার কথা, কী মনে হচ্ছে?"

"আপনাকে তো বলিনি স্যার, আজ সকালে যখন দেবরাজবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হল। ওঁর কাছ থেকে সীমা শ্রীমালী এখন

কোথায় কাজ করেন জানলাম।”

“সীমা শ্রীমালী? সে আবার কে?”

“কী মুশকিল, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন স্যার? অশোকবাবুর এক্স-গার্লফ্রেন্ড যাঁর কথা ইন্দ্রবাবু সেদিন বললেন। সেদিনই আমার ঠিকানাটা নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বলছিলাম না স্যার, মাথাটা কাজ করছিল না। মিস সীমা নিউ হেরিটেজ হোটেল ছেড়ে এখন অ্যাম্বাসেডর হোটেলে কাজ করছেন।”

“অ্যাম্বাসেডর হোটেল তো কাছেই।”

“এক্স্যাক্টলি স্যার। তাই খানিকক্ষণ আগে ওখানে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। আই ওয়াজ লাকি স্যার, মিস সীমা তখন ওখানেই ছিলেন। বেশিক্ষণ অবশ্য কথা বলতে পারিনি, ব্যস্ত ছিলেন। তারমধ্যে যা উদ্ধার করলাম, ওঁদের ছাড়াছাড়িটা হয়েছিল অশোকবাবুর জন্যেই। মাস পাঁচেক আগে মিস সীমার মা যখন এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন, অশোকবাবুকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। অশোকবাবুও ওয়াজ এ হ্যাপি এন্ড জলি পার্সন। কিন্তু মিস সীমার মা দেশে চলে যেতেই অশোকবাবুর ব্যবহার ভীষণ কোল্ড হয়ে গেল। ইট কুড ভেরি ওয়েল বি যে, ইন্দ্রবাবু আর তার ফ্রেন্ডস্রা এর জন্যে দায়ী। ইন্দ্রবাবু সেদিন পরিষ্কার বলেননি, কিন্তু ইন্দ্রবাবুর বাড়িতে যে পোকারের আসর বসত, সেটা এক-পয়সা দু-পয়সার ফ্রেন্ডলি পোকার গেম নয়, মোটা টাকার বাজি ধরে ওরা খেলত। মিস সীমা দুয়েকবার অশোকবাবুর অ্যাপার্টমেন্টে বেড়াতে গিয়ে এসব দেখে খুব আপসেট হয়েছিলেন। আরও আপসেট হয়েছিলেন যখন শুনলেন অশোককেও ওঁরা দলে ভেড়াবার চেষ্টা করছেন। অশোকবাবুকে মিস সীমা বলেছিলেন ইন্দ্রবাবুকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলতে। কিন্তু অশোকবাবু রাজি হননি। মিস সীমার ধারণা অশোকবাবু মাঝে মাঝে ইন্দ্রবাবুকে টাকাও ধার দিয়েছেন পোকারের দেনা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। আরও বললেন, এড গুয়াঙ্গিয়াল লোকটা মোটেই সুবিধার নয়।”

“কেন?”

“কেন তা বুঝলাম না স্যার। তবে মিস সীমার লোকটাকে খুবই অপছন্দ। ওই নাকি পোকারের নেশা ধরিয়েছিল সবার। যাই হোক মিস সীমা ভয় পাচ্ছিলেন, অশোকবাবুও হয়তো ওদের খপ্পরে পড়বেন। তাই আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন মা চলে গেলেই ইন্দ্রবাবুকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর, নইলে অশোকবাবুর বাড়িতে উনি যাবেন না। হয়তো তাতেই অশোকবাবুকে বিগড়ে গিয়ে সীমাকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করেন। মিস সীমা তাও সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন, শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেন। অ্যাম্বাসেডর হোটেলে চলে আসার পর অশোকবাবুর ফোন মাঝে মধ্যে পেয়েছেন, কিন্তু মিস সীমা সাড়া দেননি। দায়সারা গোছের মামুলি কথাবার্তা হয়েছে, এইটুকুই।”

“ইন্টারেস্টিং। অর্থাৎ প্রথমে সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন সীমা, পরে আবার সে চেষ্টাই করছিলেন অশোক।”

“আসলে ভালোবাসা যখন চলে যায় স্যার, তখন যেটা থেকে যায়, সেটা হল তিক্ততা। মিস সীমা বেশ কয়েকবার বললেন, ‘অশোক ওয়াজ ওয়ান্স এভরিথিং টু মি, বাট নট এনি মোর।’ এরপর স্যার, আর কিছু বলার থাকে না। তাও আমি একবার মিস সীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইন্দ্রবাবুকে তাড়াতে বলাই কি ওঁর পালটে যাবার একমাত্র কারণ, না আর কিছু থাকতে পারে?’ ওঁর উত্তর, ‘অল আই ক্যান সে, সামথিং ওয়াজ নট রাইট উইথ হিম, নট শিওর হোয়াট ইট ওয়াজ।”

“এটা কতদিন আগের ব্যাপার?”

"ভেরি রিসেন্ট, স্যার। মিস সীমা অ্যাম্বাসেডর হোটেলে এসেছেন মাস দুই হল মাত্র।"

"আপনি একটু আগে বললেন, সীমার মা এসেছিলেন মাস পাঁচেক আগে। নিশ্চয় কিছুদিন ছিলেন মেয়ের কাছে। তখন পর্যন্ত অশোকবাবু যদি ফাইন থেকে থাকেন, তাহলে তো পোকারের ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে এই ব্রেক-আপটার মূলে।"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে স্যার, তবু শিওর হওয়া দরকার।"

"বুঝলাম, কিন্তু সেটা হবেন কী করে?"

"ইন্দ্রবাবু তো বটেই, কিন্তু আরও কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার স্যার, যাঁরা অশোকবাবুকে চিনতেন। এই দেখুন না, মিস সীমার সঙ্গে দেখা না হলে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মিস করে যেতাম। ও আরেকটা জিনিস মিস সীমা বললেন, যেটা ওঁর কাছে ভেরি কনফিউসিং।"

"কী?"

"অশোকবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন বিকেলে উনি মিস সীমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। সীমাকে পাননি, কিন্তু ভয়েস মেল-এ একটা মেসেজ রেখেছিলেন। মেসেজটা ছিল ‘তুমি বিশ্বাস করবে না, আজ কী হয়েছে! আই ‘হিট দ্য জ্যাকপট’! ফোন কোরো।’ মিস সীমা সেদিন মেসেজ চেক করেননি। যখন চেক করলেন, অশোকবাবু আর নেই। ইনফ্যাক্ট স্যার, মিস সীমা জানতেনও না যে অশোকবাবু টাকা নিয়ে সমস্যায় ভুগছিলেন।"

"ইন্টারেস্টিং," আমি বললাম, "এখন তো মনে হচ্ছে স্ট্যাম্পটা অশোকই চুরি করেছিলেন। যখন স্ট্যাম্পটা সরিয়েছিলেন তখন তার আসল মূল্য বোঝেননি। যখন জানতে পারলেন, তখন ‘হিট দ্য জ্যাকপট’ই বটে।"

"সেটাই তো মনে হচ্ছে স্যার, অন্য কোনও এক্সপ্লানেশন যদি না থাকে।"

"আরেকটা এক্সপ্লানেশন থাকতে পারে। উনি পোকার খেলতে বসে বিগিনার্স লাকে বিরাট অঙ্ক জিতেছিলেন। ইন্দ্রবাবু ওঁর জেতার কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু এক পয়সা দুপয়সার খেলা বলে কথাটায় কেউ আমল দিইনি।"

"কিন্তু ইন্দ্রবাবু তো বলেছিলেন সেটা দিন কুড়ি আগের ঘটনা!"

"ইন্দ্রবাবু যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সেটা ধরছেন কেন? মনে নেই উত্তরটা দিতে ওঁর একটু ইতস্ততঃ ভাব ছিল।"

"না স্যার, ওটা এক্সপ্লানেশন হতে পারে না। জিতে থাকলেও সেটা অন্তত এক সপ্তাহ আগের ব্যাপার। বৃহস্পতিবার বিকেলে খবরটা মিস সীমাকে দেবেন কেন?"

"দ্যাটস ট্রু," এই সিম্পল জিনিসটা খেয়াল করিনি ভেবে একটু লজ্জিতই হলাম।

"পুরো ব্যাপারটাই কনফিউসিং," চোখটা বুজে অস্পষ্ট স্বরে একেনবাবু বললেন।

"আমার আরেকটা একটা জিনিস মনে হচ্ছে যার সঙ্গে পোকার বা গ্যাম্বলিং কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই।"

"কী স্যার?"

"মনে আছে ইন্দ্র বলেছিলেন, সীমা বিয়ে করতে চাপ দিচ্ছিলেন বলে অশোক পিছিয়ে গিয়েছিলেন?"

"নিশ্চয় আছে স্যার।"

"কেন পিছিয়ে গিয়েছিলেন?"

"কে জানে স্যার, হয়তো এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ফাঁদে পা দিতে চাননি।"

"ফিজিক্যাল কোনও প্রব্লেম থাকতে পারে কি, যেমন ইম্পোটেন্সি?"

“বিচিত্র কিছুই নয় স্যার।”

“অন্য কারণও থাকতে পারে। দ্য প্রব্লেম কুড ভেরি ওয়েল বি হিজ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশান। সম্ভবত ইন্দ্র আর অশোক শুধু বন্ধু ছিল না, ওদের সম্পর্ক ছিল আরও অনেক প্রাইভেট। সুতরাং ইন্দ্রকে তাড়ানো বা সীমাকে বিয়ে করা দুটোই আউট অফ কোয়েশ্চেন। কিন্তু এটা সীমাকে কী ভাবে জানাবে, সেটা অশোক বুঝতে পারছিল না।”

আমার এইসব কনক্লুশানের অবশ্য কোনো ভিত্তি নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম। একেনবাবু কিন্তু আপত্তি তুললেন না। “ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার, ভেরি গুড পয়েন্ট। অশোকবাবু সম্পর্কে আরও জানতে হবে। কার সঙ্গে কথা বলা যায় বলুন তো?”

“বেভের আন্ট মিশেলের কাছে একবার যেতে চান? আমি বেভকে অলরেডি একটা হিন্ট দিয়ে রেখেছি।”

“হ্যাঁ, স্যার, সে কথাই তো কাল হয়ে গেল।”

“তাহলে ওকে বলে একটা টাইম ঠিক করি। ভালোকথা, বেভ একটু আগে আপনার ইন্ডিয়ান কলিগদের খুব নিন্দা করছিল।”

“কোন কলিগ?”

আমি রামসুন্দর রেড্ডীর গল্পটা করে, সে যে তার পুলিশ বাবাকে দিয়ে বেভকে অ্যারেস্ট করাবার ভয় দেখাচ্ছে সেটা বললাম।

“একজন আই.জি রেড্ডীকে আমি চিনতাম স্যার, অন্ধ্রপ্রদেশের। ঘুষখোর বলে বেশ দুর্নাম ছিল। কিন্তু যাই বলুন স্যার, ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসরের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। অ্যাটেম্পটেড রেপ স্যার, মিস বেভ ফর্মালি কমপ্লেন করলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে।”

“নাও হতে পারে। এ বলবে এক কথা, ও বলবে আর এক কথা।”

“এদেশে এরকম অভিযোগ মিছিমিছি একজন লেডি করবেন কেন স্যার?”

“আপনিই তো বলেন, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। চলুন, বেভের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”

একেনবাবুকে নিয়ে বেভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

“এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম। ইনিই অশোকবাবুর মার্ডার নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছেন।”

বেভ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “প্লিজ টু মিট ইউ।”

মেয়েদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে একেনবাবু গলদঘর্ম হন। ‘মি টু ম্যাডাম, মি টু ম্যাডাম’, বলে কোনও মতে সেটা সারলেন।

“তুমি তো আজ তোমার আন্টের কাছে যাচ্ছ, তাই না?” আমি বেভকে জিজ্ঞেস করলাম।

“ইয়েস, হাউ ডু ইউ নো?”

“কিশোর বলেছে। যাই হোক, ওঁকে কিন্তু একবার জিজ্ঞেস করে নেবে, আমরা যদি ওঁকে অশোক দুবে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করি, ওঁর আপত্তি আছে কিনা?”

“আমার সঙ্গে একটু আগেই আন্টি মিশেলের কথা হয়ে গেছে। তোমরা কবে যাবে বল?”

“কালকে বিকেলে হবে না, পরশু বিকেল বা সন্ধ্যা হলে কেমন হয়? আপনি কি ফ্রি পরশু?” আমি একেনবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

"আমি তো ফ্রি। কিন্তু প্রমথবাবু যদি না পারেন?"

"প্রমথকে আমি ম্যানেজ করব।"

বেভকে বললাম, "পরশু পাঁচটা নাগাদ আমরা যেতে পারি যদি সেটা ওঁর পক্ষে কনভিনিয়েন্ট হয়।"

"বেশ আমি পরশুর কথাই বলব।"

বেভকে ধন্যবাদ জানিয়ে একেনবাবুকে বললাম, "এখন চলুন, ক্যাথি ক্যাসেলের কাছে যাওয়া যাক। আর দেরি করলে সময় মতো পৌঁছতে পারব না।"

।। ১৫ ।।

ক্যাথি ক্যাসেলের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। ওয়েবার অ্যাভেনিউ যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু আগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকার জন্যে বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। এ ধরণের জায়গায় আগে কখনো আসিনি। সতীশ কুমার একেনবাবুকে বলেছিলেন উনি লবিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। মিসেস ক্যাসেলের কথা বলতে একটু অসুবিধা হয়। তাই সতীশকেও উনি আসতে বলেছেন। কিন্তু আমরা যখন পৌঁছলাম সতীশ তখনও এসে পৌঁছোননি। তাই অপেক্ষাটা আমরাই করলাম। লবিতে যে রিসেপশনিস্টটি বসেছিল, বেশ হাসিখুশি মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলে গোল্ডেন লজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। এখানকার বাসিন্দাদের কাউকে রান্না করতে হয় না, ভাড়ার মধ্যে থাকা খাওয়া দুটোই থাকে। একটা বড় রেস্টুরেন্ট আছে, প্রতিদিন সেখানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনার সার্ভ করা হয়। হাউজ কিপিং-এর লোক আছে। বাথরুম পরিষ্কার করা, ঘর ভ্যাকুয়াম করা, বিছানা তোলা, চাদর পালটানো, এমন কি লন্ড্রি করাও তাদের দায়িত্ব। সপ্তাহে দু'দিন বুড়োবুড়িদের গাড়ি করে দোকানে নিয়ে যাওয়া তো আছেই, এছাড়া বিল্ডিং-এর মধ্যেই বিনোদনের নানান বন্দোবস্ত লাইব্রেরি, এক্সারসাইজ করার জায়গা, পুল টেবিল, সুইমিং পুল, আর্টস এন্ড ক্র্যাফটস রুম, ইত্যাদি আছে। এখানে থাকতে কত লাগে সেটা অবশ্য মেয়েটি ঠিক জানে না। এইসব কথাবার্তার মধ্যেই সতীশ কুমার এসে গেলেন। সতীশ কুমার এখানে আগেও কয়েকবার এসেছেন। মেয়েটি দেখলাম ওঁকে চেনে।

মিসেস ক্যাসেল থাকেন বারোতলায় এক-বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্টে। ঘরের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে অস্পষ্ট গলায় কেউ বললেন, "আসুন, দরজা খোলা।"

বসার ঘরটা আমাদের বসার ঘরের সাইজের মতোই হবে। একটা বড় জানলা। গদি-অলা হালকা উইকার সোফাসেট আর কফি টেবিল। দেয়ালে লাগানো টিভি। তার নীচে একটা রাইটিং ডেস্ক ও বসার চেয়ার, পাশে মাঝারি সাইজের বুক-শেলফ। ফার্নিচারগুলো নতুন, বেশ সুন্দর করে সাজানো।

মিসেস ক্যাসেল একজন শীর্ণকায়া বৃদ্ধা। ফুট রেস্টে পা তুলে সোফায় বসে আছেন। সোফার পাশে একটা ওয়াকার। হাতে বই ধরা, কিন্তু দুটো হাতই থরথর করে কাঁপছে।

মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায় ভদ্রমহিলা বেশ অসুস্থ।

মিসেস ক্যাসেলের কথাগুলো বোঝা সত্যিই কঠিন। সতীশ থাকাতে সুবিধা হল। মাঝেমাঝেই ওঁর সাহায্য লাগছিল কথাবার্তার মর্মোদ্ধার করতে। যেটুকু বুঝলাম সেটা হল, মিসেস ক্যাসেল মাত্র ছ'মাস হল এখানে এসেছেন। আগে থাকতেন নিজের বাড়িতে, নিউ জার্সিতে। ছেলেও সেখানে থাকত। বছর দেড়েক আগে মিসেস ক্যাসেল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঠিক কী অসুখ, সেটা অবশ্য স্পষ্ট করে জানতে পারলাম না। দুরারোগ্য এটুকু বুঝলাম। সেই অসুখের জেরে হাসপাতাল ও নার্সিং কেয়ারে বহুদিন থাকতে হয়েছিল। তার আকাশ ছোঁয়া বিল মেটাতে ওঁকে বাড়িটা বিক্রি করতে হয়। সঞ্চয় বলতে এখন কিছুই নেই। মাসে মাসে যা পান, সেটা হল সোশাল সিকিউরিটির টাকা। তাতে এখানে থাকা যায় না। বব ক্যাসেলই এখানে থাকার টাকাটা দিচ্ছিলেন। এখন সে ছেলে আর নেই। ছেলের মৃত্যুতে মায়ের তীব্র বেদনা তো আছেই, তার ওপর যোগ হয়েছে আর্থিক চিন্তা। এ ব্যাপারে একেনবাবু ঠিক কী করতে পারেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। সত্যিকারের সাহায্য যিনি করতে পারেন, তিনি হলেন বিপাশা মিত্র। একজন বৃদ্ধাকে ভরণপোষণ করাটা ওঁর কাছে কিছুই নয়। বিশেষ করে সেই বৃদ্ধা যখন ওঁর সেক্রেটারির মা। আমি সতীশ কুমারকে একটু নীচু স্বরেই জিজ্ঞেস করলাম, "বিপাশা মিত্র কি ওঁর সমস্যার কথা জানেন?"

প্রশ্নটা মিসেস ক্যাসেলের কান এড়াল না। বললেন, "আই ডোন্ট ওয়ান্ট চ্যারিটি।"

একেনবাবু মিসেস ক্যাসেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ছেলের কোনও লাইফ ইন্সিওরেন্স ছিল না ম্যাডাম?"

"ছিল আর সেটাই হল প্রব্লেম।" উত্তর দিয়ে বৃদ্ধা সতীশকে বললেন, ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে বলতে। তারপর ওয়াকার ধরে টুকটুক করে হেঁটে বোধহয় বাথরুমে গেলেন।

সতীশ বললেন, "বব তিনশো হাজার ডলারের একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছিল বছর দুই আগে। ক্যাথি ছিল নমিনি। কিন্তু সেই টাকা ইন্সিওরেন্স কোম্পানি দিচ্ছে না।"

"কেন দিচ্ছে না স্যার?"

"কারণ ইন্সিওরেন্সটা করা হয়েছিল ২০০৯ সালের পয়লা জুলাই। ইন্সিওরেন্সের একটা ক্লজ ছিল, যেটা প্রায় সব ইন্সিওরেন্সেই থাকে। ক্লজটা হল যার লাইফ ইন্সিওরেন্স সে যদি দু'বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করে, তাহলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কোনও টাকা দেবে না। বব দু'বছর পার হবার আগেই মারা গেছে। পুলিশ বলছে সম্ভবত সুইসাইড। সুতরাং ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ন্যায্য অজুহাত আছে টাকা না দেবার।"

"আই সি স্যার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমি কী ভাবে ম্যাডামকে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি জানি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আপনার বিশেষ বন্ধু," সতীশ বললেন। "এই মহিলার কথা বিবেচনা করে তিনি যদি এটাকে হোমিসাইড বলে ইনভেস্টিগেট করেন। খুনি না হয় নাই ধরা পড়ল, কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্যাথির সমস্যার সমাধান হয়।"

"সেটা আমি কী করে অনুরোধ করব স্যার, আর করলেও ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এরকম অন্যায় অনুরোধ রাখবেন কেন?"

সতীশ কথাটা শুনে চুপ করে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিশ এটা সুইসাইড বলে ভাবছে কেন জানেন?"

"আমি যতটুকু জেনেছি একটা ফোনের মেসেজ থেকে।"

“কী মেসেজ স্যার?”

“ক্যাথি যখন নীচে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন, তখন বব এখানে ফোন করে। মেসেজটা ছিল ‘আমাকে পাবে না, তোমার সব সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছি।’”

“দ্যাটস লিটল স্ট্রেঞ্জ স্যার।”

“পুলিশ মনে করছে, এটাই ববের সুইসাইড মেসেজ। ইন্সিওরেন্সের টাকা ছাড়া কী করে সব সমস্যার সমাধান হয়? বব বোধহয় ভুলে গিয়েছিল ইন্সিওরেন্সের দু’বছরের ক্লজ-এর কথা।”

“আই সি। আচ্ছা এখানে থাকা কি খুব খরচার ব্যাপার?”

“মাসে সাড়ে তিন হাজার ডলার।”

“সেটা কি স্যার মিস্টার ক্যাসেলের পক্ষে দেওয়া কঠিন ছিল?”

“নিশ্চয় কিছুটা, কিন্তু না দিতে পারার মতো নয়। মুশকিল হল এর পরেও চিকিৎসা সংক্রান্ত আরও অনেক খরচা আছে, যা ববের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত না।”

“এদেশে তো সরকারের অনেক স্কিম আছে মেডিকেইড না কী সব?” আমি বললাম।

“তাতে এরকম জায়গায় থাকতে পারতেন না। মা কষ্ট করে থাকবে, সেটা ববের পক্ষে নেওয়াটা কঠিন হত। মাকে ভীষণ ভালোবাসত বব। বাইরে প্রকাশ করত না, কিন্তু এ নিয়ে ও খুবই দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম।”

“আমি একটু কনফিউসড স্যার,” একেনবাবু বললেন, “কেন মিস্টার ক্যাসেল বললেন, আমাকে পাবে না।”

“ক্যাথি প্রত্যেক দিন ডিনার খেয়ে নিজের ঘরে এসে ববকে ফোন করত। সেইজন্যেই নিশ্চয়। যাই হোক, আমি ভেবেছিলাম আপনি সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু মনে হচ্ছে পারবেন না। দেখি যদি বিপাশাকে বলে অন্যভাবে কিছু করতে পারি। মুশকিল হল ক্যাথি ইজ ভেরি অ্যাডামেন্ট অ্যাবাউট অ্যাকসেপ্টিং চ্যারিটি।”

“আই অ্যাম রিয়েলি সরি স্যার।”

“না, সরি হবার কি আছে। আসলে ক্যাথির দৃঢ় বিশ্বাস বব আত্মহত্যা করেনি। তাই আপনার কথা মনে হয়েছিল। আপনি হয়তো পুলিশকে অন্যভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবেন। আপনি বলুন, পুলিশ কী করে শিওর হতে পারে এই একটা টেলিফোন মেসেজ থেকে যে বব আত্মহত্যা করেছে!”

“মিস্টার ক্যাসেলের কোনও শত্রু আছে বলে আপনি জানেন স্যার, যিনি ওঁকে খুন করতে পারেন?”

“মনে হয় না, হি লিভড এ ক্লিন লাইফ।” তারপর একটু থেমে বললেন, “যদ্দুর আমি জানি।”

“কতদিন আপনি চিনতেন স্যার মিস্টার ক্যাসেলকে?”

“প্রায় আট বছর।”

মিসেস ক্যাসেল আস্তে আস্তে ফিরে এসে সোফায় এসে বসলেন। একেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

“ম্যাডাম, আপনার ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে খোঁজখবর করব এই কথাটা দিচ্ছি। তার বেশি কিছু বলতে পারব না।”

মিসেস ক্যাসেল ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন একেনবাবুর দিকে। তারপর বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ, আপনাকে কত দিতে হবে?”

“এই খোঁজখবরের জন্যে কিছু দিতে হবে না ম্যাডাম। আপনার ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। খুব ভালো লোক ছিলেন। উই আর ট্রুলি স্যাড ম্যাডাম।”

“আওয়ার কন্ডোলেন্সেস,” আমি বললাম।

সতীশ কুমারও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “চলুন আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।”

যখন আমরা নীচে নামছি, একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আমি ম্যাডামের ওখানে এগুলো আলোচনা করতে চাইনি, কিন্তু যেটুকু জানি মিস্টার ক্যাসেল একটা হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন।”

“হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানিরই একটা বিল্ডিং। উপরের তলাগুলোতে রিনোভেশন চলছে। বব মাঝে মাঝে ওখানে দেখভাল করার জন্যে যেত।”

“রবিবারও ওখানে কাজ হত স্যার?”

“না, তবে রবিবার গিয়ে কাজকর্ম কী রকম এগিয়েছে দেখার সুবিধা হত। বিপাশা অনেক সময় যেত, আমিও এক আধবার ববের সঙ্গে গিয়েছি।”

“রবিবার ওখানে কারা থাকত?”

“কেউই না। যে কেউ ওখানে ঢুকতে পারে না। সিঁড়ি তালা-বন্ধ থাকে। স্পেশাল চাবি ব্যবহার করে লিফটে ওই তলাগুলোতে পৌঁছনো যায়।”

“চাবিগুলো কার জিম্মায় থাকত স্যার?”

“বব আর বিপাশার কাছে।”

“কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোকরা ওখানে যেত কী করে?”

“সার্ভিস এলিভেটর ব্যবহার করত। এলিভেটরগুলো রবিবার লক্ড থাকত।”

“বুঝলাম। আচ্ছা স্যার, অশোকবাবু আর মিস্টার ক্যাসেল বেশ বন্ধু ছিলেন□ তাই না?”

“হ্যাঁ, ওর মৃত্যুও ববকে বেশ অ্যাফেক্ট করেছিল। ইন ফ্যাক্ট, অশোক মারা যাবার পরের দিন সকালে পুলিশ এসে যখন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল।”

“আপনাকে পুলিশ কোনও প্রশ্ন করেছিল?”

“প্রথমে করেনি। শুধু বব আর বিপাশাকে করেছিল। অশোকের সঙ্গেই ওদের যোগাযোগ ছিল বেশি।”

“তাহলে আপনাকে কেন করল স্যার?”

“পুলিশ জানতে চাইছিল অশোক যেদিন মারা যায় সেদিন রাতে বব আমার সঙ্গে কতক্ষণ ছিল।”

“কতক্ষণ ছিলেন স্যার?”

“প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত।”

“আপনার বাড়িতে স্যার?”

“না, আমরা অফিসের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে বসে ডিনার খাচ্ছিলাম।” তারপর হঠাৎ সতীশ কুমারের কী মনে হল, বললেন, “একটা কথা পুলিশকে তখন আমি বলিনি□ মনে হয়নি রেলেভেন্ট বলে।”

“কী কথা স্যার?”

“সাড়ে আটটা নাগাদ ডিনার খেয়ে যখন বেরোচ্ছি, তখন ববের খেয়াল হল ওর গাড়ির চাবি অফিসে ফেলে এসেছে। আমি আর উপরে উঠিনি। শুধু ওইটুকু সময়ই আমি ববের সঙ্গে ছিলাম না।”

"কতক্ষণ ছিলেন উনি উপরে?"

"তা প্রায় মিনিট দশেক।"

"আপনাদের লিফট তো খুব তাড়াতাড়ি ওঠে স্যার, অত সময় লেগে গেল শুধু চাবি আনতে?"

"ঠিকই বলেছেন, অত সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু ববকে তো আমি চিনি, উপরে গিয়ে শুধু চাবি নিয়ে আসার পাত্র সে নয়, নিশ্চয় আরও দুয়েকটা টুকিটাকি কাজ সারছিল। ফ্র্যাঙ্কলি, আমি একটু অধৈর্যই হয়ে পড়েছিলাম, উপরে যাচ্ছিলাম ওর খোঁজ করতে। তখন দেখি মেরি, মানে আমাদের যে অফিস পরিষ্কার করে□ সে উপরে যাচ্ছে। তাকে বললাম ববকে তাড়া দিতে।"

"তার তাড়া খেয়েই নেমে এলেন?"

"এক্স্যাক্টলি। তবে বিপাশা অফিসে ছিল বলে বোধহয় সময়টা একটু বেশি লেগেছিল। নেমে এসেই বলল, 'বেঁচে গেছি, বিপাশা কারোর জন্য অপেক্ষা করছে, মনে হল মেজাজটা ভালো নেই। নইলে হয়েছিল, আটকা পড়ে যেতাম।' যাই হোক তারপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে ওর গাড়ির গ্যারাজ পর্যন্ত গেলাম। সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আকাহাশির সঙ্গে। গল্প করতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। আমার টায়ার্ড লাগছিল। কয়েকটা ব্লক পরেই আমার অ্যাপার্টমেন্ট। আমি ওদের রেখে বাড়ি রওনা দিলাম। যখন একটু এগিয়েছি তখন মনে হল বব আর আকাহাশি তর্কাতর্কি করছে। দুজনেই বেশ উত্তেজিত। হয়তো ওদের কোনও পার্সোনাল ব্যাপার। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, তাই দাঁড়ায়নি। বব এখন মারা গেছে বলেই কথাটা এখন মনে হচ্ছে।"

"মিস্টার ক্যাসেলের সঙ্গে মিস্টার আকাহাশির সম্পর্ক কী রকম ছিল স্যার?"

"একটু রাইভ্যালরি ছিল। সেটা ছিল বিপাশার জন্য। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হত বিপাশা নিজের লোকেদের থেকে আকাহাশিকে বেশি ট্রাস্ট করে। বব বিপাশার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্টেন্ট বলে সেটা ওর বুকে বাজত বেশি করে।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা স্যার, সেদিন অশোকের কোনও প্রসঙ্গ ওঠেনি?"

"ও হ্যাঁ, আমরা যখন ডিনার খাচ্ছি, তখন বব বলল অশোক একটা ভয়েস-মেসেজ রেখেছে, কিন্তু ও মেসেজটা রিট্রিভ করতে পারছে না। এরকম এক আধ সময় হয় না, তা নয়। আমি বললাম অশোককে একটা ফোন করতে। বব বলল 'কয়েকবার ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাচ্ছে না।' আমার সামনেও ফোন করল, কিন্তু ফোন বেজেই গেল। আমি ববকে বললাম, 'যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট মেসেজ অশোক দিয়ে থাকে, তাহলে একবার দেবরাজকে ধরার চেষ্টা করো না?'

দেবরাজকে যদিও আমরা খুবই ভালো করে চিনি, কিন্তু এই ছোটোখাটো ব্যাপারে তাকে ফোন করতে বব দেখলাম ইতস্তত করছে। শেষমেশ করল। কিন্তু দেবরাজের ফোন সুইচড অফ। এছাড়া আর তো কিছু মনে পড়ছে না।"

"অশোকের মেসেজটা কী ছিল জানেন?"

"না, এ নিয়ে ববের সঙ্গে পরের দিন কোনো কথা হয়নি। তারপর তো পুলিশ এল। দুপুরে ববের বাইরে কাজ ছিল বেরিয়ে গেল। শনিবার ছুটি, আর রোববার তো দুঃসংবাদটা পেলাম।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, আপনাকে আর আটকে রাখব না, আমরা চলি।"

যেতে যেতে হঠাৎ একেনবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। সতীশ কুমার তখনো লবিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

“আরেকটা প্রশ্ন স্যার, বিপাশা ম্যাডাম কি বিল-পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা করেন?”

“বিল পেমেন্ট নিয়ে?” সতীশ কুমার প্রশ্নটাতে দেখলাম বিস্মিত। “সে রকম তো কিছু শুনিনি!”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয়নি।”

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই মোবাইলটা বাজলো। প্রমথর ফোন। এখানে কী হল তার রিপোর্ট শেষ করার আগেই দেখি একেনবাবু ঘুম লাগিয়েছেন।

।। ১৬।।

বুধবার মে ২৫, ২০১১

আজ তাড়াতাড়ি অফিসে এসে আমার পেপারটা নিয়ে পড়েছি। ওটাকে দশ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। একটা স্পেশাল ইস্যুতে পেপারটা যাচ্ছে, সাবমিশানের ডেডলাইন মিস করতে চাই না। ভাগ্যক্রমে আজ অফিসে কেউই প্রায় নেই। বেভকেও ওর ডেস্কে দেখলাম না। দরজা বন্ধ করে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাজ করলাম। তারই মধ্যে ক্যাফেটেরিয়া থেকে একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে এলাম। বহুদিন বাদে সলিড প্রোগ্রেস হল পেপারটাতে। আজ কিশোরের সঙ্গে কফি খেতে হবে কথা দিয়েছি, নইলে আরেকটু কাজ করা যেত।

কিশোরকে এত রাগতে আগে আমি দেখিনি। রাগের তোড়ে বেশ কয়েকবার বলল, 'তোর বন্ধু রামসুন্দরকে আমি খুন করব।' কথার কথা ঠিকই, কিন্তু কফি কর্নারে, যেখানে আশেপাশে অনেকে আছে, এভাবে 'খুন করব' বলাটা একেবারেই অনুচিত। আমি অনেক কষ্টে ওকে শান্ত করলাম। তারপর যেটা ওর কাছ থেকে উদ্ধার করলাম, সেটা হল রামসুন্দরের ব্যাপারটা বেভ কিশোরকে এতদিন জানায়নি। গতকাল হোবোকেনে যাবার পথে বলেছে। আমার সঙ্গে বেভের যা কথা হয়েছে তাও বলেছে।

কিশোর বলল, "স্কাউন্ড্রেলটার আস্পর্ধা দেখ, বেভকে ভয় দেখাচ্ছে, ইন্ডিয়াতে গেলে পুলিশ দিয়ে আমাদের অ্যারেস্ট করাবে! কে কাকে অ্যারেস্ট করে দেখব। ব্যাটা জানে না যে আমার কাকা তামিলনাড়ুর ডিজি, হেড অফ পুলিশ। আমার মামা অন্ধ্রের ক্যাবিনেট মিনিস্টার, আমার মেসোমশাই দিল্লীতে...।"

"এর মধ্যে গুরুজনদের টানছ কেন, অবভিয়াসলি রামসুন্দর একটা সিলি কথা বলেছে।"

"না, আমি ওকে ছাড়ব না," কিশোর বলল। "পরশু কাকা, নিউ ইয়র্কে আসছে, আমি জিজ্ঞেস করব রেড্ডী বলে কোনও পুলিশ অফিসার আছে নাকি। তাঁর জানা উচিত যে, তাঁর ছেলে এইসব কুকীর্তি করছে।"

প্রায় আধঘণ্টা গেল, কিশোরকে ঠাণ্ডা করতে। তারপর একথা সেকথার পর হঠাৎ বলল, "বেভ থিঙ্কস হাইলি অফ ইউ।"

আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, "সেকি? ও তো কালকেই কমপ্লেন করল ওকে আমি ইগ্নোর করি!"

"মে বি দ্যাটস হোয়াই। এনিওয়ে, বেশি অ্যাটেনশন দিও না, কারণ উই আর গোইং টু গেট ম্যারেড সুন।"

"কংগ্র্যাচুলেশনস! এই দারুণ কথাটা এতক্ষণ চেপে রাখলে? সুন মানে কবে?"

"দু'মাস। সেইজন্যেই আবার কাল আন্ট মিশেলের সঙ্গে দেখা করলাম। তোমাকে

বলেছিলাম না, বোধহয় বেভকে নিয়ে মঙ্গলবার আন্ট মিশেলে কাছে যাব?"
"নিশ্চয় বলেছিলে, তখন খেয়াল করিনি।"
"আসলে তোমার সঙ্গে শুক্রবার যখন কথা হয়, তখনো বেভকে ফর্মালি প্রোপোজ করিনি। ঠিক করে রেখেছিলাম রবিবার করব। সোমবার কাজের জন্যে বাইরে থাকব, মঙ্গলবার ফিরে এসে বেভ আর আমি দুজনে মিলে আন্ট মিশেলকে সুখবরটা দেব। সো মেনি থিংস ক্যান হ্যাপেন। যতক্ষণ না বেভ বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে, ততক্ষণ বোধহয়-টা বাদ দিই কী করে?"
"তা তো বটেই।"
"আই ফিল ব্যাড যে তুমি আমার কাছে না শুনে অন্যের কাছে শুনেছ আমার প্রোপোজ করার কথা।"
"আমি এতটুকু মাইন্ড করিনি। তোমাদের এনগেজমেন্টের খবরে আন্ট মিশেল নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন। উনি তো বেভের খুব ক্লোজ, তাই না?"
"হ্যাঁ, আন্ট মিশেলের কাছেই ও বড় হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল লেডি। আশি বছর বয়েস, এখনো কী উৎসাহ নিয়ে স্যুপ কিচেন চালাচ্ছেন। প্রতিদিন প্রায় একশো লোক সেখানে খায়।"
"জাস্ট কিউরিয়াস... বেভের মা কি..."
কিশোর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বেভের মা মারা যান বেভ যখন এক বছরের। আন্ট মিশেলের বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি, বেভের বাবার থেকে উনি ছিলেন প্রায় কুড়ি বছরের বড়। বেভের বাবা আর বিয়ে করেননি। তাই আন্ট মিশেলই বেভকে বড় করেছেন। বাই দ্য ওয়ে, ইউ উইল হ্যাভ টু বি মাই বেস্ট ম্যান।"
"আমার থেকে বেটার কাউকে পেলে না?" আমি ফাজলামি করে বললাম।
"কেন, তুমি হবে না?"
"নিশ্চয় হব, এটা তো একটা অনার। তা বাবা-মাকে খবরটা দিয়েছ?"
"হ্যাঁ, বেভকে প্রোপোজ করার আগেই দিয়েছি। ওঁরা অবশ্য একটু অ্যাপ্রিহেন্সিভ, কোন বাড়ির মেয়ে, কী করে সে নিয়ে তাঁদের হাজার গণ্ডা প্রশ্ন। আসলে দেশে আমার জন্যে একটি পাত্রী পছন্দ করে রেখেছেন। মেয়েটাকে চিনি, এক ধনকুবেরের মেয়ে। সেটাও একটা কারণ। যাই হোক, কাকা কী একটা কাজে ওয়াশিংটন ডিসি-তে এসেছেন। নিউ ইয়র্কেও কিছু কাজ আছে। পরশু এসে সেগুলো সেরে আমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবেন। তাঁর কাছ থেকে শিওর ওঁরা অনেক রিপোর্ট নেবেন। তবে আমি বলে দিচ্ছি, শেষমেশ সবাই লাইনে এসে যাবে। বিয়েও অ্যাটেন্ড করবে।"
"ওয়ান্ডারফুল।"
"কাকা এলে তোমায় ডাকব। ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান। পুলিশে কাজ করেন বটে, কিন্তু ফিজিক্সে এম.এসসি করেছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তোমার মতো প্রফেসর হননি বলে এখনো আফশোস করেন। তুমি কি নেক্সট উইকে ব্যস্ত থাকবে? ডেটটা এখুনি বলতে পারছি না, কাকার অন্য কি প্ল্যান আছে না জানা পর্যন্ত।"
"আমি মোটেই বিজিম্যান নই। তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কোন প্রোগ্রাম থাকলেও ক্যানসেল করতে পারব।"
"থ্যাঙ্ক ইউ।"
"ভালো কথা, বেভকে বলেছিলাম ওর আন্টকে বলতে, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেটা কি ও বলতে পেরেছে? আজ তো ওকে অফিসে দেখলাম না।"

"ও, হ্যাঁ, সেটাই তো তোমাকে বলতে বলেছে। ও কাল ফেরেনি, আন্ট মিশেলের সঙ্গে আজকের দিনটা কাটাবে বলে। তোমরা তো কাল সন্ধ্যার সময় যাবে? কোনও প্রব্লেম নেই। বেভ হয়তো তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, কিন্তু আন্ট মিশেলের ঠিকানা, যাবার ডিরেকশন, ফোন নম্বর সবকিছু কাল তোমাকে অফিসে দিয়ে দেবে।"

"কেন আমরা যাচ্ছি জান তো?"

"হ্যাঁ, বেভ বলেছে অশোক দুবের মার্ডারের ব্যাপারে। আন্ট মিশেল ওকে খুব ভালো করে চিনতেন। খুবই শকড ওর মৃত্যু নিয়ে। বেভ বলল, তোমার এক ডিটেক্টিভ বন্ধু এটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছেন। নামটা ঠিক ধরতে পারেনি। কী নাম বল তো?"

"একেন্দ্র সেন। আমরা একেনবাবু বলে ডাকি।"

"ও মাই গড, নামটা তো চেনা চেনা লাগছে। ইনিই কি ম্যানহ্যাটানের মুনস্টোন মিস্ট্রি ক্র্যাক করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ইনিই। ওঁর আরও অনেক কীর্তি আছে।"

"উনি যে তোমার বন্ধু সেটা তো জানতাম না!"

"তুমি হচ্ছ আমার ছাত্র জীবনের বন্ধু। পড়া শেষ করে তো বস্টন না কোথায় পাড়ি দিলে। এখানে এসে আমার অফিসে দেখা দিলে এই সেদিন, কয়েকমাস আগে। তারপর তোমার সঙ্গে বার কয়েক যে দেখা হয়েছে, সেটা হল এই কফি কর্নারে। সেই কথাবার্তাও মূলত তোমার ভাবি পত্নী বেভকে নিয়ে। আমি অভিযোগ করছি না, প্রেমে পড়লে বিশ্বের অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি থাকে না। আই ফুল্লি আন্ডারস্ট্যান্ড।"

"তা ঠিকই," কিশোর একটু লজ্জা পেল।

।। ১৭ ।।

বৃহস্পতিবার মে ২৬, ২০১১

মিশেল বেসিমারকে দেখলে আশি বলে মনে হয় না। সোজা হয়ে হাঁটাচলা করেন। মুখের চামড়া এখনো কোঁচকায়নি। চোখটা হালকা নীল, একটু ঘোলাটে। কিন্তু এই বয়সেও মুখটা আকর্ষণীয়। বেভের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, হতে পারে আমার কল্পনা। অ্যাপার্টমেন্টটা ছোটো কিন্তু অ্যাসিস্টেড লিভিং ফেসিলিটির মধ্যে নয়। নিজের ঘরদোর মিশেল নিজেই সামলান। রান্নাবান্না দোকানপাট সব নিজে করেন। আমরা পরিচয় দিতেই সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন।

বাইরের ঘরটা বেশ বড়, লিভিং কাম ডাইনিং। ডাইনিং এরিয়াতে ছ'জন বসার মতো খাবার টেবিল বেশ এঁটে গেছে। টেবিল পার হলেই কিচেন। মধ্যে কোনও দেয়াল বা দরজা নেই। লিভিং এরিয়াতে সোফাসেট, কফি টেবিল ছাড়া আসবাব বলতে একটা বড় বইয়ের আলমারি। দেয়াল জুড়ে বেভের নানান বয়সের কয়েকটা ছবি। ব্যাস।

আমরা বসার পর বললেন, "বেভ তোমাদের কথা বলে গেছে। তোমরা অশোকের

মার্ডার নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করছ, তাই না?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ,” আমিই শুরু করলাম। “একেনবাবু অশোক দুবে সম্পর্কে দুয়েকটা জিনিস জানতে চান। সেটা জেনেই আমরা চলে যাব। বেশিক্ষণ সময় নেব না।”

“যত সময় লাগে নাও। আমার কোনও তাড়া নেই।”

তারপর আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে এক প্লেট কুকি টেবিলে রেখে কফি বানাতে শুরু করলেন।

একেনবাবু উঠে ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার দুবেকে ম্যাডাম, আপনি কতদিন চিনতেন?”

মিশেল বললেন, “আমি বুড়ি ঠিকই, কিন্তু অতটা রেস্পেক্ট না দেখালেও চলবে। আমাকে মিশেল বলেই ডেকো।”

“ইয়েস, ম্যাডাম।”

“ইয়েস, মিশেল,” বৃদ্ধা একেনবাবুকে শোধরাবার চেষ্টা করলেন।

“সরি, ম্যাডাম।”

প্রমথ একেনবাবুকে উদ্ধার করল। “‘ম্যাডাম’ আর ‘স্যার’ বলা একেনবাবুর হ্যাবিট। বহু চেষ্টা করেও আমরা শোধরাতে পারিনি।”

“তাই নাকি?” মিশেল এবার একেনবাবুকে প্রশ্ন করলেন, “তুমি বিয়ে করেছ?”

“ইয়েস, ম্যাডাম।”

“বউকেও ম্যাডাম বল?” ঘোলা ঘোলা চোখেও দুষ্টুমি খেলল।

একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, “কী যে বলেন ম্যাডাম!”

“ঠিক আছে, ম্যাডামই থাক। কী প্রশ্ন জানি করলে?”

“জিজ্ঞেস করছিলাম, আশোক দুবেকে আপনি কতদিন চিনতেন?”

“প্রায় দু’বছর।”

“কী ভাবে আলাপ হয়েছিল আপনার সঙ্গে?”

“দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে কফিটা বানাই। তারপর অশোক সম্পর্কে যা জানি, তোমাদের বলি। তারপরেও যদি প্রশ্ন থাকে, তাহলে কোরো, কেমন?”

“ইয়েস, ম্যাডাম।” বলে একেনবাবু সোফায় এসে বসলেন।

কফি খেতে খেতে মিশেল বেসিমার অশোকের কথা শুরু করলেন। দীর্ঘ কাহিনি আমি একটু সংক্ষেপ করছি।

মিশেল ব্লুমফিল্ড অ্যাভিনিউয়ে একটা স্যুপ কিচেন চালাতেন। মাইনে দিয়ে লোক রাখার সামর্থ ওঁর ছিল না, তাই মাঝেমাঝেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন ভলেন্টিয়ারের খোঁজে। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই বছর দুই আগে অশোক আসে। সপ্তাহে একদিন করে অশোক কিচেনে কাজ করত। অশোকের যে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং ছিল, সেটা উনি প্রথমে জানতেন না। জানার পর অশোকের বিদ্যে-বুদ্ধি খুব কাজে লাগলো। মেনু তৈরি করা থেকে রান্নাবান্না অর্গানাইজ করা, খাবার সার্ভ করা, সব ব্যাপারেই অশোক ওঁকে সাহায্য করা শুরু করল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এমন অবস্থা হল, অশোককে ছাড়া মিশেলের চলত না। মাস ছয়েক আগে মিশেল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন। তখন প্রতিদিন অশোক ওঁকে দেখতে আসত। হাসপাতাল থেকে ফিরে স্যুপ কিচেনের ডেইলি ডিউটি থেকে মিশেল ছুটি নেন, শরীর আর দিচ্ছিল না। কিন্তু অশোকের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগটা থেকে যায়। মাঝে মাঝেই অশোক মিশেলের খোঁজখবর নিতে আসত। অনেক সময়ে মিশেল অশোককে খ্যাপাতেন।

বলতেন, ‘এই বুড়িকে দেখতে না এসে তোমার বয়সি কোনও মেয়েকে দেখতে যাও না।’ অশোক শুনে খুব হাসত। মাঝে মাঝে মিশেলের ইচ্ছে হত বেভের সঙ্গে অশোকের আলাপ করিয়ে দিতে। ভাবতেন অশোকের মতো ছেলের সঙ্গে বেভের বিয়ে হলে বেশ হয়। যাই হোক, এরমধ্যে একটা মেয়ের সঙ্গে অশোকের ভাব হল। ভারতীয় মেয়ে। অশোক তার ছবিও মিশেলকে দেখিয়েছিল, ভারি মিষ্টি চেহারা। মেয়েটির মা নিউ ইয়র্কে মেয়ের কাছে এসেছিলেন। হয়তো মেয়েটিই মাকে আনিয়েছিল অশোকের সঙ্গে পরিচয় করাতে। তারপর প্রায় সপ্তাহ কয়েক অশোকের সঙ্গে মিশেলের দেখা হয়নি। মিশেল ভেবেছিলেন নিশ্চয় মেয়েটি আর মেয়েটির মাকে নিয়ে অশোক কোথাও বেড়াতে গেছে। দুয়েকবার ফোনও করেছিলেন অশোককে, কিন্তু ধরতে পারেননি। এরপর যেদিন অশোক আসে, ওর চেহারা দেখে মিশেল বোঝেন একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে অশোক বলল, মেয়েটার সঙ্গে অশোকের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মিশেল প্রথমে ভেবেছিলেন সাময়িক কোনও ভুল বোঝাবুঝি। পরে বুঝলেন, এই ছাড়াছাড়ির মূলে অশোক নিজেই। মেয়েটিকে বিয়ে করা অশোকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মেয়েটির ফ্যামিলি গোঁড়া হিন্দু, এখনও জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামায়। অশোকের ওসবে বিশ্বাস নেই। মিশেল তখন জিজ্ঞেস করেন, ফ্যামিলি না হয় গোঁড়া হিন্দু, মেয়েটাও কি সেরকম? উত্তরে বুঝলেন, মুখে বলে না। কিন্তু অশোকের মানসিকতার সঙ্গে ওদের ফ্যামিলির মানসিকতার এত তফাৎ, বিয়ে করলে পরে মেয়েটা পস্তাবে। তাই অশোক নিজেই সরে এসেছে।

“আই সি। আচ্ছা ম্যাডাম, অশোকবাবু কি টাকাকড়ির অসুবিধা নিয়ে আপনাকে কিছু বলেছিলেন?”

“না, সেরকম তো কিছু শুনিনি। ও নিজে খুব সাধারণ ভাবে থাকত। তবে সেটা টাকা পয়সার অভাবের জন্যে নয়। শুনেছি ও দেশে গরীবদের জন্যে টাকা পাঠাত।”

“কিন্তু ওঁর হাজার দশেক ডলারের দরকার পড়েছিল, এমন কোনও কথা আপনি শোনেননি?”

“শুনেছি। কিন্তু সেটা ওর নিজের জন্যে নয়, কোনও একটা প্রজেক্টের জন্যে। আমি ওর প্রজেক্টে দু’শো ডলার দিতে চেয়েছিলাম, ও নিতে রাজি হয়নি।”

“শেষ পর্যন্ত কি উনি টাকাটা তুলতে পেরেছিলেন?”

“সেটা বলতে পারব না।”

ফেরার পথে আমি বললাম, “এই কাউ-বেল্টের লোকদের মধ্যে জাত-পাত নিয়ে এখনো যে এত সমস্যা, কল্পনা করা যায় না!”

“শুধু কাউ-বেল্টের নিন্দা করছিস কেন, বাঙালিরাও কিছু কম যায় না। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলো দেখ না, বামুনের মেয়ের জন্যে কে শিডিউল্ড কাস্ট ছেলের খোঁজ করছে?” প্রমথ প্রতিবাদ করল।

“ওরকম ভাবে বিজ্ঞাপন কেন দেবে? কিন্তু ‘কাস্ট নো বেরিয়ার’ অনেক জায়গাতেই লেখা থাকে।”

“তুই সেখানে অ্যাপ্লাই কর শিডিউল্ড কাস্ট পাত্র হিসেবে, দেখি কী রকম উত্তর পাস?”

“ডোন্ট বি অ্যান ইডিয়ট, আমার প্রশ্ন এখানে উঠছে কেন?”

“তার কারণ আমাদের মধ্যে একেনবাবুর বিয়ে হয়ে গেছে, আমিও হয়তো করে

ফেলব। তোরই কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই, পাত্র-পাত্রীর অ্যাডের পাতাই তোর ভরসা।"

"আমি কিন্তু কনফিউসড স্যার," একেনবাবু বললেন, "দুবেরা তো ব্রাহ্মণ বলেই জানতাম!"

"আমার কাছে তার উত্তর পাবেন না," প্রমথ বলে উঠল, "আমি জাত-ফাত মানি না। তাও গাঙ্গুলি, ব্যানার্জি হলে বলতে পারতাম। ওটা তো খোট্টা পদবি।"

"তুই অত্যন্ত ডিস-রেস্পেক্টফুল।"

"ও, কাউ-বেল্ট বললে রেস্পেক্টফুলি বলা হয়, আর খোট্টা বললেই দোষ।"

"শ্রীমালী আমি জানি ব্রাহ্মণ," একেনবাবু আমাদের কথা কাটাকাটি পুরো উপেক্ষা করে মন্তব্য করলেন।

প্রমথ বা আমার কারোরই এতে ইন্টারেস্ট নেই। চুপ করে রইলাম।

বাড়িতে ফিরে একেনবাবু দেখলাম কম্পিউটার খুলে বসেছেন।

প্রমথ বলল, "আজ আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। পিৎজা অর্ডার করি, কি বলিস?"

"বেশ তো, কর।"

প্রমথ ফোন করে একটা এক্সট্রা লার্জ পিৎজা অর্ডার করল, হাফ পেপরোনি, হাফ মাশরুম।

"তুই তো মাশরুম হেট করিস," আমি বললাম।

"করি, কিন্তু একেনবাবুর তো ওটা না হলে চলে না।"

এই হল প্রমথ। একদিকে বাঁকা বাঁকা কথা বলবে, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাবে, আবার খেয়ালও রাখবে আমাদের কার কী পছন্দ বা অপছন্দ!

একটু বাদেই হাসি হাসি মুখে একেনবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছিলাম স্যার। দুবে হল দ্বিবেদীর আরেকটা নাম। এঁরা হলেন সব সরযূপারের ব্রাহ্মণ, আদিবাস ছিল সরযূনদীর পাশে। শ্রীমালীরাও ব্রাহ্মণ তবে রাজস্থানের।"

"শুনে চমৎকৃত হলাম," প্রমথ বলল। "কিন্তু এই জ্ঞানের ভাণ্ডটা আমাদের বিতরণ করে আপনার লাভ?"

"মানে আমি বলতে যাচ্ছি স্যার, শুধু ব্রাহ্মণ হলেই হয় না, বিয়ের ব্যাপারে আরও নিশ্চয় ভাগ-বিচার আছে।"

আমি বললাম, "শুনেছি সাউথ ইন্ডিয়ায় চোলিয়া ব্রাহ্মণদের অন্য ব্রাহ্মণরা নিচু চোখে দেখে। এছাড়া বিয়েতে গণ, গোত্র, কুষ্ঠী-ঠিকুজি কত কিছু দেখা হয়।"

"তোদের এই স্টুপিড কথাবার্তায় আমি সিক ফিল করছি," প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, "কোন যুগে পড়ে আছিস তোরা?"

"চটছিস কেন, আমরা তো কেউ এসব মানি না। শুধু যারা মানে, তাদের চিন্তাধারাটা ফলো করার চেষ্টা করছি।"

"দে আর নট ডিসার্ভড টু বি ফলোড। আই হ্যাভ নো ডাউট, এইজন্যেই অশোক এসব ফ্যামিলির সঙ্গে জড়াতে চায়নি। এই পরিবারে বিয়ে করলে নিশ্চিত ডিভোর্স হত।"

।। ১৮।।

শুক্রবার মে ২৭, ২০১১

সকালে অফিসে ঢুকতেই বেভ এসে হাজির। গত চারমাসে বেভের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে গত এক সপ্তাহে তার থেকে বেশি হয়েছে।

"তোমার একটা চিঠি এসেছে," বলে একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

মনে হল এটা একটা ছুতো। আমার টেবিলের ওপর রেখে দিলেই চলত, আগে বরাবর তাই করেছে।

"চিঠিটা রেজিস্টার্ড চিঠি, আমি সই করে নিয়েছি, হোপ ইট ইজ ওকে উইথ ইউ।"

"নিশ্চয়।"

চিঠিটা ইন্ডিয়া থেকে এসেছে। একটু অবাকই হলাম। অফিসের ঠিকানায় আমায় কেউ চিঠি পাঠায় না, তার ওপর রেজিস্ট্রি করে পাঠানো। বেভের সামনেই চিঠিটা খুললাম। যাদবপুরের একটি ছেলে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে চায়। মার্কশিট, রেকমেন্ডেশন লেটার ইত্যাদি দিয়ে পাঠিয়েছে। যদি কোনও অ্যাসিস্টেন্টশিপের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। ছেলেটিকে চিনি না। চিনলেও এসে যেত না, এ ব্যাপারে আমার কোনও হাত নেই। উচিত ছিল অ্যাডমিশন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ইনফ্যাক্ট অবাকই হলাম, আজকের যুগে ইন্টারনেটে খোঁজখবর না নিয়ে কেউ এরকম চিঠি পাঠাচ্ছে। তাও আবার আমার পুরোনো কলেজ যাদবপুরের ছাত্র। চিঠিটা যখন ট্র্যাশ ক্যানে ফেলতে যাচ্ছি, বেভ বলল, "লুকস লাইক সামওয়ান হ্যাস ওয়েস্টেড হিজ মানি।"

"ইউ আর রাইট।"

"স্ট্যাম্পটা আমি পেতে পারি?"

"তুমি স্ট্যাম্প জমাও?" আমার গলার স্বরে বিস্ময়টা চাপা রইল না।

"মনে হচ্ছে তুমি অবাক হয়েছ?"

"তা একটু হয়েছি।"

"কেন জানতে পারি?"

এর উত্তরটা সত্যি করে বললে ভালো শোনাত না। স্ট্যাম্প যাদের জমাতে দেখেছি তাদের ক্যারেক্টারই আলাদা। বেভের মতো ইজি গোইং, ফান লাভিং, প্লে-ফুল নয়। এই অবস্থায় সবচেয়ে ভালো উত্তর কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বলা "আই ডোন্ট নো।"

"খামটা আমায় দেবে প্লিজ," বেভ হাতটা এগিয়ে দিল। "স্ট্যাম্পটা দেখে লোভ হয়েছিল, তাই তোমার ডেস্কে রেখে যাইনি। কোথাও ফেলে দিলে আর পেতাম না।"

আমি খামটা ওর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কতদিন ধরে তুমি স্ট্যাম্প জমাচ্ছ?"

"দশ বছর বয়স থেকে। আমার বাবা জমাত। বাবা মারা যাবার পর স্ট্যাম্পের অ্যালবামগুলো পাই। বাবার ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্পের ভালো কালেকশন ছিল। নট দ্যাট হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন ইন্ডিয়া, বাট হি ফেল ইন লাভ উইথ ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্পস।"

আমি এ সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। বললাম, "তার মেয়ে তো বাবাকে টেক্কা দিয়েছে, শি হ্যাস ফলেন ইন লাভ উইথ অ্যান ইন্ডিয়ান ম্যান।"

"সো ট্রু।" ঝলমল করে হাসল বেভ।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল সিন্ধ ডাক-এর কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "সিন্ধ ডাক স্ট্যাম্পের নাম শুনেছ?"

"ইউ মিন সিন্ডে ডক।"

"না, ওটা আসলে সিন্ধ ডাক হবে।" প্রমথর জ্ঞানটা এই সুযোগে ঝেড়ে দিলাম।

"আমি এটা জানতাম না! থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ওটা তো দামি স্ট্যাম্প, তাই না?"

"হ্যাঁ, শুনেছি ভালো কনডিশনে থাকলে বেশ কয়েক হাজার ডলার। ইট ইজ সো সারপ্রাইজিং তুমি এই স্ট্যাম্পের কথাটা তুললে। কিছুদিন আগে জর্জ এই স্ট্যাম্পের কথাটা বলছিল।"

"জর্জ কে?"

"ফিলাটেলিস্ট কর্নার-এর মালিক।"

"তুমি ওকে চেন?"

"হ্যাঁ, আমি মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে স্ট্যাম্প কিনি, তবে পাঁচ দশ ডলারের। ও প্রথম যখন দোকান খোলে বাবাই ছিল ওর ফার্স্ট কাস্টমার। কিন্তু জানো, দোকানটা ও বন্ধ করে দিচ্ছে।"

"কেন?"

"মেরি এখন আরথ্রাইটিস-এ একেবারে কাবু, দোকানে বেশি বসতে পারে না। জর্জের পক্ষে একা দোকান চালানো সম্ভব নয়।"

"মেরি কে?"

"ওর স্ত্রী।"

"ওর অন্য কোনও হেল্প নেই?"

"কেভিন কাজ করত, কিন্তু এখনও ওখানে আছে কিনা জানি না। জর্জ ওকে মাইনেপত্রও সময় মতো দিতে পারছিল না। এক কালে অনেকে স্ট্যাম্প জমাত, এখন কে জমায়? দু-পাঁচ ডলারের স্ট্যাম্প বিক্রি করে ম্যানহাটানে দোকান চালানো যায় না।"

"কিন্তু অনেক স্ট্যাম্প তো একশো হাজার ডলারেও বিক্রি হয়!"

"সেগুলো অকশন হাউস বিক্রি করে, এ ধরণের স্ট্যাম্পের দোকান থেকে কেউ কেনে না। তাও জর্জ লাকি, ওর দুয়েকজন পয়সাওয়ালা কাস্টমার আছে। জর্জ ভালো স্ট্যাম্পের খবর পেলে ওদের দেয়। বিক্রি হলে তার থেকে কিছু কমিশন পায়।"

"তোমায় যখন সিন্ধ ডাক-এর কথা বলেছে, মনে হচ্ছে তুমিও জর্জের সেরকম একজন কাস্টমার।"

"ভেরি ফানি!" ওর ফোনটা বাজতে শুরু করায় বেভ চলে গেল।

আজ আবার একটা সেমিনার ছিল। সেটা শেষ হবার পর গেস্ট স্পিকারকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে গেলাম। এরকম একটা অ্যারোগেন্ট লোক বেশি দেখিনি। নিজেকে কী ভাবেন কে জানে! বাকি সবার কাজ অতি বাজে, উনিই একমাত্র বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাই আমাকে বারবার শোনালেন। আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড নিশ্চয় লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন, তাই নিজে না এসে আমার মতো চুনোপুঁটিকে লাঞ্চে পাঠিয়েছেন। সেই কারণেই মনে হল গেস্ট স্পিকার আরও চটেছেন। আমি হ্যাঁ হুঁ করে যাচ্ছিলাম, কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। লাঞ্চের পরে ডিপার্টমেন্ট অফিসে ওঁকে পৌঁছে দিলেই আমার ছুটি। ভদ্রলোকটির একটা গুণ, খুব তাড়াতাড়ি খান।

এত বকবক করেও আমার আগেই খাওয়া শেষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কফি বা ডেসার্ট খাবেন কিনা। সংক্ষিপ্ত উত্তর, না।

লাকিলি সেই সময়ে দেবদূতের মতো হাজির হলেন আমাদের ডিন। বুঝলাম ওঁরা দু'জন পূর্ব-পরিচিত। ডিন স্পিকারমশাইকে বললেন লাঞ্চের পরে ওঁর অফিসে আসতে। সুযোগটা ছাড়লাম না। বললাম, "আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। প্লিজ, ওঁর সঙ্গে যান।"

একলা বসে খাওয়া শেষ করছি। পাশে চেয়ার টানার শব্দ। প্রমথ আর ফ্র্যান্সিস্কা।

"তোরা কোথায় ছিলি?"

"ওই টেবিলটাতে," প্রমথ আঙুল দিয়ে দূরের একটা টেবিল দেখাল।

"খেয়াল করিনি তো!"

"খেয়াল হবে কেন, ইউনিভার্সিটির পয়সায় লাঞ্চ খাচ্ছিস!"

"এর থেকে নিজের পয়সায় লাঞ্চ খাওয়া ভালো। হোয়াট এ জার্ক!"

"সেটা তোমার মুখ দেখেই আমরা বুঝেছি," ফ্র্যান্সিস্কা হাসতে হাসতে বলল।

"নে, আমাদের কফি আর আইসক্রিম খাওয়া," প্রমথ হুকুম দিল।

"আমি খাওয়াব কেন, তোরা নিজে খা।"

"তোকে তো খাওয়াতে বলছি না, তোর ডিপার্টমেন্টের পয়সায় খাওয়াবি। লোকটাতো চা-কফি খেল না। ওর বদলে আমাদের খাইয়ে দে, কে দেখতে যাচ্ছে?"

ফ্র্যান্সিস্কা সরল মনের মেয়ে, প্রমথর এইসব ফাজলামি একেবারেই পছন্দ করে না। "ডোন্ট বি সিলি, আমি তোমাদের খাওয়াচ্ছি।"

"না, সেটা তো তুমি সব সময়েই খাওয়াও। আজ বাপি খাওয়াক। একেনবাবুর সঙ্গে থেকে থেকে বাপিও কৃপণ হতে শুরু করেছে।"

"ডোন্ট বি সো মিন, ডিটেকটিভ আজ সকালে আমায় কফি খাইয়েছে।" ফ্র্যান্সিস্কা একেনবাবুকে পছন্দ করে, 'মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ' বলে সম্বোধন করে।

"সে কি, আমায় তো বলনি?"

"কারণ ডিটেকটিভ বলেছে তোমাকে না বলতে।"

"কেন?"

"সেটা ডিটেকটিভকে জিজ্ঞেস কোরো।"

"আই সি, সেটা জানলে আমাদেরও খাওয়াতে হবে। দ্যাট মেকস সেন্স।"

"নো, নট দ্যাট। হি ওয়াজ ইন এ সিক্রেট মিশন।"

"কী সিক্রেট মিশন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটা বললে সিক্রেসির আর কী থাকে?"

"তার মানে তুমি জানো, কিন্তু আমরা জানি না।"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে।"

"আজ থেকে হি উইল হ্যাভ টু কুক বাই হিমসেলফ। আমি অন্তত রেঁধে খাওয়াব না। তুই খাওয়াবি?" আমায় জিজ্ঞেস করল প্রমথ।

"আমি নিজেই ভালো রাঁধতে জানি না।"

"ইউ গাইজ আর রিয়েলি মিন।"

"আচ্ছা, প্রমথকে না হয় নাই বললে," আমি বললাম। "আমাকে একটা হিন্ট দাও।"

ফ্র্যান্সিস্কা একটু চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে, দিচ্ছি। খুব সম্ভব, আজ বাড়ি গিয়ে দেখতে পাবে।"

"এটা একটা হিন্ট হল?" প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, "কী খুঁজব বাড়িতে?"

এমন সময় একটা পরিচিত স্বর, একেনবাবু।

"আপনি এখানে?" আমি বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম। একেনবাবু রেস্টুরেন্ট অ্যাভয়েড করেন, বড্ড বেশি খরচা হয় বলে। বাইরে খেতে হলে ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়ায় কিংবা পিৎজা বা হ্যামবার্গার জয়েন্টে লাঞ্চ সারেন।

"ম্যাডাম বলেছিলেন, ওঁরা এখানে লাঞ্চ খাবেন আজ। আপনি যে থাকবেন জানতাম না।"

"আমি এসেছিলাম বাধ্য হয়ে। কিন্তু ম্যাডামের সঙ্গে আপনার দরকারটা কী?"

একেনবাবু উত্তর দেবার আগেই ফ্র্যান্সিস্কা সস্নেহে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কাজ হল ডিটেকটিভ?"

"হল না মানে? সেইজন্যেই তো সোজা এখানে চলে এলাম! এই দেখুন," বলে আঙুল ঘুরিয়ে ফ্র্যান্সিস্কাকে একটা আঙটি দেখালেন।"

"এটা কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এটার কথাই আমি বলছিলাম," ফ্র্যান্সিস্কা বলল। "ওদেরও দেখিয়ে দাও।"

"এই যে স্যার, এই সেন্টারে হল প্রমথবাবুর আর্টিফিশিয়াল নীলা, আর পাশে সব সস্তা পাথর। ম্যাডামের এক বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন, মাত্র দশ ডলারে।"

ফ্র্যান্সিস্কা বলল, "প্রমথ ডিটেকটিভকে বলেছে ব্যাগে ওই পাথরটাকে নিয়ে ঘুরতে। হোয়াট এ সিলি অ্যাডভাইস! তাই ডিটেকটিভকে সকালবেলা আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও কস্টিউম জুয়েলরি বানায়।" তারপর একেনবাবুকে বলল, "ইট লুকস ভেরি নাইস, ডিটেকটিভ।"

একেনবাবু মাথা একেবারে নুইয়ে গেল। "বিকজ অফ ইউ ম্যাডাম অল বিকজ অফ ইউ।"

"নেমক হারাম, মাইরি," প্রমথ আমায় বলল। "মালটা দিলাম আমি, আরেকজন পাচ্ছে বাহবা।"

"ইট ইজ বিকজ অফ ইওর সিলি অ্যাডভাইস," বিজয়িনীর মতো মুখ করে ফ্র্যান্সিস্কা বলল।

।। ১৯ ।।

শনিবার মে ২৮, ২০১১

শনিবার সকাল সকাল কলেজে গেলাম। পেপারটা নিয়ে কাজ করা ছাড়াও কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ জমে আছে। যতটা পারি সেগুলো শেষ করতে হবে। তবে বেশ কিছুটা সময় গেল অকাজ করতে। আমার দুটো ইমেল অ্যাকাউন্ট আছে। একটা কলেজের অ্যাকাউন্ট, আরেকটা আমার পার্সোনাল হটমেল আকাউন্ট। দিন সাতেক আমি আমার হটমেল খুলিনি। বেশি ইমেল ওখানে আমি পাই না। কিন্তু আজকে হটমেল-এ

ঢুকে দেখি, এক গুচ্ছের ইমেল সেখানে জড় হয়েছে। যার বেশির ভাগই আমার নয়। ভুল করে আমার ইমেল অ্যাড্রেস কোনও ই-গ্রুপে ঢুকে গেছে, তাদের নানান ই-মেলে আমার মেলবক্স ভারাক্রান্ত। সেগুলো ডিলিট করার পর সেই ই-গ্রুপ থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায়, সেটা উদ্ধার করতেও কিছুটা সময় গেল। এর মধ্যেই এক সিনিয়র কলিগ ঘর খোলা দেখে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ ডিপার্টমেন্ট হেড-এর শ্রাদ্ধ করে গেলেন। যতটা কাজ করতে পারব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। রবিবারেও আবার আসতে হবে। একেনবাবু এরমধ্যে ফোন করলেন। প্রমথ ফ্র্যান্সিস্কার সঙ্গে উইক-এন্ড কাটাচ্ছে, সুতরাং বাড়িতে কুকিং ফ্রন্ট সামলানোর কেউ নেই, নিজেদের চরে খেতে হবে। একেনবাবু একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের খোঁজ পেয়েছেন লেক্সিংটন অ্যাভেনিউয়ে। মাছের ঝোল আর ভাত পাওয়া যায়। খাঁটি বাঙালি স্টাইল, খুব রিজনেবল প্রাইসে। শুধু আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হয়। সেটা জানিয়ে রেখেছেন আপত্তি করব না ধরে নিয়ে। আমার বাঙালি বা ইন্ডিয়ান খাবার না হলেও চলে, কিন্তু একেনবাবু সবসময়েই হা-হুতাশ করেন ওগুলো জুটছে না বলে।

খাবার দোকানটা যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের জন্য স্পেশাল অর্ডার, সর্ষে দিয়ে ইলিশ মাছ, যা দেখলাম মেনুতে নেই। অনেকটা ঝোল ভাতে মেখে এক গ্রাস মুখে তুলে একেনবাবু বললেন, "আঃ! যাই বলুন স্যার, সর্ষে-ইলিশের বিকল্প নেই, পৃথিবীর বেস্ট খাবার।"

"সায়েবদের খাওয়ানোর চেষ্টা করে দেখুন না, ঝাঁঝের চোটে চোখের জলে নাকের জলে হবে।"

"ওঁদের স্যার, টেস্ট ডেভালপ করেনি।"

"বুঝলাম, তা এই কথাটা আপনার বন্ধু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে কখনো বলেছেন?"

"কী যে বলেন স্যার, এটা কি বলা যায়!"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা এসে গেল। একেনবাবু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে আজ দেখা করেছেন বব ক্যাসেলের ব্যাপারে। পুলিশ খুন হবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়নি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুইসাইড বলেই ভাবছে। এটা ভাবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। একটা কারণ তো আমরাও জানি, মায়ের চিকিৎসার জন্য অর্থ জোগাড় করার দুশ্চিন্তা। যেটা জানতাম না, সেটা হল, মানসিক ভাবে বব এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কয়েক সপ্তাহ আগে ডাক্তার দেখিয়ে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট খাচ্ছিলেন। এটা পুলিশের কাছে একটা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট খেলে প্রথম দিকে সুইসাইডের টেন্ডেন্সি দেখা দিতে পারে, এদেশের ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এটাই সাবধানবাণী। মিশেল ক্যাসেলের অ্যানসারিং মেশিনে ববের ফোন মেসেজের সঙ্গে যদি এই তথ্যটা যোগ করা যায় তাহলে সুইসাইড থিওরির পাল্লাই ভারী হয়।

এগুলো শুনে খারাপ লাগল। ভেবেছিলাম পুলিশি অনুসন্ধানে হয়তো কোনও ফাঁক থাকবে। বললাম, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্যাথি ক্যাসেলের কেসটা একেবারেই হোপলেস।"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে স্যার। শুধু একটা ইন্টারেস্টিং খবর, মিস্টার ক্যাসেল আর অশোকবাবু ভালো বন্ধু ছিলেন।"

"কিন্তু সেটা তো ইন্দ্র আর সতীশ দুজনেই বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ," সেটাই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কনফার্ম করলেন। "শুধু তাই নয় স্যার, অশোকবাবু

মারা যাবার দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ শুধু দু'জনকে ফোন করেছিলেন, মিস সীমা আর মিস্টার ক্যাসেলকে।"

"সেটা তো আগেই শুনেছেন সীমা আর সতীশ কুমারের কাছ থেকে। পুলিশ কী করে জানল, মোবাইল ফোনের রেকর্ড দেখে?"

"রাইট স্যার।"

"কী বলেছিলেন ফোনে?"

"মিসেস সীমাকে কী বলেছিলেন সেটা তো আমরা জানি। মিস্টার ক্যাসেলকে কী বলেছিলেন পুলিশ এখনও বার করতে পারেনি।"

"দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং! পুলিশ তাহলে ববকে কী জেরা করল?"

"তা তো বলতে পারব না স্যার। পুলিশ তখন হয়তো এই ফোনের কথাটা জানত না।"

"কিন্তু বব তো জানত?"

"দ্যাট ইজ পাজলিং স্যার। এক হতে পারে মিস্টার ক্যাসেল তখনও জানতেন না মেসেজটা কী। সতীশবাবু বললেন না, ওঁর ভয়েস মেল রিট্রিভ করতে পারছিলেন না।"

"হয়তো মেসেজটা রিট্রিভ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি, অথবা ইচ্ছে করেই জানাননি।"

"তাও সম্ভব স্যার।"

"আপনি কী সন্দেহ করছেন, অশোক আর ববের মৃত্যুর মধ্যে কোনও যোগ আছে?"

"না স্যার, তা বলছি না। মিস্টার ক্যাসেল হয়তো সুইসাইউহ করেছেন। তবে খবরটা জানতে পেলে অশোকবাবুর মৃত্যুর কারণ হয়তো কিছুটা আঁচ করা যেত। যাক সে কথা, আপনি কী করলেন স্যার সারাদিন?"

"কোনও এক্সাইটিং কাজ নয়, ইমেল ডিলিট করেই কাটল।"

"কেন স্যার, আপনি সব ইমেল জমিয়ে রাখেন?"

ব্যাপারটা একেনবাবুকে বোঝাতে হল। একেনবাবু আজকাল ইন্টারনেট, ইমেল ব্যবহার করেন ঠিকই, কিন্তু কোনও ই-গ্রুপ বা লিস্টসার্ভ-এ ঢোকেননি। কিছু কিছু ই-গ্রুপে কী অজস্র ই-মেল প্রতিদিন চালাচালি হয়, সে ধারণা ওঁর নেই। তবে এসব বিষয়ে জানার আগ্রহ ওঁর প্রচুর।

জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, প্রমথবাবু সেদিন একটা অটোম্যাটিক ফরোয়ার্ডিং সিস্টেমের কথা বলছিলেন। সেটা করলে নাকি আমার জি-মেল-এর অ্যাকাউন্টে কেউ ইমেল পাঠালে অটোম্যাটিক্যালি সেটা আমার হটমেল অ্যাকাউন্টে চলে যাবে!"

"তা যাবে, যদি আপনার অ্যাকাউন্ট সেটিং সে-ভাবে করেন।"

"তাহলে স্যার, আপনি কলেজের অ্যাকাউন্টটা সে ভাবে সেট করলেন না কেন? সেখানকার সব ইমেল অটোমেটিক্যালি আপনার হটমেল অ্যাকাউন্টে চলে যেত। হটমেল-এ ঢুকলেই আপনি সব ইমেল পেয়ে যেতেন, এদিক ওদিক করতে হত না।"

"আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সেটা করা যায় না। আমার ধারণা বড় বড় কোনও কোম্পানিতেই সেটা করতে দেওয়া হয় না।"

।। ২০।।

সোমবার, মে ৩০, ২০১১

কিশোরের তামিলনাড়ুর ডিজি কাকা গতকাল নিউ ইয়র্কে এসেছেন। আজ বিকেলে কিশোরের কাছে আসবেন। কিশোর আমাকে ডিনারে ডেকেছে। আমাকে বুঝিয়েছে ওর কাকা ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন, আমার মতো একজন ফিজিক্সের অধ্যাপকের সঙ্গ ওঁর ভালো লাগবে। হোয়াট এ লেইম এক্সকিউজ! আসল কারণ বেভ যাচ্ছে, বেভের পরিবহন সমস্যা মিটবে। কিশোর থাকে নিউ জার্সির ক্লার্ক বলে একটা শহরে। গাড়ি না থাকলে বার দুই বাস চেঞ্জ করে যেতে হয়। নিঃসন্দেহে একটা হ্যাস্ল। উইক-ডে বা কাজের দিনে এক ঘণ্টা ঠেঙিয়ে কোথাও ডিনার খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা আমার ধাতে পোষায় না। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে রাজি হতে হয়েছে। বিশেষ করে আমার যাওয়ার উপর যখন ওর ভাবি বধূর যাওয়া নির্ভর করছে।

আমার গাড়িটা ইউনিভার্সিটির কাছেই একটা গ্যারাজে থাকে। তাই ঠিক করলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আর বাড়ি ফিরব না, সেখান থেকেই সোজা কিশোরের কাছে চলে যাব।

বেভ দেখলাম খুব এক্সাইটেড। এরমধ্যেই যাবার লজিস্টিক্স নিয়ে বার কয়েক আলোচনা করে গেছে, অথচ এটা কোনও ব্যাপারই নয়। বেভ ইউনিভার্সিটির কাছেই থাকে। এখান থেকে যদি নাও যায়, স্বচ্ছন্দে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারি। দেখলাম ও মনঃস্থির করতে পারছে না। প্রথম বার বলল, বাড়ি থেকে যাবে। তারপর ঠিক করল বাড়ি না, অফিস থেকেই যাবে। তৃতীয় বার যখন আমার ঘরে ঢুকে বলল, "আমাকে তুমি বাড়ি থেকেই তুলে নিও, আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব।" আমি ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, "তুমি খেয়াল করেছ, এই চার মাসে তোমার সঙ্গে যা কথা হয়েছে তার থেকে বহুগুণ বেশি কথা হয়েছে, এই ক'দিনে।"

"ইয়েস, আই নোটিস্ড।"

"এত বেশি কথা হলে কিশোর রেগে যাবে।"

"ও, দ্যাট উইল বি ফান, লেট আস ডু সামথিং টু মেক হিম জেলাস, প্লিজ প্লিজ!"

পাগলাকে বলেছি সাঁকো না নাড়তে! কী বিপদ!

বেভ যেখানে থাকে আমার গ্যারাজ থেকে সেখানে পৌঁছতে মিনিট পাঁচেকও লাগে না। বেভ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেখলাম বেশ সুন্দর লম্বা হাল্কা সবুজ রঙের ইভনিং ড্রেস পরেছে। কানে সবুজ পাথরের দুল, আর ম্যাচিং হার। হাতে কালো সেকুইনের ব্যাগ, কিশোরের দেওয়া উপহার।"

গাড়িতে উঠে বেভ আমায় জিজ্ঞেস করল, "ডু আই লুক রেস্পেক্টেবল?"

"খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।"

"কিশোর বলেছে ওর আঙ্কল একটু কনসার্ভেটিভ।"

"আমি সিওর তুমি ওকে কুপোকাত করবে।"

"ইউ থিঙ্ক সো?"

"ইয়েস, শুধু তোমায় পার্সোনাল প্রশ্ন করতে চাইলে, আমায় প্রথম দিন যা বলেছিলে, সেটা যেন না বল।"

"হোয়াট ডিড আই সে টু ইউ?"

"ফরগেট ইট।"

"না সিরিয়াসলি, কী বলেছিলাম তোমাকে?"

"তোমার সেক্সলাইফ সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর আমায় দেবে না।"

"আই সি। তুমি বলছ, সেটা না বলে খোলাখুলি উত্তর দেওয়া উচিত।" বলেই এক ঝলক হেসে ঠিক সেদিনের মতো আমার হাতে আলতো করে একটা চাপ দিয়ে বলল, "জাস্ট কিডিং।"

কিশোরের আঙ্কল প্রভাকর রাওর হাবেভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উনি একজন বড় অফিসার। কিশোর দেখলাম ওঁকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। আমরা ঢোকার একটু আগেই বিয়ার অফার করে কিশোর ধমক খেয়েছ্ তারই জের চলছে। আমেরিকায় মুখে দেবার মতো নাকি কোনও বিয়ার তৈরি হয় না। সত্যিকারের বিয়ার শুধু জার্মানি আর অস্ট্রিয়াতেই মেলে। ইনফ্যাক্ট আমেরিকায় পাতে দেবার মতো কোনও স্পিরিটও তৈরি হয় না। তার জন্যে ইউরোপ যেতে হবে। বেচারা কিশোর! বিয়ার রেখে এসে ব্ল্যাক লেবেলের একটা বোতল নিয়ে আসতেই সেটার দিকে একটু হেলা ভরে তাকিয়ে বললেন, "ব্লেন্ডেড চলবে না, সিঙ্গল মল্ট কিছু আছে?"

প্রভাকর রাও গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্পের মূল বক্তব্য সব সময়েই আমি আর আমি। পুলিশ মেডেল পাওয়া থেকে শুরু করে, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক, সন্ত্রাসবাদী এক নেতাকে (নামটা আর করলাম না) তার লুকোনো ডেরাতে গিয়ে অ্যারেস্ট করা, বলিউডের এক অভিনেত্রীকে কেচ্ছার হাত থেকে বাঁচানো, কুখ্যাত এক ডাকাতকে খালি হাতে ধরা দীর্ঘ পুলিশ জীবনের নানান কীর্তিকাহিনি আমাদের শোনালেন। শুধু ফিজিক্স নিয়েই কোনও আলোচনা করলেন না। একেবারে প্রথমে বেভের পরিবারের একটু খবরাখবর করেছিলেন। বাবা প্লাম্বার শুনে মনে হল বেশ আশাহত। আমাদের দেশে কলের মিস্তিরিদের সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা কোনওটাই উচ্চ নয়। এদেশে একজন প্লাম্বার আমার থেকে বেশি রোজগার করে সেটা আমি জানি। উনি জানেন কিনা জানি না। জানলেও মনোভাবের পরিবর্তন হত না হয়তো। এর পর থেকে বেভকে পুরো উপেক্ষা করে সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে গল্প করে গেলেন। আমার একটু খারাপই লাগছিল। মাঝে মাঝে বেভকে ওঁর গল্পের সোশাল আর কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেবার চেষ্টা করছিলাম। খানিকক্ষণ পরে বেভ নিজেই 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠে চলে গেল রান্নাঘরে কিশোরকে সাহায্য করতে।

আঙ্কলকে ইমপ্রেস করার জন্যেই বোধহয় কিশোর বহু পদ করেছে। সবগুলোই যে দারুণ হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে না, কিন্তু যেহেতু অনেক চয়েস আছে, বাছবিচার করে খেলে উপাদেয় খাবারেই পেট ভরানো হয়তো যাবে। ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে দশটা। আমি সাধারণত সাতটার মধ্যেই ডিনার খেয়েনি। আমার ধারণা কিশোরও তাড়াতাড়ি খায়। কিন্তু মিস্টার প্রভাকর রাও রাত দশটা এগারোটার আগে খেতে বসেন না। কিশোর দুয়েকবার খাবার প্রসঙ্গ তোলায় উনি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছেন, 'এত তাড়াতাড়ি

কেন?’ শেষে আমিই কিশোরকে বলেছি, আমায় এবার উঠতে হবে। নইলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা হয়ে যাবে। বেভের মুখ দেখে মনে হল ও-ও পালাতে পারলে বাঁচে। বলল, “ইয়েস, উই শুড লিভ সুন।”

এরপর কিশোর আর অপেক্ষা করেনি, টেবিলে খাবার নিয়ে এসেছে। মিস্টার রাওর বোধহয় আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমরা খেতে বসে যাচ্ছি দেখে উনিও এসে বসলেন।

খাওয়ার মাঝখানে প্রভাকর কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, সকাল ন’টায় ম্যানহ্যাটানে ওঁর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কতক্ষণ লাগবে ওখানে যেতে।

কিশোর উত্তর দিল, “ওই সময়টাতে লিঙ্কন টানেলে একটু জ্যাম হয়, ঘণ্টা দেড়েকের বেশিই লাগবে। ম্যানহ্যাটানের কোথায় যাবেন?”

“নিউ হেরিটেজ হোটেলে। হোটেল মালিকের সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট।”

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, “আপনি দেবরাজ সিং-এর সঙ্গে দেখা করছেন?”

“ইয়েস, তুমি ওকে চেন?”

“একবার মিট করেছি। আমার এক ডিটেকটিভ বন্ধুর কাছে এসেছিলেন, ওঁর একজন স্টাফকে কে মার্ডার করেছে, সেটা তদন্ত করার জন্যে।”

“তুমি অশোক দুবের কথা বলছ?”

এবার আমার অবাক হবার পালা, “আপনি অশোককে চেনেন?”

“ওর বাবাকে খুব ভালো করে চিনি। প্রকাশ দুবে যখন ত্রিচি জেলের জেলার ছিলেন তখন ওখানে আমার পোস্টিং হয়। অশোককে দেখেছি ওর বাচ্চা বয়স থেকে। হোয়াট এ ট্র্যাজেডি!”

“দেবরাজ সিং-কেও কি অশোকের সূত্রেই চেনেন?”

“নট এক্স্যাক্টলি। কিছুদিন আগে এক আমেরিকান দেবরাজ সিং-এর ত্রিচি হোটেলে খুন হয়। আমার লোক ওখানে গিয়ে দেখে হোটেল সিকিউরিটিতে অনেক ফাঁক-ফোকর ছিল। ব্যাড পাবলিসিটি এড়াতে দেবরাজ পরের দিনই চলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। সিকিউরিটি জোরদার করার ব্যাপারে আমার অনেক অ্যাডভাইসও নেয়। তখনই আমায় বলে নিউ ইয়র্কে এলে আমি যেন ওর হোটেলে উঠি। আমি অবশ্য ওর হোটেলে উঠিনি, কিন্তু প্রকাশ দুবে একটা কাজ দিয়েছিলেন, সেইজন্যে কাল ওকে ফোন করেছিলাম। তখনই আমাকে ধরল ওর হোটেলে একবার আসতেই হবে। আমাকে নিউ ইয়র্ক ঘুরিয়ে বিকেলে প্লেনে তুলে দেবে।”

এ ব্যাপারে আমার কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করা উচিত নয়, কিন্তু অশোক দুবের প্রসঙ্গ এসে পাড়ায় জিজ্ঞেস করলাম, “কিছু মনে করবেন না, কাজটা কি অশোক সংক্রান্ত?”

“রাইট। অশোক লাখ দুই টাকা জোগাড় করছিল একটা স্কুলের জন্যে। এইটুকুই মিস্টার দুবে জানতেন। কিন্তু কোন স্কুলের জন্যে এই টাকাটা তুলছিল, সেটা জানতেন না। উনি নিজে এখন ওই টাকাটা দান করে ছেলের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে চান। কিন্তু কাকে দেবেন সেটাই জানেন না। মনে হল, দেবরাজ যদি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা এ ব্যাপারে কিছু জানো?”

“না, কিছুই জানি না। এটুকু জানি যে, উনি হাজার দশেক ডলার তোলার চেষ্টা করছিলেন। একটু খোঁজ খবর করে দেখতে পারি।”

"দেখ তো। মিস্টার দুবে একজন চমৎকার লোক। বহুদিন অবশ্য ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। জন হেক্টারের ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ বহুদিন বাদে দেখা হয়।"

"জন হেক্টার!"

"হ্যাঁ, যে আমেরিকানটি খুন হয়।"

"উনিও কি মিস্টার দুবের বন্ধু ছিলেন?"

"তুমিও তো দেখি রিপোর্টারদের মতো প্রশ্ন শুরু করছ?" প্রভাকর রাও বললেন।

"আই অ্যাম সরি। ব্যাপারটা হল আমার বন্ধু একেনবাবু অশোকের মার্ডার নিয়ে তদন্ত করছেন। তাই অশোক সম্পর্কে কোনও খবর পেলে আমারও ইন্টারেস্ট লেগে যায়।"

প্রভাকর রাও বললেন, "এটা কিন্তু অশোকের ব্যাপার নয়, অশোকের বাবার। তদন্তে বের হয় যে, হেক্টার প্রকাশ দুবেদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল কল্পনা নামে একটি মেয়ের খোঁজখবর নিতে। ইন সেভেন্টিস শি গট কনভিক্টেড ইন এ মার্ডার কেস। কল্পনাকে নিয়ে একটা বই বা আর্টিকল লিখতে হেক্টার মালমশলা সংগ্রহ করছিল। কল্পনা মারা গেছে বহুদিন হল। মিসেস দুবেও মেয়েটিকে চিনতেন। মিসেস দুবে অবশ্য এ নিয়ে হেক্টারের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি, প্রকাশও দেখা করেননি।"

"হেক্টারের খুনি কি ধরা পড়েছে?"

"এখনও পড়েনি, তবে তদন্ত চলছে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বেই - পালাবে কোথায়?"

খাওয়া দাওয়ার পর আর বসলাম না। ফেরার পথে বেভ বলল, "আই ডোন্ট থিঙ্ক হি লাইকড মি।"

আমি প্রভাকর রাওকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করলাম না। বললাম, "যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হল কিশোর তোমাকে ভালোবাসে।"

"কেন আমাকে ওঁর পছন্দ হল না বলতে পার?"

"পছন্দ হল না ভাবছ কেন, এক একজন লোক এক এক ভাবে রিয়্যাক্ট করে।"

"উনি তো আমার দিকে তাকাচ্ছিলেনও না!"

"আমিও তো তোমার দিকে বহুদিন ভালো করে তাকাইনি।"

"কারণ আমাকে তুমি হেট করতে।"

"দ্যাট্স নট ট্রু।"

বেভ হঠাৎ চুপ করে গেল।

"আর ইউ ওকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ইয়েস, আই অ্যাম।"

এক একটা সময় আসে, যখন কথা না বলাই ভালো। এটা সেরকম একটা সময়। যখন ওর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ ঘুরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গালে প্রায় ঠোঁটের কাছে চুমু খেল। একটা আবছা সুগন্ধের ঝলকা নাকে এল। এত দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে আমি একটু হতচকিত।

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য রাইড।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।"

আমি নেমে ওর দরজা খুলে দেবার আগেই নিজেই দরজা খুলে ঝটিতি নেমে গেল।

।। ২১।।

মঙ্গলবার মে ৩১, ২০১১

ঘুম থেকে উঠতেই প্রমথ বলল, "কোথায় ছিলি কাল রাত্রে, ডঃ দাস তোকে ধরার চেষ্টা করছিলেন।"

ডঃ বিমল দাস কলাম্বিয়াতে ইকনমিক্স পড়ান, খুব সিনিয়র লোক। ওঁর বড় মেয়ে ডাক্তার, অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটো মেয়ে ইন্দ্রাণী প্রায় আমাদের বয়সি। এমবিএ করে একটা কোম্পানিতে ভালো চাকরি করছে।

"কই আমি তো কোনও ফোন পাইনি!"

"কারণ তোর ফোন অফ ছিল। তোর ফোন অফ রাখার হ্যাবিটটা গেল না। মোবাইল ফোন রেখেছিস কেন?"

এ অভিযোগটা আমি অস্বীকার করতে পারি না। মিটিং বা সেমিনার থাকলে অনেক সময় ফোনটা বন্ধ করে রাখি, পরে চালু করতে ভুলে যাই।

"কেন ফোন করেছিলেন জানিস?"

"ডিনারে নেমন্তন্ন করার জন্যে।"

"কবে ডেকেছেন?"

"এই শুক্রবার।"

"তার মানে তো তোরশু, এত শর্ট নোটিস?"

"আমার ধারণা কেউ বোধহয় শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল করেছে, তাই আমরা চান্স পেয়েছি।"

"এমনি ডাকছেন, না কোনও বিশেষ কারণে?"

"তুই ফোন করে জিজ্ঞেস কর না, মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে?"

"স্টুপিডামো করিস না। যখন ফোন করলেন, তখন নেমন্তন্নের কারণটা জানতে চাইলি না! হয়তো বিবাহবার্ষিকী বা ওই ধরনের কিছু। সেই মতো একটা গিফট তো নিয়ে যেতে হবে।"

"বিগ ডিল। একটা ওয়াইনের বোতল নিয়ে যাব, চুকে যাবে।"

"ব্যাড আইডিয়া", বলে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কী মত?"

একেনবাবু সোফার এক কোনে চোখ আধ বোজা করে কিউটিপ দিয়ে কান চুলকোচ্ছিলেন। আমার প্রশ্নে একটু থতোমতো খেয়ে বললেন, "আমার আবার কী মত স্যার, আপনাদের মত-ই আমার মত।"

"সেইজন্যেই তো আপনাকে প্রশ্ন করা, আমাদের তো মতের মিল হচ্ছে না।"

"তাহলে তো মুশকিল হল স্যার," একেনবাবু কিউটিপটা কান থেকে বার করে বললেন, "কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল?"

"আপনি মশাই সামথিং, কোন জগতে থাকেন?" প্রমথ একটা ধমক লাগাল।

একেনবাবু অসহায় মুখ দেখে আমি বললাম, "ডঃ দাস শনিবার ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন, ওঁদের জন্য কী নিয়ে যাব, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে।"

"এবার বুঝলাম স্যার, তা আপনি কী বলেন?"

"আমি বলেছি, কেন ডেকেছেন সেটা আগে জানা দরকার। তারপর গিফট কেনার

কথা ভাবা যাবে।”

“এ তো স্যার খুবই যুক্তিযুক্ত কথা।” আমার কথায় সায় দিয়ে প্রমথকে জিজ্ঞেস করলেন, “কেন স্যার, এটা আপনি মানেন না?”

“খুবই মানি, কিন্তু বাপি ফোন করে নেমন্তন্নের কারণটা জানতে রাজি নয়।”

“তাহলে তো স্যার মুশকিল।”

“এক কাজ করুন না, আপনি তো একজন গোয়েন্দা–কেন ডেকেছেন, সেই রহস্যটা ভেদ করুন।”

ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে অ্যান্ডি গুহর ফোন এল। অ্যান্ডির আসল নাম অনিন্দ্য, এখানে এসে ওটাকে অ্যান্ডি বানিয়ে নিয়েছে। কলকাতায় আমাদের সঙ্গেই কলেজে পড়ত। তারপর সিপিএ করে একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম খুলেছে। সেই সঙ্গে ডাঃ দাসের ছোটো মেয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে প্রেম করছে। অ্যান্ডির কাছে নেমন্তন্নের কারণটা জানা গেল। ডাঃ দাসের এক ভাইপো কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্কে এসেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির ম্যাথম্যাটিক্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন পেয়েছে। ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই নেমন্তন্ন।

অ্যান্ডি অবশ্য ফোন করেছিল অন্য কারণে। ও ইন্ডিয়া যাবে, ভালো একজন ট্র্যাভেল এজেন্ট খুঁজছে। প্রমথকে মুরুব্বি ঠাউরেছে। প্রমথ নানান ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে ঠিকই, কিন্তু যা জানে তার থেকেও বেশি বিজ্ঞতা জাহির করে।

।। ২২।।

শুক্রবার জুন ৩, ২০১১

ডাঃ দাসের বাড়িতে আজ বাইরের কেউ নেই। আমরা তিনজন, ডাঃ দাস আর মিসেস দাস, অজয় (ডাক্তার দাসের ভাইপো) আর ইন্দ্রাণী। সাধারণত ওঁদের বাড়ির পার্টিতে অসংখ্য অতিথি আসে। তাঁদের সামাল দিতে ওঁরা হন্তদন্ত থাকেন, কথা বলার তেমন ফুরসত থাকে না। আজকে এই প্রথম রিল্যাক্সড হয়ে বসে আমাদের সঙ্গে দু'জনে গল্প করলেন। ডাঃ দাস গল্প করতে ভালোবাসেন, তবে মাঝেমাঝেই স্থান কাল পাত্র একটু গুলিয়ে ফেলেন। মিসেস দাসের একেবারে স্টিল ট্র্যাপ মাইন্ড, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে থাকে। স্ত্রী ভুল ধরিয়ে দিলে আবার হেসে ফেলেন। ‘আঃ ডিটেলস নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন, গল্পের রসটা তো ঠিকই আছে।’ মিসেস দাস তখন ধমক দেন, ‘একজনের কথা আরেকজনের ঘাড়ে চাপাচ্ছ, ওরা তো তোমাকে চেনে না, লোকদের ভুল বুঝবে।’

খানিকবাদে অ্যান্ডিও এল। কথায় কথায় বেরল যে মিসেস দাস প্রমথর মাকে চিনতেন। এরপর যা হয় শুরু হল– একে চিনি কি না, ওকে চিনি কি না। ডাঃ দাস বহু লোককে চেনেন, যাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে না চিনলেও নামে চিনি। শুধু চেনেন তাই না, অনেকের

সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট বন্ধুত্বও আছে। বহু সেলিব্রেটি নিউ ইয়র্কে এসে ওঁর বাড়িতে থেকে গেছেন শুনলাম। তবে সবচেয়ে অবাক হলাম যখন শুনলাম উনি বিপাশা মিত্রের বাবা সুজয় মিত্রকে চিনতেন। কথাটা অবশ্য উঠল ওঁর বন্ধুদের মধ্যে কতজন দেয়ালে ছবি হয়ে গেছেন সেই প্রসঙ্গে।

"বুঝলে, আমার এখন লাস্ট অয়েল চেঞ্জ চলছে," ডাঃ দাস বললেন।

"তার মানে কী স্যার?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"গাড়ির মাইলেজের সঙ্গে যদি মানুষের জীবন তুলনা কর, এক হাজার মাইল হচ্ছে এক এক বছর, তাহলে বড় জোর আর বছর দশেক বাকি আছে আমার জীবনের। পরের অয়েল চেঞ্জের সময় আসার আগেই গাড়ি বিকল।"

"বাবা, তুমি এত বাজে কথা বলতে পার," ইন্দ্রাণী রাগ করল।

"আরে, আমার চেনা জানার সংখ্যা তো প্রতি বছর কমছে। এ বছরই তো দু'জন মারা গেল।" তারপর আঙুল গুণে গুণে কে কে মারা গেছে শুরু করলেন। ইন্দ্রাণী রাগ করে অ্যান্ডিকে নিয়ে অন্য একটা ঘরে চলে গেল। ডাঃ দাস যখন মোটর অ্যাকসিডেন্টে রিয়েল এস্টেট কিং সুজয় মিত্রের মৃত্যুর কথা বললেন, তখন প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বিপাশা মিত্রের বাবার কথা বলছেন?"

"ও ছাড়া আর কে রিয়েল এস্টেট কিং আছে?"

"আপনার সঙ্গে ওঁর কী সূত্রে পরিচয়?"

"সে এক দীর্ঘ কাহিনি।" তারপর মিসেস দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনে আছে?"

"থাকবে না, প্রিয়াঙ্কার সেকেন্ড বার্থডে ছিল।"

"এক্স্যাক্টলি, ১৯৭৪ সালের পয়লা নভেম্বর।"

"তোমার মাথাটা একেবারে গেছে, নিজের মেয়ের জন্মদিন মনে রাখতে পার না। ১৯৭৪ নয়, ১৯৭৫।"

"আরে যাহা বাহান্ন, তাহাই তিপ্পান্ন। মোটকথা বহুদিন আগে, আমরা তখন দিল্লীতে। মেয়ের জন্মদিনে বেশ কয়েকজন বন্ধুকে ডেকেছিলাম। তখন ধ্রুবর সঙ্গে সুজয় মিত্র এসেছিল।"

"ধ্রুব নয়, বিজনবাবুর সঙ্গে।"

"ওই হল। বিজনের বাড়িতে উনি গেস্ট ছিলেন। বাড়িতে একা না রেখে বিজন ওকে নিয়ে এসেছিল, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের এক বিজনেসম্যান হিসেবে। বেশিক্ষণ অবশ্য ছিল না। সুজয় তার পরের দিন নিউ ইয়র্ক ফিরে যাচ্ছে। ওরা চলে যাবার পর আমরা হাসাহাসি করছিলাম বিজনের সঙ্গেই সব বিজনেসম্যানদের বন্ধুত্ব বলে।"

মিসেস দাস ব্যাপারটা বিশদ করলেন, "বিজনবাবু ছিলেন কাস্টমসের একজন বড় অফিসার। কিন্তু সেটার জন্যে নয়, সুজয় ছিলেন বিজনের দূর সম্পর্কের ভাই।"

"এর কয়েক মাস বাদে আমি কলাম্বিয়াতে পড়াতে আসি। তখন বিজনের সূত্রেই নতুন করে সুজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ওর বিয়েও আমরা অ্যাটেন্ড করেছি।"

"সেকেন্ড বিয়ে," মিসেস দাস বললেন।

"ওঁর প্রথম স্ত্রীকে কি স্যার আপনারা দেখেছেন?"

"না," মিসেস দাস উত্তর দিলেন। "তিনি মারা যাবার পর উনি ইন্ডিয়া যান। গল্প করতে করতে একবার বলেছিলেন, দুঃখ ভুলতে মেয়েকে বাবার কাছে রেখে মাস কয়েক

ইন্ডিয়াতে গিয়ে ছিলেন।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, আমি জানতাম না ওঁর সঙ্গে ইন্ডিয়ার এত যোগাযোগ ছিল," একেনবাবু বললেন।

"মনে হয় না তেমন ছিল বলে," ডাঃ দাস বললেন। "এর পরে তো আর কখনো যায়নি।"

।। ২৩।।

শনিবার জুন ৪, ২০১১

সকালে বিপাশা মিত্রের ফোন এল। একেনবাবু ছিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর কাজটা কী রকম এগোচ্ছে?

"উত্তরটা একেনবাবু ভালো দিতে পারবেন," আমি বললাম, "তবে কাজ চলছে আমি জানি।"

"ঠিক আছে, আমায় ফোন করতে বলবেন।" বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

একেনবাবু আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরলেন। প্রমথ বলল, "কী মশাই, গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর বিপাশার হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে বেচারা বাপিকে!"

"ম্যাডাম ফোন করেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলেন ফটো চুরির ব্যাপারটার ফয়সালা হয়েছে কিনা।"

একেনবাবু সোফায় বসে প্রমথকে বলল, "একটু কফি পেলে স্যার আলোচনা করা যেত।"

"বেশ তো বানিয়ে নিন না। জল আছে, কফি আছে, দুধ-চিনি সবই আছে।"

"তা বানানো যায় অবশ্যি।"

"আপনি বসুন, আমি বানাচ্ছি।" বলে আমি উঠতে যাচ্ছি, "থাক," বলে প্রমথ আমায় থামিয়ে দিল। "তুই বানালে ওটা গেলা যাবে না।"

কফি খেতে খেতে একেনবাবু বললেন, "ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিলেন স্যার। ইন্দ্রবাবুদের পোকার টিমের এড গুয়াঙ্গিয়াল এক কালে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাম্বলিং জয়েন্ট চালাতেন। ইল্লিগ্যাল গ্যাম্বলিং-এর কারবার চালাবার জন্যে কিছুদিন জেল খেটেছিলেন। তার মানে মিস সীমার অবসার্ভেশন খুব একটা ভুল নয়।"

"এরকম একটা লোককে দেবরাজ সিং চাকরি দিলেন! আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইজড," প্রমথ বিস্ময় প্রকাশ করল।

"জেল-খাটা লোকদেরও তো কাজ করে খেতে হবে স্যার। উনি নাকি এখন খুব ভালো কুক। জেলে থাকতে থাকতেই ফ্রেঞ্চ রান্না শিখেছিলেন। এ দেশের জেলে তো এসব অনেক ট্রেনিং পোগ্রাম আছে।"

"গ্যাম্বলিং-এর হ্যাবিট তো লোকটা ছাড়েনি। সম্ভবত অশোককেও নেশাটা

ধরিয়েছিল।”

“কিন্তু স্যার, অশোকবাবু তো এই পোকার খেলার দলে ছিলেন না?”

“এক দিন তো খেলেছিল আর জিতেও ছিল। তাছাড়া আপনি কেন ভাবছেন গুয়াঙ্গিয়ালের ওই একটাই ঠেক ছিল? জুয়ারিরা কি সপ্তাহে এক দিন খেলেই সন্তুষ্ট থাকে? আমি শিওর অন্য জায়গাতেও আসর বসাত। সেখানে অশোক থাকতে পারে না?”

এটা মন্দ বলেননি, স্যার। সেইজন্যেই ইন্দ্রবাবুর পোকার টিমের তিনজন মিস্টার এড, শেখরবাবু আর মিস্টার জিমের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।”

“কবে বলবেন?”

“আজ বিকেলে। আমি ইন্দ্রবাবুকে ফোন করে জেনেছি সবাইকে আজ বিকেলে হোটেলে পাব।”

“তা তো বুঝলাম, তারা কথা বলবে?”

“তা বলবেন, স্যার। দেবরাজবাবু সবাইকে কো-অপারেট করতে বলেছেন।”

“গুড,” আমি বললাম।” এবার বলুন, চুরির ব্যাপারে বিপাশাকে কী বলবেন?”

“সন্দেহের একটা তীর তো অশোকবাবুর দিকে থেকেই যাচ্ছে।”

“আপনার কথার সুরে কনভিকশনের একটু অভাব দেখছি।” প্রমথ টিপ্পনী কাটলো।

“কে জানে স্যার!”

“আমার তো এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই,” প্রমথ বলল, “দেখুন, অশোক ওর কাজের জন্য কিংবা সম্ভবত এই এড গুয়াঙ্গিয়াল বা দলের কারোর জুয়োর দেনা মেটাবার টাকা জোগাড় করে উঠতে পারছিল না। এই সময়ে ও বিপাশার একটা ফাংশন অর্গানাইজ করতে বিপাশার বাড়ি যায়। সেখানে গিয়ে নিশ্চয় একটা খাম ওর নজরে পড়ে, যার স্ট্যাম্পটা দামি ও জানত। খামটা পকেটে পুরে স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে প্রথমে গিয়েছিল ফিলাটেলিস্ট কর্নারে। সেখানে অবশ্য খদ্দের মেলে না। তবে আমার ধারণা পরে অন্য কাউকে ভালো দামেই বিক্রি করেছিল।”

“সেটা কী করে বুঝলি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“সীমার কথা থেকে। অশোক সীমাকে ফোন করে জ্যাকপট হিট করার কথা বলেনি? তার মানে কি? হঠাৎ লাকি হয়ে যাওয়া না? আনফরচুনেটলি সেই টাকা পাওয়াটাই ওর কাল হল। কেউ জানত যে অনেক ক্যাশ নিয়ে ও বাড়ি যাচ্ছে। কে জানে, হয়তো এই এড গুয়াঙ্গিয়ালই জানত। সেই হয়তো ওকে বাড়িতে রাইড দেবার নাম করে মার্ডারড হিম ফর দ্য মানি। পরে নির্জন জায়গায় বডিটা ডাম্প করে ইন্দ্রর বাড়িতে পোকার খেলতে যায়।”

জাম্পিং টু কনক্লুশনে প্রমথর জুরি নেই। আমি বললাম, “কিন্তু টাইমিংটা তো মিলছে না। টাইম অফ ডেথ হল আটটা থেকে দশটা। তার আগেই তো ইন্দ্রবাবুর বাড়িতে এড চলে এসেছে।”

“আরে রাখ তোর টাইমিং। ফরেন্সিক সায়েন্স অতোটা প্রোগ্রেস করেনি যে, এক আধ ঘণ্টার এদিক ওদিক হবে না।”

“তাহলে আমি বলব, শুধু টাকার জন্যে কেন, এড যদি জানত অশোক পাঁচ হাজার ডলারের স্ট্যাম্প নিয়ে ঘুরছে, তাহলে স্ট্যাম্পের জন্যেও তো খুন করতে পারত।”

“আলবত পারত, ওটা হল আরেকটা সিনারিও।”

“তোর কথা ঠিক হলেও, বিপাশার সমস্যা মিটছে কিন্তু এতে না। ওর ফটো বা চিঠি কার কাছে তার কোনও হদিশ এতে নেই।”

"গুলি মার বিপাশার সমস্যা। এখন চিন্তা কর অশোকের মৃত্যু নিয়ে। দ্বিতীয় সিনারিওটা ঠিক হলে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সাহায্য নিয়ে একেনবাবুকে বার করতে হবে, নিউ ইয়র্কে কে ওই স্ট্যাম্পটা রিসেন্টলি কিনেছে, যে কাজটা একেনবাবু ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। ঠিক কিনা?" প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

একেনবাবুর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, হঠাৎ যে মৌনীবাবা হয়ে গেলেন?"

প্রশ্নটা একেনবাবু এবার বোধহয় শুনলেন। "আমি একটু কনফিউসড স্যার।"

"কী নিয়ে?"

"হঠাৎ সুজয় মিত্র দেশে গেলেন কেন?"

"সেটা তো প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা, তার সঙ্গে এই ছবির কী সম্পর্ক?"

"তা নেই স্যার। হঠাৎ মনে পড়ল, তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।" তারপর মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মনে প্রশ্নটা জাগেনি স্যার?"

"না জাগেনি, আর জাগলেও উত্তর যিনি দিতে পারতেন তিনি তো আর নেই। তবে চিন্তায় ছটফট না করে বিপাশাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না?" প্রমথর সুরে শ্লেষটা স্পষ্ট।

"কী যে বলেন স্যার, তিনি তো তখন বেবি ছিলেন।"

"আপনিও তো তখন বালক ছিলেন। খামোকা ওটা ভেবে আর শরীর খারাপ করবেন না।"

"ঠিকই বলেছেন স্যার। এটা আমার একটা বদভ্যাস, মাথায় কিছু ঢুকলে যেতে চায় না। দেখুন না স্যার, এই নীলা নিয়ে কী ভুগেছি!"

"সেটা আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে জানি।" প্রমথ বলল।

"তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায় অশোকবাবুর ব্যাপারে।"

"কী ব্যাপারে?"

"এই যে আপনি বললেন স্যার, অশোকবাবু স্ট্যাম্পটা বিক্রি করার চেষ্টা করছিলেন?"

"সে ব্যাপারে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?"

"তা স্যার, একটু আছে।"

"কেন বলুন তো?" এবার আমি প্রশ্ন করলাম। "আপনি আমি দু'জনেই গিয়েছিলাম স্ট্যাম্পের দোকানটাতে। দোকানিই তো বলল অশোক দুবে যে স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে এসেছিল, তার খরিদ্দার পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তার আগেও একজন আমাকে কফি কর্নারে অশোক ভেবে স্ট্যাম্পের খরিদ্দার পাওয়া গেছে বলেছিল।"

"তা ঠিক স্যার, কিন্তু অশোক দুবে স্ট্যাম্প বিক্রি করতে এসে ভুল ফোন নম্বর দিলেন কেন?"

"উনি হয়তো ঠিক নম্বর দিয়েছিলেন, দোকানদারই ভুল টুকেছিল। এটা কি অবভিয়াস নয়?"

একেনবাবু আর উচ্চবাচ্য করলেন না। মাথার পেছনটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "ভাবছি স্যার, একবার ম্যাডাম প্যামেলা জোনসের সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হয় না।"

এই নামটা আগে শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, "প্যামেলা জোনস কে?"

"মিস্টার জন হেক্টারের সেক্রেটারি।"

"তার সঙ্গে স্ট্যাম্পের সম্পর্ক কি?"

"না স্যার, আমি একটু অন্য জিনিস ভাবছিলাম।"

"কী অন্য জিনিস?"

"মিস্টার ক্যাসেল কেন সেদিন বললেন, অ্যাডভান্স না নিয়ে কিছু করবেন না।"

"এর সঙ্গে আবার বব ক্যাসেলকে জড়াচ্ছেন কেন?"

"দিস ইজ ভেরি কনফিউইসিং স্যার, ভেরি কনফিউসিং।"

"ফ্র্যান্সিস্কা ঠিকই বলে, ইউ আর অলওয়েস কনফিউসড," বলে প্রমথ আরেক প্রস্থ কফি বানাতে গেল।

।। ২৪।।

শনিবার জুন ৪, ২০১১, বিকেল

বিকেল বেলা আমরা সবাই নিউ হেরিটেজ হোটেলে গেলাম। প্রথমে শেখরবাবুর খোঁজ করলাম। ইন্দ্র আগে থেকেই শেখরবাবুকে আমাদের আসার কথা জানিয়ে রেখেছিল। খবর দিতেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক আমাদের থেকে অনেকটাই বড় হবেন। মনে হল বছর পঞ্চাশেক বয়স। কথাবার্তা বেশ হিসেব করে বলেন, ইন্দ্রের মতো হড়বড়ে নন। একেনবাবু যাই জিজ্ঞেস করেন, চোখ বুজে একটু ভেবে আকাশের দিকে তাকিয়ে যা বলার বলেন। বলতেই বলতেই চোখটা আবার বুজে ফেলেন। ভাবার সময়টা প্রশ্ন অনুসারে কম-বেশি হয়।

"ইন্দ্রবাবুর বাড়িতে কি আপনারা প্রতি বৃহস্পতিবার তাস খেলেন?"

এই সিম্পল প্রশ্নটার উত্তর এমন গভীর ভাবে চিন্তা করে দিলেন, মনে হল জীবনমরণ সমস্যার উত্তর দিচ্ছেন।

"প্রতি বৃহস্পতিবার বলা ঠিক হবে না। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খেলা হয়। হলে বৃহস্পতিবারই হয়।"

"কী খেলেন স্যার আপনারা, পোকার?"

আবার একটু নীরবতা।

"তাও খেলি, কেন বলুন তো?"

"আসলে স্যার, অশোকবাবুর মৃত্যু নিয়ে আমরা তদন্ত করছি, ইন্দ্রবাবু আপনাকে বোধহয় বলেছেন।"

"তা বলেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে পোকার খেলার সম্পর্কটা বুঝছি না।"

"অশোকবাবু কি স্যার আপনাদের সঙ্গে পোকার খেলতেন না?"

"না।"

"কোনও দিন খেলেননি?"

শেখরবাবু আবার চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, একদিন খেলেছিল।"

"কবে স্যার?"

"দিনক্ষণ আমার মনে নেই, তবে বেশি দিন আগে নয়।"

"আপনারা যখন খেলতেন, তখন অশোকবাবু কী করতেন স্যার?"

"ঘরেই থাকত। হয় বই পড়ত, নয় ফোনে কথা বলত। মাঝে মাঝে আমাদের ড্রিংকস এনে দিত।"

"ওখানে আপনাদের পাশে বসে ফোন করতেন স্যার?"

"না, না, আমাদের ডিস্টার্ব করত না। ফোন করার দরকার হলে একটু দূরে গিয়ে নীচু গলাতেই কথা বলত।"

"এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্যার?"

প্রশ্নটায় শেখরবাবু একটু বিরক্তই হলেন। আমিও বুঝলাম না, এইসব আলতু ফালতু প্রশ্ন একেনবাবু করছেন কেন!

"আমি তাস খেলতে যেতাম, অশোক এক জায়গায় না পাঁচ জায়গায় দাঁড়িয়ে ফোন করছে দেখতে যেতাম না।"

একেনবাবু আরও বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা পেলেন। শেখরবাবু বললেন, "আমি এখন আর সময় দিতে পারব না। আপনার আর কিছু জানার থাকলে সেগুলো লিখে রেখে যান, আমি উত্তরগুলো ইন্দ্রের হাতে দিয়ে দেব।"

কথাগুলো বলে নমস্কার করে অদৃশ্য হলেন। একেনবাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না।

জিম ভেস্পিকে পাওয়া গেল না। এড গুয়াঙ্গিয়াল ছিলেন। ইন্দ্র ওঁকে ডাকতে যাবার আগে আমাদের সতর্ক করে দিলেন, "এড একটু কুইক টেম্পার্ড। সাবধানে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন।"

ইন্দ্র চলে যেতেই প্রমথ একেনবাবুকে বলল, "এডকে চটিয়ে হোটেলের এতগুলো লোকের খাওয়া মাটি করবেন না কিন্তু।"

একেনবাবু আবার হিউমার ভালো বোঝেন না। বললেন, "ছি ছি স্যার, চটাব কেন?"

খানিকবাদেই এড এল। দাড়ি-অলা ছ'ফুট লম্বা গাট্টাগোট্টা একটা লোক। বয়স আমাদের মতোই হবে। মাথাটা কামানো, গলায় একটা সোনালী চেন। সোজা কিচেন থেকে এসেছে বলেই বোধহয় ঘর্মাক্ত কলেবর। রুমাল দিয়ে মাথা আর ঘাড় মুছছে। দেখে মনে হল বেশ উদ্ধত টাইপ।

ইন্দ্র আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এড বলল, "আমি ভীষণ বিজি, কথা বলার সময় নেই।"

একেনবাবু বললেন, "কখন আপনার সময় হবে স্যার, তখনই না হয় আমরা কথা বলব।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে এড খানিকটা ধমকের সুরেই বলল, "কী জানতে চাও?"

"স্যার, আপনি কি অশোকবাবুকে একটা পোকার খেলার বই দিয়েছিলেন?"

"ইজ দ্যাট এ ক্রাইম?"

"ক্রাইম কেন হবে স্যার, দিয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করছি।"

"দিয়েছিলাম।"

"কেন বলবেন?"

"আট ডলারের একটা বই কেন দিয়েছি, তার কারণ তোমাকে জানাতে হবে? গিভ মি এ ব্রেক!"

শেষের স্ল্যাংটার অর্থ একেনবাবু ঠিক বুঝলেন কিনা জানি না। জিজ্ঞেস করলেন,

"আপনি কি স্যার পোকার খেলার একজন এক্সপার্ট?"
"আই লাইক দ্য গেম।"
"শুধু কি ইন্দ্রবাবুদের সঙ্গে খেলেন, না অন্য জায়গাতেও খেলেন?"
"দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।"
কোনও সন্দেহ নেই লোকটা অত্যন্ত অবনক্সাস।
প্রমথ হঠাৎ বলে ফেলল, "হাউ অ্যাবাউট অ্যান আন্ডারগ্রাউন্ড পোকার জয়েন্ট?"
"গো টু হেল!" মুখচোখ লাল করে ক্ষিপ্ত এড চলে গেল।

এডের চড়া গলা শুনে ইন্দ্র ছুটে এল। আমাদের কাছে ক্ষমা চাইল এডের হয়ে। তার কোনও দরকার ছিল না। আমরা ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাব-ওয়ে ধরে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "শেখরবাবুকে খেলার সময় অশোকবাবু কী করতেন, সে নিয়ে এত প্রশ্ন করছিলেন কেন?"

"কে জানে স্যার, মনে হল মিস্টার এডের সঙ্গে অশোকবাবুর কোনও আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো হয়েছিল, যার জন্য এড অশোকবাবুকে খেলা শিখিয়েছিলেন। খেলার সময় ফোনের অছিলায় অশোকবাবু মিস্টার এডকে অন্যের হাত সম্পর্কে সঙ্কেত দিতেন। লাভের অঙ্ক পরে ভাগাভাগি করতেন। অশোকবাবু অবশ্য ভাগের টাকাটা সৎকাজেই লাগাতেন। ভালো কাজের জন্য একটু অসৎ হওয়ার মধ্যে অশোকবাবু বোধহয় অন্যায় খুঁজে পাননি। পরে এই ভাগাভাগি নিয়েই হয়তো মিস্টার এডের সঙ্গে গোলমাল হয়। এভরি থিং ইজ পসিবল স্যার, নাথিং ইজ ইমপসিবল।"
"কালকে আমাদের প্রোগ্রাম কি?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।
"কালকে সকালে একবার পামেলা জোনসের কাছে যাব।"
"কাল তো রবিবার!"
"উনি কাল অফিসে থাকবেন। আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে স্যার।"

।। ২৫ ।।

রবিবার জুন ৫, ২০১১

জন হেক্টারের অফিস চায়না টাউনে। জায়গাটা আমাদের বাড়ির কাছেই। ম্যানহ্যাটানের এই অঞ্চল একটা টুরিস্ট স্পট। তরি-তরকারি, মাছ, মাংস থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স, ঘড়ি, ক্যামেরা, ইত্যাদি নানান গ্যাজেট ওখানে মেলে! দামও বেশি নয়। আমার এক চাইনিজ কলিগ, জনি চু একবার নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। একটা ঘুপচি দোকান থেকে রোলেক্স ঘড়ি কিনেছিলাম মাত্র তিরিশ ডলারে। জেনুইন নয়, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। 'সাবমেরিনার' মডেলের সেই ঘড়ির লিস্ট প্রাইস ছিল ছ'হাজার ডলার! সেটা পরে প্রথম যেদিন কলেজে গিয়েছিলাম, আমার ডিপার্টমেন্ট হেডের তো প্রায় হার্টফেল হবার জোগাড়! এখনও ওটা আমার প্রাইজ পসেশন। তা সত্ত্বেও বলব, চায়না

টাউন যেতে আমার ভালো লাগে না। মাঝে মধ্যে যেতেই হয়। প্রমথ যখন ভীষণ মেজাজে থাকে, তখন মাছ রাঁধে। কিন্তু বাজারে কিছুতেই একা যাবে না। 'আমি রাঁধব তোমরা খাবে, কিন্তু হেল্প করবে না তা তো হয় না!'

ওর সঙ্গে বাজারে যাওয়াটা যে কী হেল্প, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। যখনই কোনও মাছ কিনতে সাজেস্ট করেছি, সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলেছে। ওর হেল্পারের ডেফিনিশন হচ্ছে বশংবদের মতো পেছন পেছন ঘোরা, যেটা চায়না টাউনে সহজ নয়। রাস্তাগুলো সরু সরু, ফুটপাথগুলোও অপ্রশস্ত। তার ওপর অজস্র লোক আর গাড়ির দৌরাত্ম্য। এক সময় ক্রাইম অঞ্চল হিসেবেও এটার কুখ্যাতি ছিল। সব জায়গা ছেড়ে এই চায়না টাউনে জন হেক্টার কেন অফিস খুলেছিলেন, কে জানে!

প্রমথকে সেটা বলতেই খ্যাঁকখেকিয়ে উঠল, "দু-দিনের যোগী, ভাতকে বলিস পেস্সাদ! কলকাতার থেকে এখানে ভিড় বেশি? রাস্তা সরু? এদিকে তো হুনান চিকেন খেতে জিভ থেকে জল গড়ায়, তাহলে চায়না টাউনের গালমন্দ করছিস কেন?"

থাক সে সব কথা। এখন জন হেক্টারের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট প্যামেলা জোনসের প্রসঙ্গে আসি। প্যামেলা জোনস বহুদিন ধরে জন হেক্টারের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ বছরই রিটায়ার করার কথা ছিল। সেটা একটু আগেই ঘটে গেল। অফিসটা খুবই ছোটো। বাইরের দিকের ঘরটায় প্যামেলা জোনসের অফিস। ভিতরের ঘরে জন হেক্টার বসতেন। এ মাসের ১৫ তারিখেই অফিসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্যামেলা ওঁর নিজস্ব জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে কার্ডবোর্ডের কয়েকটা বাক্সে ইতিমধ্যেই গুছিয়ে রেখেছেন। জন হেক্টারের জিনিস কে নেবেন, এখনও স্থির হয়নি। উনি অবিবাহিত ছিলেন। কোনও উইলও করে যাননি। দূর সম্পর্কের ভাগ্নে-ভাগ্নি আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। প্যামেলা বোধহয় কয়েকদিন একা একা বসে থাকার পর আমাদের শ্রোতা পেয়ে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলে ফেললেন। ওঁর কথা শেষ হবার পর, একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাডাম, মিস্টার হেক্টার এবার ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন কেন?"

"আপনারা সেটা জানেন না? এ নিয়ে তো পত্রিকাতেও লেখালেখি হয়েছে?" প্যামেলা বেশ অবাক হলেন।

"না, ম্যাডাম।"

"ওর সঙ্গে কিছুদিন আগে এশিয়া ইনস্টিট্যুটের মিস্টার আকাহাশির অনেক তর্কাতর্কি হয়েছিল ইন্ডিয়ার একটা মূর্তির ব্যাপার নিয়ে। মিস্টার আকাহাশি বলেছিলেন ওটা কম্বোডিয়ার, কিন্তু জন জানত ওটা ইন্ডিয়ার। জন তখন আকাহাশির কাছে প্রাভানেন্স চায়।"

"প্রাভানেন্স কী ম্যাডাম?"

"হিস্ট্রি অফ ওনারশিপ। কোত্থেকে মূর্তিটা এসেছে, এটা কার সম্পত্তি ছিল তার প্রমাণ।

আকাহাশি সেটা দেখাতে অস্বীকার করেন, উলটে ওঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন প্রমাণ দেখানোর যে ওটা ইন্ডিয়ার জিনিস। ইন্ডিয়ায় তোলা ওই মূর্তিটার একটা ছবি জনের কাছে ছিল, কিন্তু সেটা দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যায় না, তাই জন আরও প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল।"

"প্রমাণ কি কিছু পেয়েছিলেন ম্যাডাম?"

"জন খুন হবার আগের দিন অফিসের দুয়েকটা কাজ নিয়ে কয়েক মিনিট কথা হয়েছিল। খুব খুশি আর উত্তেজিত মনে হচ্ছিল জনকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওখানকার

কাজ কি রকম চলছে? উত্তরে বলেছিল, চমৎকার। কাজগুলো সব হয়েছে, কিন্তু আরেকটা বড় একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে, যেটা নিয়ে হইচই পড়ে যাবে।”

“কী সেটা ম্যাডাম?”

“সেটা বলেনি। জন মুখে কিছু না বলে একেবারে কাগজে ছাপিয়ে জানায়, এটাই বরাবর দেখেছি।”

“একটা প্রশ্ন কিন্তু রয়ে গেল ম্যাডাম।”

“কী বলুন তো?”

“উনি কাজগুলো বললেন কেন? গিয়েছিলেন তো মূর্তিটা ইন্ডিয়ার প্রমাণ জোগাড় করতে?”

“ও, সেটা তো আপনাদের বলিনি। জন একটা সিন্ডিকেটেড সিরিজ বার করে ‘আফটার দে রিটার্ন’ নামে। যেসব ক্রিমিনাল বহু বছর জেল খাটার পর মুক্তি পেয়েছে, তারা নতুন করে সমাজের স্রোতে কী ভাবে মিশতে পেরেছে বা পারেনি, তার কাহিনি। শুধু এখানকার ক্রিমিনালদের কাহিনি নয়, এর মধ্যেই ক্যানাডা, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, ইজিপ্ট আর ইন্দোনেশিয়ায় কাহিনি ছাপা হয়েছে। এবার ইন্ডিয়াতে যখন যাচ্ছে তখন ইন্ডিয়ার একটা কাহিনি পেলে লিখবে ঠিক করেছিল।”

“তার মানে ম্যাডাম, ইন্ডিয়াতে সে রকম কারোর খোঁজ পেয়েছিলেন?”

“ইয়েস এন্ড নো।”

“বুঝলাম না ম্যাডাম।”

“একজনের খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। অনেক বছর আগেই তিনি মারা গেছেন।”

“মহিলাটির নাম বোধহয় কল্পনা, তাই না ম্যাডাম?”

“দাঁড়ান, আপনি কী করে এটা জানলেন?” প্যামেলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

“জাস্ট এ গেস ম্যাডাম।”

প্যামেলা জোনসের বিস্ময় তাতে কাটলো না। না কাটারই কথা।

জিজ্ঞেস করলেন, “আপনিও কি তাকে চেনেন?”

“মিস্টার হেক্টার কি ওঁকে চিনতেন?”

“না, জন নয়। ক’দিন আগে বার্নার্ডস কলেজের এক রিটায়ার্ড প্রফেসর জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন আমি একটা কাজে ঘরে ঢুকি। তখনই শুনি উনি জনকে বলছেন, কল্পনা নামে ওঁর এক ছাত্রী ছিল। কিন্তু গ্রাজুয়েশনের ঠিক আগেই সে হঠাৎ দেশে ফিরে যায় আর একটা মার্ডারে জড়িয়ে পড়ে। জন বলে, ও এক কল্পনার খবর জানত। কিন্তু সেই কল্পনা যে এখানে পড়াশুনো করতে এসেছিল, সেটা জানত না। এবার গিয়ে কল্পনার খোঁজ করবে, তাকে পেলে তাকে নিয়েই ওর কাহিনি লিখবে।”

“কিন্তু তার দেখা তো পাননি।”

“সেটা ঠিকই, কিন্তু জন ওয়াজ এ গ্রেট ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার।”

কিছু বলার আগেই একেনবাবু আরেকটা প্রশ্ন করলেন, “শেষ আপনার সঙ্গে কবে মিস্টার হেক্টারের কথা হয়?”

“মারা যাবার দিন সকালে খুব অল্পক্ষণের জন্যে। আমাকে বলে পরের দিন লুফথহানসার ফ্লাইট বুক করেছে।”

“ওঁকে কোন ব্যাপারে চিন্তিত বা বিচলিত মনে হয়নি?”

“একেবারেই না।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।”

।। ২৬।।

সোমবার জুন ৬, ২০১১

অশোকের মৃত্যু রহস্য সমাধান নিয়ে একেনবাবু ঠিক কোথায় আছেন জানি না। যেটা জানি, সেটা হল নানান জিনিস নিয়ে কারণে অকারণে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমাকে সকালে বললেন, এশিয়া ইনস্টিটিউটের আকাহাশির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। এই রকম অনুরোধ একেনবাবু প্রায়ই করেন। ফোনে ওঁর কথা নাকি কেউ বুঝতে পারে না। প্রমথ এ ধরণের অনুরোধ রিফিউজ করে। বলে, ‘কী ভেবেছেন আপনি, আমি আপনার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট?’ একেনবাবুর স্ট্যান্ডার্ড উত্তর, ‘কী যে বলেন স্যার, আমার যা ইংরেজি, তার ওপর এই তো অ্যাকসেন্ট।’ আমি অবশ্য ওঁর অনুরোধ না রেখে পারি না। ওঁর এই সমস্যাটা প্রমথরও অজানা নয়, ফোনে অচেনা বিদেশীদের কিছু বোঝাতে উনি যা স্ট্রাগ্ল করেন, তাতে খারাপই লাগে! যেটা ভেবে পেলাম না, সেটা হল আকাহাশির সঙ্গে ওঁর হঠাৎ কী দরকার পড়ল? সেটা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, “চলুন না স্যার, সব সময়েই কারণ থাকতে হবে নাকি?”

অর্থাৎ, উত্তর দেবেন না। কারণ ছাড়া উনি কিছু করেন বলে আমার মনে হয় না। মুশকিল হল আকাহাশিকে সন্ধে ছ’টার আগে পাওয়া গেল না। ওঁর সেক্রেটারি প্রথমে প্রায় ভাগিয়েই দিচ্ছিল। শেষে আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বলায় কিছুটা কাজ হল।

অশোক দুবের মৃত্যু নিয়ে আমার নিজের কাজ প্রায় মাথায় উঠেছিল। অনেক কষ্ট করে পেপারটা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। যেটুকু বাকি ছিল, সেগুলো বিকেলের মধ্যেই শেষ করলাম। সন্ধে ছ’টা নাগাদ আমরা তিনজনই হাজির হলাম আকাহাশির অফিসে।

আকাহাশি বোধহয় ভেবেছিলেন আমি একা আসছি, কারণ ওঁর সেক্রেটারিকে আসার কারণ (যা তখন নিজেই জানতাম না) বা ক’জন আসছি কিছুই জানাইনি। এখানে আসার পথে একেনবাবুর কাছে একটু হিন্ট পেলাম কী উনি জানতে চান।

তিনজনকে দেখে আকাহাশি একটু অবাক হলেন।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে প্রমথ আর একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

“কী ব্যাপার বলুন তো?” আকাহাশি প্রশ্ন করলেন।

কথোপকথন আমিই শুরু করলাম। “মিস্টার জন হেক্টার মারা গেছেন, আপনি কি খবরটা জানেন?”

“হ্যাঁ।”

“উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন আপনাদের এক্সিবিশনে যে বিষ্ণুমূর্তিটা ছিল □ সে

সম্পর্কে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে।"

"এটা কিন্তু আমি জানতাম না।" প্রসঙ্গটাতে আকাহাশি একটু অসোয়াস্তি বোধ করছেন বুঝতে পারলাম।

"এ ব্যাপারে আপনার মতামত পত্রিকায় পড়েছি। আপনার মতে ওটা কম্বোডিয়ার, তাই তো?"

"মূর্তিটা যেখান থেকে এসেছে... তাদের যা দাবি, সেটাই আমি বলেছি।" আকাহাশি একটু সতর্ক হয়ে উত্তর দিলেন।

"তার মানে স্যার, আপনি নিজে শিওর নন।" এবার একেনবাবু মুখ খুললেন।

"যিনি আমাদের এক্সিবিট হিসেবে ওটা দিয়েছেন, তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখিনি।"

"তিনি তো স্যার, বিপাশা মিত্র।"

"হ্যাঁ।"

"মূর্তিটা এখন কোথায়?"

"ধরে নিচ্ছি, ওঁর কাছেই আছে।"

"তাই নাকি? কিন্তু ওঁর প্রাইভেট মিউজিয়ামের কিউরেটর কিন্তু জানেন না সেটা কোথায়।"

আকাহাশি এবার একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "আপনার কি মনে হয় উত্তরটা আমি জানব?"

"আপনার এখান থেকেই তো প্যাক করে মূর্তিটা ম্যাডামের কাছে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ম্যাডামের কাছে পৌঁছোয়নি।"

"মিস মিত্র কি আপনাকে সেটা খুঁজে বার করার দায়িত্ব দিয়েছেন?"

"না স্যার।"

"তাহলে এ নিয়ে আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"না স্যার, মাথা ঘামাচ্ছি না। শুধু ভাবছিলাম বিপাশা মিত্র আপনাদের একজন বড় পেট্রন, তাই না স্যার?"

"হ্যাঁ, এটা পাবলিক নলেজ। শুধু উনি নন, ওঁর বাবাও এই প্রতিষ্ঠানকে বহু অর্থ দান করেছেন।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

"কী ইন্টারেস্টিং?" আকাহাশি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"না, না, স্যার, ওঁদের অর্থদানের কথা ভাবছি না। ভাবছি মূর্তিটা না পাওয়া গেলে তো তার অথেন্সিটি নিয়ে তর্কাতর্কির অর্থ হয় না।"

আকাহাশি চুপ। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করলেন, একেনবাবু কোনদিকে এগোচ্ছেন।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার" আকাহাশিকে একটু হতভম্ব করেই একেনবাবু উঠে পড়লেন।

আমি আকাহাশিকে ধন্যবাদ জানালাম আমাদের সময় দেওয়ার জন্যে। উনিও সৌজন্য দেখিয়ে কিছু একটা বললেন। সেটা শোনার আগেই একেনবাবু দরজার বাইরে চলে গেছেন।

আকাহাশির অফিস থেকে বেরিয়েই প্রমথ একেনবাবুকে চেপে ধরল, "আপনার মাথায় কী ঘুরছে বলুন তো? এতদিন তো অশোকের খুন নিয়ে মেতেছিলেন, সেইসঙ্গে বিপাশার ছবি

বা স্ট্যাম্প যাই বলুন, সেই নিয়ে। এখন বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে পড়লেন কেন? বিপাশা তো বলেইছে ওটা চুরি হয়নি!”

“রাইট স্যার।”

“রাইট যদি হয়, তাহলে ওই নিয়ে আকাহাশিকে খোঁচা দেওয়া কেন?”

“ঠিকই বলেছেন স্যার, আসলে আমার এই নীলাটাই গন্ডগোল করছে। মাঝেমাঝেই অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসে, নিজেরই গুলিয়ে যায়।”

“দয়া করে আর নীলার দোহাই দেবেন না, সোজাসুজি বলুন মাথায় কী ঘুরছে জানাবেন না। এদিকে তো আবার বলে বেড়ান আমরা আপনার অ্যাসোসিয়েট!”

“আপনি না স্যার, সত্যি! আমি কি ইচ্ছে করে কিছু লুকিয়ে রাখি? আমি নিজেই কনফিউসড। ভাবছিলাম, বিষ্ণুমূর্তিটা লুকোনো হল কেন? নিশ্চয় জন হেক্টারের ভয়ে।”

“সেটা এখন অবভিয়াস,” আমি বললাম। “জন হেক্টার যদি পত্রপত্রিকায় একটা অকাট্য প্রমাণ দাখিল করতেন, তাহলে আকাহাশি আর বিপাশা দুজনের পক্ষেই সেটা এমব্যারাসিং হত।”

“ঠিক স্যার, এখন আর সে সমস্যা রইল না।”

“আপনি কি বলতে চান, তার জন্যেই জন হেক্টারকে খুন করা হল? দ্যাট্স ননসেন্স!”

“রাইট স্যার, তাই আমি কনফিউসড।”

“হয়তো এই দুটো জিনিস কানেক্টেড নয়। হেক্টারকে খুন করা হয়েছে ওঁর ক্যামেরা, ল্যাপটপ এইসবের লোভে।”

“রাইট স্যার।”

“আপনি তো দেখছি আজ ‘রাইট’ বলার মুডে আছেন!”

“কী আর বলব স্যার, আপনারা ‘রং’-তো কিছু বলছেন না।”

সাতটা প্রায় বাজে। একেনবাবু বললেন, “স্যার আপনার গাড়ি চড়ে একটু হোবোকেন যেতে পারি?”

“এখন? কোথায়?”

“যেখানে অশোকবাবুর ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল।”

“আবার ওখানে কী দেখবেন? পৌঁছতে পৌঁছতে তো রাত্রি হয়ে যাবে?”

সত্যি বলতে কি, এই রাতে ওখানে যেতে আমার এতটুকু ইচ্ছে করছিল না।

“একটা জিনিস স্যার আজ জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে, কী করে ডেথের টাইমটা হোবোকেন পুলিশ বার করেছে।”

“কী জানলেন?”

“রাস্তায় ঢোকার মুখটা আটটা পর্যন্ত ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করা ছিল একটা গ্যাসলিকের জন্যে। আটটার পর খোলা হয়। পুলিশ বডিটা পায় রাত দশটা নাগাদ। রাস্তাটা ওয়ানওয়ে সেটা তো সেদিনই দেখলাম। তাই এটা লজিক্যাল স্যার যে খুনি গাড়ি নিয়ে আটটার পর ওই রাস্তায় ঢুকেছিল। খুন করে বডিটা ফেলে চলে যায়।”

“আপনি গিয়ে ওখানে কি দেখতে চান?”

“সেটা কি আগে থেকেই জানি স্যার? চলুন না, এক্ষুনি বাড়ি ফিরে কী হবে? ওখান থেকে ফেরার পথে কোথাও ডিনার খেয়ে নেব।”

“আপনি খাওয়াবেন?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“দেখছেন স্যার, কোথাও খাওয়ার কথা উঠলেই প্রমথবাবু আমাকে কি রকম চাপ

দেন?"

"তার কারণ আপনি এই কাজে টাকা পিটছেন, আর আমরা ঘুরে মরছি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, খাওয়াব।"

যে গ্যারাজে আমার গাড়ি থাকে সেটা আকাহাশির অফিস থেকে অনেকটা দূরে। গ্যারাজে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় পৌনে আটটা। বহু লোক দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির জন্যে। একজন মাত্র অ্যাটেন্ডেন্ট। সে একটা একটা করে গাড়ি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বার করে আনছে। প্রায় পনেরো মিনিট লেগে গেল গাড়ি পেতে। যখন গাড়িতে উঠছি, তখন যাকে দেখলাম, তাকে এক্সপেক্ট করিনি। এক ঝলকের জন্যে, কিন্তু চিনতে অসুবিধা হল না এড গুয়াঙ্গিয়াল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি ওর দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়ি নিয়ে বেরোলাম। বেরোতেই প্রমথ ঘোষণা করল, "আগে খাব, তারপর যাব।"

বললাম, "একটু আগে বলতে পারলি না, এখন কোথায় পার্ক করব!"

"পার্কিং না পেলে, আবার গ্যারাজে ঢুকিয়ে দে।"

ভাগ্যক্রমে রাস্তাতেই একটা কার্বসাইড পার্কিং পেয়ে গেলাম। সেখানে গাড়ি রেখে সামনেই দেখি একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। একেনবাবু মেনু দেখে খুব সন্তুষ্ট। বললেন, "চাইনিজরা খুব রিজনেবল স্যার।"

"ক'দিন আগেই তো মুণ্ডুপাত করছিলেন, চ্যাং লি লনড্রি আপনার কোটের বোতাম ছিঁড়ে দিয়েছিল বলে?"

"তা করেছিলাম স্যার। আসলে আমরা দোষে-গুণে মানুষ।"

খেয়েদেয়ে যখন বেরোলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আজকে গাড়ি নিয়ে বেরোব ঠিক ছিল না, জিপিএস-টা বাড়িতে ফেলে এসেছি। সুতরাং কোনো গাইডেন্স সিস্টেম নেই। হোবোকেনে পৌঁছে রাস্তাটা খুঁজে বার করতে গিয়ে পথ হারালাম কয়েকবার। তখনই মনে হল একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকেই যাই, ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। "সামথিং ইজ নট রাইট," আমি একেনবাবু আর প্রমথকে বললাম। "আমাদের কেউ ফলো করছে!"

"কী বলছিস যা-তা!" প্রমথ একটা ধমক লাগাল।

"আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আমি বুঝব না! একই হেডলাইট দেখতে পাচ্ছি।"

"কে ফলো করবে?" প্রমথ মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

"গ্যারাজ থেকে যখন গাড়ি বার করছিলাম, এড গুয়াঙ্গিয়ালকে দেখেছিলাম।"

"তাতে হয়েছেটা কী?" প্রমথ অনেক সময় বেশি সাহসী ভাব দেখায়। এর উত্তর দেওয়া নিস্প্রয়োজন।

"গাড়িটা স্যার রাস্তার ধারে দাঁড় করান না, তাহলে বুঝবেন সত্যি সত্যি ফলো করছে কিনা।"

"ক্ষেপেছেন, লোকটা নির্ঘাত এড বা ওর গুণ্ডা দলের কেউ। আমি আর হোবোকেনে ঘুরছি না সোজা লিঙ্কন টানেল ধরে ম্যানহাটানে যাচ্ছি।" কথাটা বললাম ঠিকই, কিন্তু টেনশনে আমি এখন কোথায় আছি নিজেই জানি না। একবার ডানদিকে ঢুকছি, একবার বাঁদিকে ঢুকছি। রাস্তাগুলো সরু সরু, গোটা অঞ্চলটাই নির্জন দোকানপাট কিচ্ছু নেই। পেছনের গাড়িটা চুম্বকের মতো লেগে আছে। গাড়ি আস্তে করলে, আস্তে করছে, জোরে

চালালে দ্রুত পিছু নিচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেও আশেপাশে যেটুকু নজরে আসছে, তাতে বুঝতে পারছি একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি। কিন্তু মাথা স্থির করে গোলোকধাঁধা থেকে বেরোতে পারছি না। হঠাৎ একটা বড় রাস্তার জাংশন দেখেই দ্রুত গতিতে গাড়ি ঘোরালাম। সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের গাড়ির উপরে লাল-বাতি চক্কর খেতে শুরু করল। পুলিশের গাড়ি!

গাড়ি দাঁড় করাতেই, একটা দশাসই চেহারার লোক গাড়ি থেকে নেমে এসে মুখে টর্চ ফেলল। তারপর জানলার কাচে টোকা দিয়ে কাচটা নামাতে বলল। চোখের ওপর তখনো টর্চ, একটা গম্ভীর গলা কানে এল, "লাইসেন্স এন্ড রেজিস্ট্রেশন।"

উচ্চবাচ্য না করে দিলাম। সেটা নিয়ে হাতে ধরা কম্পিউটারে কী সব পাঞ্চ করে পুলিশটা বলল, "কোথায় যাচ্ছিলে?"

দেখলাম এখানে সত্যি কথা বললে বিপদ। "ভুল করে এখানে ঢুকে পড়েছি, লিঙ্কন টানেল খুঁজছিলাম।"

"তুমি স্টপ সাইনে থামনি।" বলে খসখস করে একটা ট্র্যাফিক টিকিট লিখল। তারপর আরও বার কয়েক টর্চ দিয়ে প্রমথ আর একেনবাবুকে দেখল। ভাগ্যিস আমরা মদ্যপান করিনি, তাহলে আরও ফ্যাচাং হত। টিকিটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল। "এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাও, টানেলের সাইন পাবে।"

জীবনে এই প্রথম ট্র্যাফিক টিকিট পেয়ে তেমন খারাপ লাগল না, ভাগ্যিস আমাদের ফলো করছিল পুলিশ, এড বা ডট বাস্টার টাইপের কোনো গ্যাং নয়! এই অচেনা জায়গায় ওদের পাল্লায় পড়লে কী হত ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

পুলিশ চলে যেতেই গাড়ি স্টার্ট করলাম। ঠিক এমন সময় একেনবাবুর নতুন মোবাইল বেজে উঠল।

"হ্যালো... হ্যাঁ স্যার।" অন্যপক্ষের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে একেনবাবুর মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম তিনি যথেষ্ট অবাক। শেষে বললেন, "বলেন কি? মিস্টার এডের লকারে পাওয়া গেছে? কংগ্রাচুলেশনস স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং ডেভালপমেন্ট... থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

"কী ব্যাপার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এড গুয়াঙ্গিয়ালকে গতরাত্রে পুলিস ধরেছে একটা ইললিগ্যাল গ্যাম্বলিং জয়েন্ট থেকে। আজ সকালে ওঁর লকার থেকে পুলিশ একটা সিন্ধ ডাক স্ট্যাম্প পেয়েছে। এড অবশ্য বলছেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। দোষীরা যেটা সবসময়েই বলে থাকে।"

প্রমথ আমাকে বলল, "তুই একটা স্টুপিড, একটু আগে কী করে এডকে দেখলি, আর সেই ভয়ে উলটোপালটা গাড়ি চালালি?"

কী আর বলব, একটু আগে ফোনটা এলে এই টেনশনটা হত না, টিকিটও হয়তো পেতাম না।

"যাক, অশোকের মৃত্যুর সমস্যাটা মনে হচ্ছে মিটে গেল," প্রমথ বলল। "এবার এডকে চাপ দিয়ে বার করুন ফটোটা সে কোথায় ফেলেছে? তারপর সেটা নিয়ে বিপাশার কাছে বুক ফুলিয়ে কিছু টাকা দাবি করুন। একেই বলে ঝড়ে বক পড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে।"

একেনবাবু চুপ।

।। ২৭।।

মঙ্গলবার জুন ৭, ২০১১

বেশ কয়েকদিন বেভকে অফিসে দেখিনি। বোধহয় ছুটি নিয়েছে। একটু অবশ্য অবাক লাগছিল। গত সোমবার কিশোরের বাড়িতে যখন ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম, ছুটি নেবার কথা বলেনি। চিন্তা হচ্ছিল শরীর-টরির ঠিক আছে কি না, যেরকম ভাইরাল ফিভার হচ্ছে চারিদিকে! আজ দেখলাম এসেছে। আমায় 'হ্যালো' বলল ঠিকই, কিন্তু ওইটুকুই। মুখের সেই হাসিটা নেই। বেভ হচ্ছে সেই দলে, যাদের মনের ভিতরে কী চলছে তা পরিষ্কার মুখে ফুটে ওঠে। আজ যে ওর মন বিক্ষিপ্ত, সেটা বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে যে জিজ্ঞেস করব, সে সময়টা এই মুহূর্তে নেই। সকাল থেকে নানা জায়গায় ছুটোছুটি করে যখন আবার অফিসে ঢুকলাম তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। আজ আর কোনও মিটিং নেই, বাঁচা গেছে!

বেশ কিছুদিন হল আমি আর প্রমথ একটা এইচডি অর্থাৎ হাই ডেফিনেশন টিভি কেনার কথা ভাবছি। কিন্তু অনেক গবেষণা করেও কী কেনা হবে স্থির করে উঠতে পারিনি। একেনবাবুর এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। তার মানে ওঁর কাছ থেকে কোনও কন্ট্রিবিউশন আশা করা যাবে না। ইদানীং প্রমথও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। তার কারণটা বুঝতে পারি। ও আর ফ্র্যান্সিস্কা নিশ্চয় শিগগিরি বিয়ে করার কথা ভাবছে, সেক্ষেত্রে শেয়ারে এখন টিভি কেনা অর্থহীন। প্রমথ বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ভাবতে খুবই খারাপ লাগে। একসঙ্গে আমরা বহু বছর কাটিয়েছি। আমাদের বাড়ির যা কিছু জিনিসপত্র, সবই ভাগাভাগি করে কেনা। তাই আমি চাই এ বাড়ি থেকে ও কিছু জিনিস নিয়ে যাক ওদের নতুন বাড়িতে। প্রমথকে এ ব্যাপারে একটা হিন্টও দিয়েছি। ওর উত্তর, 'চুপ কর শালা, বেশি বদান্যতা দেখাতে হবে না।' বুঝতে পারি, আমাকে ছেড়ে যেতে হবে, এর জন্য গিল্ট ফিলিং-এ ভুগছে। একদিন হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁরে, বেভ মেয়েটাকে তো বেশ ভালোই দেখতে, তোকে পছন্দও করে। কিশোরকে ফুটিয়ে তুই ওকে বিয়ে কর।' আমি বলেছিলাম, 'আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই নিজে আগে বিয়েটা কর। কিন্তু একটু অ্যাডভান্সড নোটিস দিস। রিসেপশনের পার্টি তো সেই আমাকেই অর্গানাইজ করতে হবে।'

এই দেখুন, এইচডি টিভি-র কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম। ঠিকমত গুছিয়ে লেখা আমার ধাতে নেই। যেটা বলছিলাম, প্রমথর ভরসাতে আর না থেকে আমি ঠিক করেছি, নিজেই এইচডি টিভি কিনবো। দোকান থেকে না কিনে মেল অর্ডার দিয়ে কিনলে কিছুটা সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু টিভি যদি কাজ না করে, তাহলে কী করব? ফেরত পাঠানোও তো একটা ঝামেলা। এসব ব্যাপারে আমার অগতির গতি হল জনি চু। চায়না টাউনে ওর চেনাজানা কয়েকটা অ্যাপ্লায়েন্সের দোকান আছে, সেখান থেকে ভালো ডিসকাউন্ট জোগাড় করে দিতে পারবে, সে গ্যারান্টি আমায় দিয়েছে। প্ল্যান ছিল জনিকে পাকড়াও করে আজ লাঞ্চ টাইমে চায়না টাউনে যাব। মোটামুটি একটা আইডিয়া করতে পারব, ৩৭ থেকে ৪০ ইঞ্চি সাইজের টিভি কিনতে কত লাগবে। জনির একটাই ডিমান্ড ওকে চায়না টাউনে লাঞ্চ খাওয়াতে হবে। চাইনিজ খেতে নিজেই ভালোবাসি, আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। জনিকে যখন ফোন করতে যাচ্ছি, বেভ ঘরে ঢুকল।

“আর ইউ বিজি?” প্রশ্নটা করল ঠিকই, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

ওর বিষণ্ণ মুখটা দেখে খারাপ লাগল।

“কী হয়েছে বেভ, সামথিং রং?”

“আই থিঙ্ক আই অ্যাম গোইং টু ব্রেক-আপ উইথ কিশোর।”

এই বম্ব শেলটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

“সেকি?”

বেভের চোখটা দেখলাম ছলছল করছে। বলল, “হি হ্যাজ এ স্টাক-আপ ফ্যামিলি।”

বেভের এই কনক্লুশনের কারণ যে কিশোরের কাকা, সেটা বুঝতে আইনস্টাইন হবার প্রয়োজন নেই। বললাম, “তুমি কিশোরকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, ওর আঙ্কলকে নয়।”

“ইউ ডোন্ট নো দ্য হোল স্টোরি।” বেভ প্রায় আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল।

আমি হিসেব করে দেখলাম ওর স্টোরি শুনতে গেলে আজ চায়না টাউন যাওয়া হবে না। কিশোরের উপর রাগও হল। র‍্যাস্কেলটা নিজে তো আমার সময় নষ্ট করছেই, আবার ওর গার্লফ্রেন্ডকে দিয়েও সময় নষ্ট করাচ্ছে! করছিস তো প্রেম, এত ভুল বোঝাবুঝির কী দরকার?”

বেভকে বললাম, “আমায় এখন চায়না টাউন যেতে হবে। ফিরে এসে যদি শুনি?”

“চায়না টাউনে কেন যাচ্ছ?”

বেভকে আমার কেনাকাটার ব্যাপারে কিছু বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সোজসাপটা প্রশ্নের উত্তর না দিলেও চলে না। বললাম, “একটা টিভি খুঁজতে যাচ্ছি।”

“তার জন্যে চায়না টাউন কেন যাবে? জ্যাক তোমায় অনেক বেটার ডিল দেবে।”

“জ্যাক?”

“আমার আঙ্কল।”

“আবার এক আঙ্কলকে জড়াচ্ছ!” ফস করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

“হি ইজ এ ডাউন-টু-আর্থ ম্যান, ইউ উইল সি। আর আমি তোমার সঙ্গে গেলে যে ডিল পাবে, কোথাও ম্যাচ করাতে পারবে না।”

এই অকাট্য যুক্তি খারিজ করে চায়না টাউন যাওয়া যায় না। তাও ইতস্তত করছি দেখে, বেভ বলল, “আনলেস ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো আউট উইথ মি।”

এরপর ওর সঙ্গে না যাওয়াটা অসম্ভব।

“আমি আসছি,” বলে বেভ বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে বলল। “হেলেন আমাকে কভার করবে বলেছে, এখনি চল, লাঞ্চ টাইম হয়ে গেলে আঙ্কল জ্যাক দোকানে থাকবে না।”

বেভের আঙ্কল জ্যাকের দোকানটা দূরে নয়। দোকানের নামটা শুনেই চিনতে পারলাম। অনেকবারই দেখেছি, বেশ বড় সাইজের দোকান। ওটা যে বেভের আঙ্কলের সেটা জানতাম না। যেতে যেতে বেভ বলল, “আমি জানি না কিশোরের আঙ্কল কিশোরকে কী বলেছে, বাট হি ইজ বিহেভিং স্ট্রেঞ্জলি।”

“কী স্ট্রেঞ্জলি?”

উত্তরটা দীর্ঘ, সংক্ষেপ না করেই লিখছি

যেদিন আমরা কিশোরের বাড়িতে ডিনার খেয়েছিলাম, তার পরের দিন কিশোর বেভকে ফোন করে বলে, ও ওর আঙ্কলকে বুঝিয়েছে, বেভ বাবার প্রফেশন নিয়ে মজা

করছিল। বেভের বাবা একজন বিজনেসম্যান। তারপর বেভকে বলে, বেভ যেন সেই পরিচয়ই ওর বাড়ির সবাইকে দেয়।

'কেন তোমাদের ফ্যামিলিতে কি ব্লু-কলার ওয়ার্কারদের নিয়ে সমস্যা আছে?' বেভ ক্ষুব্ধ হয়েই প্রশ্নটা করে।

কিশোর উত্তরটা এড়িয়ে যায়। 'তোমাকে তো আমি মিথ্যে কথা বলতে বলছি না। তোমার বাবা তো বিজনেসম্যানই, প্লাম্বিং-তো বিজনেসই।'

বেভ তখন রেগে গিয়ে বলে, 'না, আমার বাবা প্লাম্বার ফার্স্ট, বিজনেসম্যান সেকেন্ড।'

'এই সামান্য একটা অনুরোধ তুমি রাখতে পারবে না? আমি তো তোমায় মিথ্যে কথা বলতে বলছি না!'

'এটা সামান্য অনুরোধ নয়, তুমি আমার বাবার পরিচয় লুকোতে বলছ। আই অ্যাম প্রাউড অফ হিম।'

কিশোর নাকি তখন বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরে তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। তবে মনে রেখো ডিস্ক্রিশন ইজ বেটার পার্ট অফ ভ্যালার'।

এটা শুনে বেভ এত রেগে যায়, ফোন নামিয়ে রাখে। কিশোর বেশ কয়েকবার ফোন করে, কিন্তু বেভ উত্তর দেয়নি।

মনে মনে ভাবলাম, কিশোরটা একটা ইডিয়ট।

এসব শোনার পর আমার ঠিক কী বলা উচিত মাথায় খেলল না। বেভের মাথা একটু ঠাণ্ডা না হলে যাই বলি না কেন লাভ নেই। 'সো সরি টু হিয়ার দিস। থিংস উইল ওয়ার্ক আউট'... এসব বললাম ঠিকই। কিছু তো একটা বলতে হবে। লাকিলি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেভের আঙ্কলের দোকানের সামনে পৌঁছে গেলাম।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু দোকানটা বিশাল। দু'তলা জুড়ে ডিসপ্লে। অজস্র টেলিভিশন পর পর সাজানো। এক পাশে হোম থিয়েটার সেখানে থ্রি-ডি-র নানান সরঞ্জাম। আরেকদিকে তাকের ওপর সারি সারি ব্লু-রে ডিভিডি সেট। দোতালায় রয়েছে ডিজিট্যাল ক্যামেরা, ও অন্যান্য নানান ইলেকট্রনিক্সের সম্ভার। বেভের আঙ্কল জ্যাক দোকানে ছিলেন। শুভ্রকেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক। বয়স বোধহয় সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু স্বাস্থ্য এখনো অটুট। বেভকে দেখে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বেভকে বললেন, "এই নিশ্চয় তোমার সেই বন্ধু, রাইট?"

"না জ্যাক, এ আমার আরেক বন্ধু। ভেরি ডিয়ার ফ্রেন্ড, বাপি। ও একটা টেলিভিশন সেট কিনবে। তোমাকে কিন্তু ওকে ভীষণ ভালো ডিল দিতে হবে, আমি ওকে কথা দিয়ে নিয়ে এসেছি।"

"তুমি কথা দিলে, কী করে সেটা ফেলব? কী ধরণের সেট তুমি খুঁজছো ইয়ং ম্যান?"

আমি কী চাই বললাম। উনি ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েকটা সেট দেখালেন। আমি মেল-অর্ডারে কি রকম দাম হয় সেটা জানি। টিভির প্রাইসের সঙ্গে যে ডিসকাউন্ট প্রাইস ঝুলছে, সেটা কিন্তু মেল-অর্ডারের থেকে অনেকটাই বেশি। আমি দরাদরি করতে পারি না। তাই ভাবছিলাম কী করে বেভের আঙ্কল জ্যাককে এড়ানো যায়। জ্যাক বোধহয় আমার মনের ভাবটা বুঝলেন। বললেন, "ডিসকাউন্ট প্রাইসের দিকে তাকিয়ো না, আমার ফেভারিট ভাগ্নির বন্ধুর জন্য দাম অনেক কম হবে। ধর, এটা কিনতে চাইলে, তোমায় ৫৯০ দিতে হবে না, ৫২৫ দিলেই চলবে। এই দাম তুমি মেল-অর্ডারে পাবে না।"

উনি ঠিকই বলেছেন, এই মডেলের দাম আমি দেখেছি ৫৫০ থেকে ৫৭০-এ বিক্রি

হচ্ছে। আমি ঝট করে ডিসিশন নিয়ে ফেললাম। “এটাই আমি কিনব।”

জ্যাক চোখ টিপে বেভকে বললেন, “এরকম বেশি বন্ধুকে আর এনো না, আমি দেউলিয়া হয়ে যাব।”

উত্তরে বেভ জ্যাককে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল।

আমি যখন চেক-আউট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ক্রেডিট কার্ড দিচ্ছি, তখন শুনি জ্যাক বেভকে বলছেন, “এবার তুমি বাড়িটার পজেশন নাও। আমি বুড়ো হচ্ছি, চিরদিন তো থাকব না।”

বেভ কিছু উত্তর দিলো না।

“আমি জানি তুমি কি ভাবছ, কিন্তু তোমার মা নিশ্চয় চাইতেন তাঁর প্রাপ্যটা তুমি নেবে। তাঁর কথাটা একটু ভেবো।” বলে জ্যাক বেভকে আবার জড়িয়ে ধরলেন।

আমার ক্রেডিট কার্ড স্লিপে সই করা হয়ে গেছে। দোকান থেকেই টিভিটা বাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে দেবে। তার টাইম ইত্যাদি ঠিক করে যখন মুখ ঘুরিয়েছি দেখি বেভ অদৃশ্য। গেল কোথায়? দেখি জ্যাকও নেই।

খানিক বাদেই বেভ পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। “সরি, কেভিনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল। জানতাম না ও এখানে মাস দেড়েক ধরে কাজ করছে। খুব খুশি, এখানে মাইনেপত্র ভালো, সেলস কমিশন আছে। আই অ্যাম সো হ্যাপি ফর হিম।”

“কেভিন?”

“যে ফিলাটেলিস্ট কর্নারে কাজ করত। বললাম না তার কথা সেদিন?”

জ্যাকও আরেকটা ঘর থেকে উদয় হল। জ্যাককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে বেভকে বললাম, “তুমি ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছিলে, তোমার আঙ্কল বলেই এরকম ডিল দিলেন। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।”

“ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। জ্যাকের মতো আঙ্কল হয় না, আমায় খুব ভালোবাসে। শুধু ওর নিজের মেয়েই ওকে বুঝল না।”

“কেন, কী হয়েছে?”

“শার্লি প্রায় আমার বয়সি। হাইস্কুল শেষ করতে না করতেই বাড়ি ছেড়ে ওর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। অত্যন্ত বাজে একটা ছেলে। ক’দিন বাদেই শার্লিকে ডাম্প করে পালায়। কিন্তু প্রেগনেন্ট করার আগে নয়। শার্লি বাড়ি না ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়।”

“ওর সেই বয়ফ্রেন্ড? সে কোথায়?”

“ছিল একটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট, এখন বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। শার্লিও হয়তো নেই।”

“তোমার আঙ্কলের আর কোনও ছেলেমেয়ে আছে?”

“না। হি ইজ অ্যালোন নাউ। কয়েক বছর আগে স্ত্রীও মারা গেছে।”

“ওঁর স্ত্রী কি তোমার বাবার বোন?”

“আন্ট মিশেল হল বাবার বোন। আঙ্কল জ্যাক আমার মায়ের ভাই।”

চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি বেভকে জিজ্ঞেস করলাম, “লাঞ্চ খাবে?”

“কোথায়?”

“তুমি যেখানে চাও।”

"তাহলে এসো, এখানে ঢুকি।"

সামনেই একটা থাই রেস্টুরেন্ট ছিল, সেখানে ঢুকলাম। ভেতরটা লোকে গিজগিজ করছে। লাকিলি রেস্টুরেন্টের সামনে ক্যানোপির নীচে কয়েকটা টেবিল সাজানো ছিল। তার একটাতে জায়গা পেয়ে গেলাম।

খাবার অর্ডার করার পর বেভ হঠাৎ বলল, "তুমি তো আমায় জিজ্ঞেস করলে না, জ্যাক কী পজেশন নেবার কথা আমায় বলছিল?"

প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা পার্সোনাল মনে হওয়ায় প্রসঙ্গটা তুলিনি।

"ব্যাপারটা নিশ্চয় ব্যক্তিগত, তাই জিজ্ঞেস করিনি।"

"ইট ইজ নাথিং টু ডু উইথ মাই সেক্স লাইফ, ইউ ক্যান অ্যাস্ক।" বলে এক ঝলক হাসল বেভ।

আজ সকাল থেকে যে বিষণ্ণ ভাবটা ওর ছিল, সেটা বোধহয় কেটে যাচ্ছে।

বললাম, "বেশ তাহলে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপারটা কী?"

"বলতে পারি, কিন্তু লম্বা গল্প, তোমার শুনতে ইচ্ছে না করলে আমাকে থামিয়ে দিও।"

"বেশ, তাই দেব।"

"আমার দাদু ভীষণ বড়লোক ছিলেন। আঙ্কল জ্যাক আর মা ছাড়া ওর আর কোনও ছেলেপুলে ছিল না। মা হাইস্কুলে থাকতে থাকতেই বাবার প্রেমে পড়ে। কলেজে শেষ করার আগেই বাবাকে বিয়ে করে। বাবা খুব সুপুরুষ ছিল, কিন্তু গরিব ফ্যামিলির ছেলে। দাদুর এ বিয়েতে সম্মতি ছিল না। আমার জন্মের খুব অল্প দিনের মধ্যেই মা মারা যায়। দাদুর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওই ফ্যামিলিতে একমাত্র আঙ্কল জ্যাকের সঙ্গেই ছিল। আঙ্কল জ্যাক আমার বাবাকে ভালোবাসত। দাদু মারা যাবার আগে আমায় দেখতে চেয়েছিল। তখন আমার বয়েস বারো। জ্যাকই আমায় জোর করে নিয়ে যায়। হ্যাম্পটন বিচের ওপর একটা হিউজ ম্যানশন। সেখানে ঢুকে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, কী ভীষণ বড়লোক এই দাদু। বিছানায় শুয়েছিল, পাশে একজন নার্স। আমাকে দেখে বুড়ো লোকটা হাত ধরে কাঁদতে শুরু করল। ফ্র্যাঙ্কলি, আই হ্যাড নো ফিলিংস ফর হিম। এর ক'দিন বাদেই শুনি দাদু মারা গেছে। উইলে আমার জন্যে একটা ট্রাস্ট রেখে গিয়েছে। তাতে অনেক টাকা আর গ্রিনিচে মা যেখানে বড় হয়েছে সেই বাড়িটা। জ্যাক হচ্ছে সেটার ট্রাস্টি। জ্যাক চায়, আমি ওটা নিই, বাট আই অ্যাম নট গোইং টু।"

"কেন?" আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

বাবা যতদিন বেঁচেছিল দাদু বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা চেয়েছিল, আমার সঙ্গে যেন দাদু-দিদিমার যোগাযোগ থাকে, কিন্তু বুড়ো বারবার অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওর ধারণা বাবা টাকার লোভে সেটা চেয়েছিল। আমি বাবাকে জানি, হি নেভার কেয়ার্ড ফর মানি। মাকে ভালোবেসেছিল বলেই বিয়ে করেছিল। আই উইল নেভার টাচ দ্যাট ওল্ড ম্যান'স মানি অ্যাস লং অ্যাস আই লিভ।"

"কিশোর এটা জানে?" কেন এই প্রশ্নটা করলাম নিজেই জানি না।

"না, একমাত্র তোমাকেই বললাম। আজ শুধু তুমি আর আমি। প্লিজ ডোন্ট ব্রিং কিশোর হিয়ার, আই অ্যাম সো সিক অ্যাবাউট হিস অ্যাটিচুড।"

খাবার এসে গেছে। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, বেভ

সম্পর্কে আমার ধারণা কী দ্রুত পালটে যাচ্ছে!

"কী ভাবছ?" বেভের প্রশ্নে সম্বিত ফিরল।

"কিছু না।"

বেভ হাত দিয়ে নিজের কপাল থেকে চুলটা একটু সরিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "ডু ইউ ফাইন্ড মি অ্যাট্রাক্টিভ?"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"ওটা তো আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।"

"তুমি কি উত্তরটা জান না?"

"নো, আই অ্যাম স্টিল ওয়েটিং ফর দ্য অ্যানসার।"

বেভের দিকে তাকিয়ে আছি। এলোমেলো বাতাসে ওর চুলগুলো উড়ে উড়ে কপালে এসে পড়ছে। ঠোঁটে আবছা লিপস্টিক। ক্যানোপির ফাঁক দিয়ে এক ফালি সূর্যের আলো টেবিলের উপর পড়েছে। তার রিফ্লেকশনে বেভের গলার হারের লকেটটা চিকমিক করছে। লকেটের ঠিক নীচেই, ওর সাদা নরম বুকের খাঁজের ভেতর গাঢ় লাল রঙের ছোট্ট একটা তিল। আগে খেয়াল করিনি। কালো ব্লাউজের বর্ডারে ওটা যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার চোখে কী দেখল বেভ জানি না, অকারণেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসল। আমার চোখের সামনে ওর দুই গালে আস্তে আস্তে দুটো টোল পড়ল।

আমি নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলছিলাম। সজোরে মনকে ঝাঁকা দিয়ে সামলালাম।

বললাম, "দ্য আনসার ইজ, ইয়েস আই ডু, ভেরি মাচ সো।"

মুখটা আলো হয়ে গেল বেভের। একটু হেসে মুখ নীচু করে খেতে শুরু করল।

খানিক বাদে মুখ তুলে বলল, "আমি যা বললাম, তা তুমি বিশ্বাস করলে? এটা তো বানানো গল্পও হতে পারে?"

"তা পারে, তবে বাড়ির পজেশনের ব্যাপারটা নিশ্চয় অসত্য নয়, ওটা তোমার আঙ্কল জ্যাকের কথা।"

"বাড়িটা হয়তো ব্রুকলিনের ছোট্ট বাড়ি।"

"হয়তো, কিন্তু তুমি যাকে বলছ, সে হচ্ছে একটা গরীব প্রফেসর, তার নিজের বাড়ি নেই। আছে শুধু একটা ভাঙা গাড়ি।"

"আবার ওটা গ্রিনিচের ম্যানসনও হতে পারে। আমি যদি প্রপার্টি ক্লেইম করি, আই উইল বি এ ভেরি রিচ উওম্যান। তুমি একজন রিচ উওম্যানের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছ।"

"ট্রু," আমি বললাম, "রিচ এন্ড বিউটিফুল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম এ রিচ এন্ড বিউটিফুল উওম্যান, ইফ শি ইজ রেডি টু অফার ইউ এনিথিং?" চোখে চোখ রেখে আবার প্রশ্ন করল বেভ।

মুখে প্রায় এসে যাচ্ছিল, 'এভরিথিং'। ও মাই গড করছি কী বেভ কিশোরের ফিঁয়াসে এখনো এনগেজড! সতর্ক হয়ে উত্তর দিলাম, "মে বি অ্যানাদার গুড ডিল ফ্রম হার আঙ্কল জ্যাক।"

এগিয়ে একটু ঝুঁকে আমার হাতের ওপর হাতটা আলতো করে রেখে বলল, "ইউ আর সো ইজি টু প্লিজ।"

বিকেলে টিভি কেনার প্রসঙ্গে বেভের কথা এল। গল্প শেষ হলে প্রমথ মন্তব্য করল, "কিশোর তো মনে হচ্ছে ফুটে গেছে, মেয়েটাও ডিরেক্ট হিন্ট দিচ্ছে। ঝুলে যা, এ চান্স আর পাবি না।"

"চুপ কর, আই হ্যাভ আদার থিংস ইন লাইফ।"

"কি আবার আদার থিংস? করিস তো প্রফেসরি, ছাত্র পড়াস, খাতা দেখিস, আর কিছু ফালতু রিসার্চ।"

"আর একটা কথা বলবি না এ নিয়ে," প্রমথকে আমি আল্টিমেটাম দিলাম।

"বেশ বলব না, কিন্তু তুইও এটা একেনবাবুর নতুন কাহিনির সঙ্গে যোগ করবি না। তোর একটা হ্যাবিট আছে নিজের ব্যর্থ প্রেমের একটা গাথা গল্পের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া।"

প্রমথর কথা অগ্রাহ্য করে টিভি কেনার কাহিনিটা ঢুকিয়ে দিলাম। প্রথমত এটা ব্যর্থ প্রেমের গাথা নয়। বেভের প্রতি একটা আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, সেটা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু সেটা প্রেমের পর্যায়ে নয়।

।। ২৮।।

বুধবার জুন ৮, ২০১১

সকালে একেনবাবুকে মনে হল একটু এক্সাইটেড। কফি খেতে খেতে দ্রুত পা নাড়াচ্ছেন। অশোকের হত্যাকারী এড তো এখন জেলে। তার মানে কি বিপাশার হারানো ছবিটার হদিশ পেয়েছেন? কফি শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "একটু হাঁটতে বেরোবেন নাকি স্যার?"

"কেন বলুন তো, কোনও কারণ আছে?"

"তা একটা আছে স্যার।"

"কোথায় যাবেন? এখনো তো দোকানপাট খোলেনি।"

"হোটেল তো খোলা স্যার। মিস সীমা আমাকে বলেছিলেন সকালে ওঁর ডিউটি থাকে। ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল।"

"হোটেলে ফোন করুন না।"

"না, না স্যার, এগুলো ফোন করে হয় না।"

"আপনি যান, আমাকে টানছেন কেন?"

"চলুন না স্যার। ভেরি নাইস আর বিউটিফুল মিস সীমা, আপনার ভালো লাগবে।"

প্রমথ সকাল সকাল কলেজে যাবে বলে দাড়ি কামাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ওকে নিয়ে যান। নিজের মুরোদে তো কুলোবে না। আপনার দৌলতে যদি কাউকে পেয়ে যায়।"

এ কথা শুনেও যে আমি গেলাম, সেটা নিতান্ত একেনবাবুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে।

অ্যাম্বাসেডর হোটেল আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটাপথে বড় জোর মিনিট পনেরো। নিউ হেরিটেজের মতো সুপার লাক্সারি টাইপ নয়, তবে স্ট্যান্ডার্ড দামি হোটেল। ফাইভ না হলেও ফোর স্টার তো হবেই। সীমা শ্রীমালীকে অফিসেই পেলাম। একেনবাবু ভুল

বলেননি। সুন্দরী না হলেও চেহারাটা খুবই মিষ্টি। কথাবার্তাতেও সপ্রতিভ, হোটেলের কাজে সেটা না হলে বোধহয় চলে না। সীমা বিজনেস অফিসটা দেখাশোনা করে। সীমার অফিসের পাশে একটা বড় ঘরে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, কপিং মেশিন, ইত্যাদি সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, সেখানেও বেশ কিছু চেয়ার। ঘরটায় ওয়াই-ফাই কাভারেজও নিশ্চয় আছে, অনেকে সেখানে বসে নিজের ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছেন। কয়েকটা কিউবিক্যালও আছে প্রাইভেসির জন্য। আমরা থাকতে থাকতেই দু'জন এসে সীমার সাহায্য চাইলেন। আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ সীমাকে বিরক্ত করলাম না। একেনবাবু বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক কখন এবং কেন অশোকের সঙ্গে সীমার ছাড়াছাড়ি হল।

একেনবাবু খুব অ্যাপলজিটক্যালি বললেন। "আমি জানি ম্যাডাম, এ নিয়ে আপনি আলোচনা করতে চান না, কিন্তু তাও আপনাকে বিরক্ত করছি। আপনি সেদিন বললেন, অশোকবাবু হঠাৎ কোল্ড ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার আগে আপনাদের মধ্যে কোনও কথা কাটাকাটি বা এমন কিছু কি ঘটেছিল যেটা আপনার মনে পড়ে?"

"আপনাকে তো আগেই বলেছি, 'না'।"

"তা বলেছেন ম্যাডাম। আপনার মা এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি অশোকবাবুর কিছু হয়েছিল?"

"কিছুই হয়নি। অশোককে মা'র খুব পছন্দ হয়েছিল, অশোকও খুব রেস্পেক্টফুল ব্যবহার করত। আমরা মাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়েছিলাম প্লেনে তুলে দিতে। যাবার আগে অশোককে বুকে জড়িয়ে মা অনেক আশীর্বাদ করলেন। আসলে আমার মা-বাবা খুব কনসার্ভেটিভ। কিন্তু মা যখন দেখলেন অশোকরাও ব্রাহ্মণ, উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। ইনফ্যাক্ট যাবার আগে অশোককে সেটা বললেনও।"

"কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম, আপনিও কি সেরকম কনসার্ভেটিভ?"

"মোটেও না।"

"অশোকবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আপনার কোনওদিন আলোচনা হয়েছিল?"

"একবারই হয়েছিল। অশোক ছিল খুব লিবারেল, কাস্ট সিস্টেম হেট করত। বলেছিল, 'আমি একটা মানুষ, পিরিয়ড। তার বাইরে আমি ভাবতে চাই না।'

আমি বলেছিলাম, 'জাত-ফাত আমিও মানি না।'

'কিন্তু তোমার ফ্যামিলি মানে', অশোক বলেছিল।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, 'আমার ফ্যামিলির জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারো না।'"

এটুকু বলে সীমা এক মুহূর্ত থামল। তারপর একেনবাবুকে বলল, "এনি ওয়ে ইট ইজ অল ওভার নাউ। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইট এনি মোর। প্লিজ নো মোর কোয়েশ্চেন।"

একটু বিরক্ত মুখেই কথাটা শেষ করল সীমা। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে যোগ করল, "আপনার সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা। আমি কিন্তু অভদ্র হতে চাইনি। অশোক সম্পর্কে আলোচনা করতে আমার সত্যিই কষ্ট হয়।"

"আমি কিচ্ছু মনে করিনি," আন্তরিক ভাবেই বললাম। "আবার যদি কোনদিন দেখা হয়, আমরা অন্য কথা বলব।"

"আই উইল বি হিয়ার।"

"আই অ্যাম সরি ম্যাডাম, এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে। কথা দিচ্ছি আর

আসব না।" একেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"দ্যাটস আলরাইট।" সীমা মনে হল বিরক্তি প্রকাশ করে একটু লজ্জিত হয়েছেন। "ইউ আর ওয়েলকাম টু স্টপ বাই।"

বাড়ি ফেরার পথে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো আপনার? অশোকের কিলারকে তো পুলিস ধরেছে? এখনো ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"মুশকিলটা হল স্যার, ফটোটা তো পাওয়া যায়নি, আর বিষ্ণু মূর্তিটা কোথায় সেটাও আমরা জানি না!"

"ওয়েট এ মিনিট, বিষ্ণুমূর্তির ব্যাপার আসছে কোত্থেকে? বিপাশা তো জানেন সেটা কোথায়।"

"দ্যাট ইজ কনফিউসিং স্যার। যদি জানেন, তাহলে ওটা লুকিয়ে রেখেছেন কেন?"

"তার হাজার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বা ওই ফটোর সঙ্গে মিস সীমার কি সম্পর্ক?"

"মনে হচ্ছে কিছুই নেই। কিন্তু বলুন তো স্যার, মিস সীমাকে কেমন লাগলো?"

"প্রশ্নটার অর্থ একটু বুঝিয়ে বলুন তো? প্রমথকে মুরুব্বি ঠাউরে আমার ঘটকালি করার চেষ্টা করছেন?"

"কী যে বলেন স্যার। তা নয়, তবে মনে হল ছোটোখাটো দেখতে হলে কি হবে, ম্যাডাম বেশ তেজস্বী।"

একেনবাবুর মাথায় যে কী ঘোরে, বোঝা শিবেরও অসাধ্য।

।। ২৯ ।।

বৃহস্পতিবার জুন ৯, ২০১১

কেন একেনবাবু আবার আমাকে টেনে নিয়ে নিউ হেরিটেজ হোটেলে এসেছেন জানি না। দেবরাজ সিং নেই, ইন্দ্র ছিলেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন ছিল স্যার।"

"আজ আমি একটু ব্যস্ত, অনেক সময় কিন্তু দিতে পারব না। এদিকে শুনেছেন তো এডকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।"

"তাই তো শুনলাম স্যার। আপনাদের তাস খেলা কি বন্ধ এখন?"

"হ্যাঁ, যা চলছে চারিদিকে। কে যে কী করে বেড়াচ্ছে বোঝা দায়। দেবরাজদা বলছিলো অশোকও বোধহয় এডের সঙ্গে জড়িত ছিল।"

"তাই নাকি স্যার?"

"তাই তো বলল। অবশ্য এটা পুলিশের কথা শুনে ওর স্পেকুলেশন। যাই হোক, আপনার প্রশ্নটা কি বলুন?"

“ছোট্ট প্রশ্ন স্যার, অনেক সময় নেব না। একটা জিনিস নিয়ে আমার খটকা লেগেছিলে, কেন তখন জিজ্ঞেস করিনি নিজেই জানি না স্যার। আপনি বলেছিলেন অশোক যেদিন খুন হন তার আগের দিন ওঁর একটা ফোন এসেছিল বাড়িতে।”

“হ্যাঁ, আমি ধরেছিলাম।”

“কখন স্যার?”

“সকাল এগারোটা নাগাদ।”

“আই সি। আপনাদের এখানে ফোন এলে, কে ফোন ধরেন?”

“রিসেপশনে যারা থাকে।”

“তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি স্যার?”

“সবাইকে তো এখন পাবেন না। আচ্ছা, দেখছি।”

লাকিলি অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হল না। প্রথম যাকে পাওয়া গেল, সেই স্যান্ডিই অশোকের ফোনটা ধরেছিল। যিনি ফোন করেছিলেন, তাঁর নামটা স্যান্ডির এখন আর মনে নেই। কিন্তু বলেছিলেন ব্যাপারটা খুব পার্সোনাল আর আর্জেন্ট। স্যান্ডি জানত না অশোক দু’দিনের জন্যে পেন্সিলভ্যানিয়া গেছে। ভেবেছিল বাড়িতে আছে, তাই অশোকের বাড়ির নম্বর লোকটিকে দিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ বাদে লোকটি আবার ফোন করে অশোকের ইমেল অ্যাড্রেস চায়। সেটা স্যান্ডি দেয়, অশোকের ভয়েস মেল এর সঙ্গেও কানেক্ট করে দেয়। তারপর ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝে দেবরাজকেও কথাটা জানায়।

এটা জানার পর ইন্দ্রকে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন অশোকের ভয়েস মেল বা ইমেল চেক করতে পারা যাবে কিনা।

“না,” ইন্দ্র বলল। অশোক মারা যাবার পর ওর ভয়েস মেল ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। ইমেলগুলো দেবরাজদা এবং পুলিশ দেখেছে, তেমন কিছু বোধহয় পায়নি। ওর ইমেল অ্যাকাউন্টও সিস্টেমে আর নেই।”

একেনবাবু মনে হল সেটা শুনে একটু হতাশ।

“আপনাদের আই.টি পার্সন, যিনি কম্পিউটার সিস্টেম দেখভাল করেন, তিনি কোথায়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ইন্দ্র যাঁকে ডেকে আনলেন, তাঁর নাম ফিলিপ। সদ্য বহাল হয়েছেন। আগে ছিলেন দীনেশ পাণ্ডা, তিনি কয়েকদিন আগে দিল্লীতে প্রমোশন পেয়ে চলে গেছেন।

আমি ফিলিপকে জিজ্ঞেস করলাম, “অশোকের পুরানো ইমেল অ্যাকাউন্ট কি উদ্ধার করা যায় না?”

ফিলিপ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। অশোক যে কে ফিলিপের কোনও ধারণাই নেই।

ইন্দ্র বলল, “ফিলিপ মাত্র কয়েকদিন হল এসেছে। অশোক মারা যাবার পরে।”

আমি ফিলিপকে জিজ্ঞেস করলাম, “হোটেলের পুরোনো ইমেলগুলো রিট্রিভ করা যায় না আর্কাইভ থেকে?”

“পুরানো মানে কতদিনের পুরানো?”

“ধরুন দিন দশ-পনেরো আগের।”

“আমি আসার কয়েকদিন আগে সিস্টেম হার্ড ড্রাইভ ক্র্যাশ করে, সুতরাং বেশ কিছু ইমেল সেই সঙ্গে ধবংস হয়। আপনি যে-সময়ের ইমেল খুঁজছেন, সেগুলো পাওয়া যাবে না। পুরোনো ইমেল ব্যাক-আপ সার্ভার থেকে পেতে পারি।”

“ইমেলগুলো ডেইলি বেসিসে আর্কাইভ করা হত না?”

"হলে তো ভালো হত, তাই না? নাউ ইট উইল গেট ফিক্সড।"

বুঝলাম ফিলিপ আগের ডেটা কম্যুনিকেশনের বন্দোবস্তে বিশেষ সন্তুষ্ট নয়।

"অশোকবাবুর নিজের কম্পিউটার থেকে পাওয়া যাবে না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এবার ইন্দ্র উত্তর দিল, "না, ওর দুটো কম্পিউটারই রিফোরম্যাট করে ফেলা হয়েছে, ওখানে কিছুই নেই।"

"সরি," আমি একেনবাবুকে বললাম, "নো লাক।"

"তাই তো দেখছি স্যার, চলুন ফেরা যাক।"

ফেরার পথে দেখি একেনবাবু একেবারে চুপচাপ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো, এখনো অশোককে নিয়ে পড়ে আছেন আপনি?"

"উপায় কি স্যার, বিপাশা ম্যাডামের সমস্যার সঙ্গে যে উনি জড়িত।"

"কোন সমস্যা? ফটো না বিষ্ণুমূর্তি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ঠিক এই সময়ে একেনবাবুর মোবাইলটা বাজল। একেনবাবুর কথা শুনে মনে হল, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। "ভয়েস মেলটা উদ্ধার হয়েছে স্যার? ওয়ান্ডারফুল! ইমেলটার কি কিছু গতি হল স্যার? আজ রাতেই পাওয়া যাবে। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"কার ভয়েস মেল, অশোকের?"

"হ্যা, স্যার।"

"কিন্তু একটু আগে ইন্দ্র যে বলল ওটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে!"

"অশোকের নয় স্যার, অশোকের করা।"

"তার মানে বব ক্যাসেলের ভয়েস মেল?"

"হ্যাঁ, স্যার। তার আগে একটা কাজ করতে হবে স্যার, এখন ইন্ডিয়াতে কটা বাজে?"

ঘড়িতে দেখলাম ১২-টা বেজেছে। "রাত্রি সাড়ে ন'টা।"

"তাহলে বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেল।"

"কাকে ফোন করবেন?"

"অশোকবাবুর দেশের বাড়িতে।"

"তাতেই বিপাশা রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"সবটাই হয়তো পণ্ডশ্রম স্যার, কে জানে!"

"সাড়ে ন'টা এমন কিছু দেরি নয়। অত ভাবাভাবি না করে ফোনটা করে ফেলুন।"

"তাই করি স্যার, বলে পকেটে হাত দিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করে বললেন, ওই যাঃ, নম্বরটাই বাড়িতে ফেলে এসেছি। বাড়ি পৌঁছে করতে গেলে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।"

"তা যাবে। কিন্তু কী জানতে ফোন করতে চান?"

"একটা জিনিস কনফার্ম করার কথা ভাবছিলাম, তার বোধহয় দরকার নেই। আসলে জানেন কি স্যার, মনে হচ্ছে টানেলের শেষে আলো দেখতে পাচ্ছি।"

"আপনার তো অনেকগুলো টানেল অশোক দুবে, বিপাশা মিত্রের ফটো, বব ক্যাসেল, সেই সঙ্গে যোগ করেছেন বিষ্ণুমূর্তি। কোনটার কথা বলছেন?"

"সবগুলোর কথাই বলছি। আসলে স্যার, সব পথ এসে, মিলে গেছে শেষে, তোমারি দুখানি নয়নে।"

নাঃ, প্রমথ ঠিকই বলে, শনির দশায় একেনবাবুর মাথাটা একেবারে গেছে!

“কী বলছেন মশাই, ঠিক আছেন তো?”

“এক্কেবারে ফাইন স্যার। আমি বিপাশা ম্যাডামকে বলে দিই, কাল সকালে ওঁর কাছে গিয়ে রিপোর্ট দেব।”

“কী রিপোর্ট দেবেন?”

“যা সত্য তাই বলব, বানিয়ে তো কিছু বলা যাবে না।”

“আপনি এবার প্রমথকে নিয়ে যাবেন। আমি ওর মধ্যে যেতে রাজি নই।”

“কেন স্যার, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?”

।। ৩০ ।।

শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই গেলাম। একেনবাবুকে অজস্র প্রশ্ন করেও কিছুই ওঁর পেট থেকে বার করতে পারলাম না। ওঁর একটাই উত্তর, “আরে চলুন না স্যার, যা জানি, তাই বলব। মহাভারত তো তাতে অশুদ্ধ হবে না?”

প্রমথ একাধিক বার একেনবাবুর বাপান্ত করে আমায় বলল, “আজ এম্ব্যারাসমেন্টের চূড়ান্ত হবে।”

একেনবাবুর উপর আমি প্রমথর থেকে বেশি ভরসা রাখি, কিন্তু আজকে আমিও একটু অসোয়াস্তি বোধ করছি। বিপাশা মিত্রের মতো নামিদামি ক্লায়েন্টের কাছে এতদিন বাদে গিয়ে জানানো, ‘হ্যাঁ, আপনার ছবি চুরি হয়েছে, সেটা জানি। কে চুরি করেছে সেটাও বোধহয় জানি, কিন্তু কোথায় ছবিটা আছে জানি না।’ আমি শিওর বিপাশা মিত্র সেটা শুনে দু’হাত তুলে নৃত্য করবেন না। বলতে গেলে উনি আমাদের যা বলছেন, এটা প্রায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাই ওঁকে বলা।

বিপাশা মিত্র আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের সবাইকেই অভ্যর্থনা করে বসালেন। তারপর একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমার জিনিসটা পেয়েছেন?”

“এখনও বলতে পারছি না, ম্যাডাম। এসেছি প্রোগেস রিপোর্ট দিতে,” একেনবাবু স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বললেন। “আসলে যে কাজটা দিয়েছিলেন ম্যাডাম, সেটা খুবই কঠিন।”

“সেইজন্যেই তো কাজটা আপনাকে দিয়েছি। কী খাবেন আপনারা□ চা না কফি?”

“আগে যে কাজের জন্যে এসেছি শেষ হোক, তারপর।”

“বেশ,” বিপাশা মিত্রের স্মিত মুখেই বললেন।

“ম্যাডাম, আপনি আমায় ভার দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একটা ফটো খুঁজে বার করতে। কয়েকজনের নামও আপনি দিয়েছিলেন, যাঁদের আপনি সন্দেহ করেন। এঁদের মধ্যে মিস্টার দেবরাজ সিং ছিলেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরের দিন মিস্টার সিং এসে বললেন ওঁর হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার অশোক দুবে খুন হয়েছেন। তার তদন্তের ভার আমায় নিতে হবে। আরও বললেন, আপনিই ম্যাডাম, ওঁকে আমার ঠিকানা দিয়েছেন।”

“হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।”

"মিস্টার সিং বললেন, আগে ওঁর কাজটা করতে হবে, কারণ খুন একটা গুরুতর ব্যাপার। উনি অবশ্য জানতেন না, আপনি একটা ফটো খোঁজার ভার আমায় দিয়েছেন। ওঁর ধারণা ছিল আপনার হারিয়ে যাওয়া বিষ্ণুমূর্তিটা আমি খুঁজছি। আমরা অবশ্য আপনার কথা রেখে কী খুঁজতে বলেছেন সেটা জানাইনি। যাইহোক, এইজন্যেই আপনার কাজটা প্রথমে শুরু করিনি ম্যাডাম। মিস্টার সিং অবশ্য বলেছিলেন, আপনাকে এটা জানাবেন। বলেছেন কিনা জানি না, উনিও ব্যস্ত মানুষ।"

বিপাশা মিত্র একেনবাবুর দীর্ঘ ভূমিকাতে বোধহয় একটু অধৈর্য হলেন। বললেন, "এগুলো বলার কোনও দরকার নেই, আপনি ফটোর ব্যাপারে আসুন।"

"আসছি ম্যাডাম। আসলে কেন আপনার কাজটা শুরু করতে দেরি হল, তার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছিলাম। যাই হোক ম্যাডাম, আমরা আপনার ফটোটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভেবে চিন্তে মনে হল, এই ফটোটা যে চুরি করেছে, সে হয়তো আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে করেনি, করেছে আর্থিক লাভের জন্যে।"

"আর্থিক লাভ!"

"আপনার ছবিটা যে খামে ছিল ম্যাডাম, তাতে লাগানো স্ট্যাম্পটা আপনি ভালো করে দেখেননি। স্ট্যাম্পটা কিন্তু দামি ছিল। আমাদের প্রিলিমিনারি ফাইণ্ডিং হল, মিস্টার সিং-এর হোটেলের এক স্টাফ মিস্টার অশোক দুবে ওটা চুরি করেছিলেন।"

"অশোক দুবেকে আমি চিনি। ও আমার কাছে কাজের সূত্রেও এসেছে। ও কিছু চুরি করতে পারে বলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমরাও প্রথমে করিনি ম্যাডাম। অশোকবাবুর মার্ডার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েই এটা আবিষ্কার করি।"

"কী করে? ও আই উইশ দেবরাজ এগুলো শুনত! ওকে কি ডাকব?"

"কোনও দরকার নেই ম্যাডাম, উনিও রিপোর্ট পাবেন। কিন্তু যেটা বলছিলাম, এটা আমরা আবিষ্কার করি একটু লাকিলি। ফিলাটেলিস্ট কর্নার, মানে যে দোকানে অশোকবাবু স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে গিয়েছিলেন, সেই দোকানেরই একজন রাস্তায় বাপিবাবুকে অশোকবাবু বলে ভুল করে স্ট্যাম্প কেনার কাস্টমার পাওয়া গেছে জানান। পরে আমরা সেই দোকানে গিয়ে নিশ্চিত ভাবে জানি, অশোকবাবু সত্যিই একটা 'সিন্ধু ডাক' স্ট্যাম্প বিক্রি করার জন্যে এনেছিলেন।"

"সিন্ধু ডাক!"

"হ্যা ম্যাডাম, প্রায় সাত আট হাজার ডলার দাম ওই স্ট্যাম্পের। আপনার কাছে অঙ্কটা বড় নয় ম্যাডাম, কিন্তু আমাদের বা অশোকবাবুর মতো লোকের কাছে এটা বড় অঙ্কের টাকা। লোভে পড়ে ওটা চুরি করা অবশ্যই সম্ভব।"

"ওর কি টাকার টানাটানি চলছিল? হি কুড হ্যাভ অ্যাস্কড দেবরাজ অর ইভেন মি!"

"মিস্টার সিংকে জানিয়েছিলেন ম্যাডাম, উনি শেষে দিতে রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু সেদিনই অশোকবাবু খুন হন।"

"হোয়াট এ ট্র্যাজেডি!"

"ইয়েস ম্যাডাম। উনি স্ট্যাম্পটা বিক্রি করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলেন। কেউ নিশ্চয় সেটা জানত। তারই লোভে অশোকবাবুকে সে খুন করে।"

"তার মানে অশোকের খুনি স্ট্যাম্প শুদ্ধু খামটা নিয়ে অদৃশ্য হয়?"

"প্রথমে তো তাই মনে হচ্ছিল ম্যাডাম। কিন্তু কাহিনিটা এখানেই শেষ নয়, বলতে পারেন এটাই শুরু।"

“এর পরেও কিছু আছে?” বিপাশা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, ম্যাডাম। একটু আগে যে বললাম বাপিবাবুকে ফিলাটেলিস্ট কর্নারের একটি লোক এসে বলেছিল স্ট্যাম্পের কাস্টমার পাওয়া গেছে... গন্ডগোলের শুরু সেখান থেকে। বাপিবাবু শিওর যে দোকানের মালিক কথাটা বলেননি। দোকানের আরেকজন হলেন মালিকের স্ত্রী, তিনিও নন। এঁরা দু'জন ছাড়া, দোকানে কাজ করতেন আরেকটি মাত্র লোক। তিনি আবার চাকরি ছেড়ে একটা টিভির দোকানে মাস দেড়েক হল কাজ করছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষেও কথাটা বলা সম্ভব নয়। তাহলে কে এই ভদ্রলোক, যিনি অযাচিত ভাবে বাপিবাবুকে খবরটা দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন? এটাই কনফিউসিং ম্যাডাম। তার মানে কি এটা একটা সেট-আপ? কেউ কি চান যে আমরা ভাবি অশোকবাবুর কাছেই স্ট্যাম্পটা ছিল? শুধু তাই নয় ম্যাডাম, একজন ভদ্রলোক নিজেকে অশোকবাবু বলে পরিচয় দিয়ে একটা 'সিন্ধু ডাক' স্ট্যাম্প দোকানেও নিয়ে গিয়েছিলেন! শুধু যোগাযোগ করার জন্যে যে নম্বরটা দোকানে দিয়ে এসেছিলেন, সে রকম কোনও নম্বরই টেলিফোন কোম্পানিতে নেই। আমি বলব সামথিং ওয়াজ নট রাইট ম্যাডাম। পুরো ব্যাপারটাই বেশ পাজলিং, ভেরি ভেরি পাজলিং।”

বিপাশা মিত্র চুপ করে শুনছেন। উনিও মনে হচ্ছে একটু কনফিউসড।

“তারপর হঠাৎ বব ক্যাসেল মারা গেলেন, ম্যাডাম।”

“সেটা খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু তার সঙ্গে চুরি যাওয়া ফটোর কি সম্পর্ক? ও-ও কি এর মধ্যে ইনভলভড?”

“আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ম্যাডাম। কিন্তু উনি একটা স্ট্রেঞ্জ অ্যাডভাইস আমাকে দিয়েছিলেন।”

“কী অ্যাডভাইস?”

“বলেছিলেন, অ্যাডভান্স না নিয়ে আপনার কাজ যেন আমি না করি।”

“আপনি কি সেই অ্যাডভাইস শুনে ভয় পাচ্ছেন, আপনার ফি আমি আপনাকে দেব না?” বিপাশার চোখেমুখে বিরক্তি।

“মোটেই না ম্যাডাম।” তারপর একেনবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পালটে বললেন, “একটা প্রশ্ন ম্যাডাম, আপনার সেই কম্বোডিয়ার বিষ্ণুমূর্তিটা এখন কোথায় আছে?”

আচমকা প্রশ্নটা শুনে বিপাশা একটু মনে হল হতচকিত। জিজ্ঞেস করলেন, “এই প্রশ্নটা কেন করছেন?”

“আমি ম্যাডাম মিস্টার আকাহাশিকে ক'দিন আগে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, জন হেক্টার যখন ওই বিষ্ণুমূর্তির প্রাভানেন্স নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন আপনারা জানিয়েছিলেন তার উপযুক্ত উত্তর আপনাদের কাছে আছে।”

“প্রাভানেন্স!”

“হ্যাঁ ম্যাডাম, মানে প্রুফ অফ ওনারশিপ, কোত্থেকে পাওয়া গেছে, কে আগে এর মালিক ছিল, তার নাম ঠিকানা...।”

“আমি জানি প্রাভানেন্স কি, কিন্তু স্ট্যাম্পের সঙ্গে বিষ্ণুমূর্তির কি সম্পর্ক?”

“স্ট্যাম্পের সঙ্গে নয় ম্যাডাম, জন হেক্টারের মৃত্যুর সঙ্গে। বলছিলাম না ম্যাডাম, ব্যাপারটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড।”

এবার বিপাশা মিত্র বেশ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল, “আপনি কি সাজেস্ট করছেন ওই বিষ্ণুমূর্তির জন্যে জন হেক্টার মারা গেছেন?”

“ঠিক তা নয় ম্যাডাম।”

"তাহলে?"

"আমি বলতে চাচ্ছি ম্যাডাম, ওই প্রাভানেঙ্গটা যত্ন করে রাখবেন। কারণ, ওটা সাউথ ইন্ডিয়ার মন্দির থেকে চুরি করা মূর্তি, তার প্রমাণ জোগাড় করতেই মিস্টার হেক্টার ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন। সেই কেস হয়তো অনেকদূর গড়াবে।"

এবার বিপাশা মিত্রের বিরক্তি আর চাপা রইল না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বেশ কঠোর স্বরে বললেন, "আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন মিস্টার সেন। ফটো সম্পর্কে যদি আর কিছু বলার না থাকে, তাহলে এখন যেতে পারেন।"

একেনবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বেশ শক্ত গলাতেই বললেন, "আমার মনে হয় ম্যাডাম, আপনার ফটো চুরি যায়নি, ওটা আপনার কাছেই আছে। ওটা চুরি গেছে আপনি আমায় বলেছেন দেবরাজবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে। যাই হোক, ধরে নিন ম্যাডাম, আপনার কেসটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ওই ফটোর কোনও খোঁজ আমি করছি না। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন ম্যাডাম, অশোকবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন সাড়ে আটটার সময় আপনি কিন্তু একা অফিসে ছিলেন।" বলে একেনবাবু আমাদের দিকে তাকালেন, "চলুন স্যার, আমরা যাই।"

দেখলাম বিপাশা মিত্রের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এমনিতে একেনবাবু বিনয়ের অবতার, কিন্তু রহস্য সমাধানের আগের মুহূর্তে উনি ট্র্যান্সফর্ম করে যান। 'স্যার', 'ম্যাডাম' এগুলো বলেন ঠিকই, এমন কি 'পাজলড', 'কনফিউসড' এ কথাগুলোও ব্যবহার করেন, কিন্তু তার পেছনে উঁকি মারে একটা দৃঢ়-সংকল্প শিকারির অভিব্যক্তি, হু ইজ প্রিপেয়ারিং ফর হিস ফাইন্যাল কিল।

বিপাশা মিত্রের অফিস থেকে নেমে এসে যখন আমরা রাস্তায় বেরোচ্ছি, তখন দেখি নিউ ইয়র্ক পুলিশের কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার বিল্ডিং-এ ঢুকছে। সেদিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, "গুড টাইমিং স্যার।"

প্রমথ বলল, "ব্যাপার কী বলুন তো, কী আগড়ম বাগড়ম বকে এলেন, আবার এখন বলছেন 'গুড টাইমিং'!"

"চট করে বলা যাবে না স্যার, কফিতে গলা ভেজাতে হবে।"

অন্যদিন হলে প্রমথ বলত নিজের পয়সায় খান। আজ বলল, "চলুন, সামনেই স্টারবাকের কাফে, আমি খাওয়াচ্ছি।"

কেন জানি না, আজ জায়গাটা ফাঁকা। আমরা আরাম করে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। প্রমথ শুধু কফি নয়, বেশ কিছু স্যান্ডউইচও কিনে আনলো। একেনবাবু তাঁর কাহিনি শুরু করলেন।

"আসলে স্যার, দেবরাজবাবুই নাটের গুরু।"

"দাঁড়ান," প্রমথ ওঁকে থামিয়ে দিল। "আপনিও তো দেখছি হ-য-ব-র-ল-র হুঁকোবুড়োর মতো শুরু করেছেন, 'তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলি সুতো খেয়ে ফেলেছে।' আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিন।"

"ব্যাকগ্রাউন্ড তো স্যার আপনারা জানেনেই। প্রথম দিনই দেবরাজবাবু একটা কথা বলেছিলেন, তাতে খটকা লেগেছিল।"

"কী কথা?" এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

"দেবরাজবাবু বলেছিলেন অশোকবাবু আপনার মতো দেখতে। কথাটা অবান্তর স্যার, কিন্তু বলার একটা উদ্দেশ্য ছিল। যখন একজন আপনাকে এসে স্ট্যাম্পের খরিদ্দার পাওয়া গেছে বললেন, তখন যাতে আমাদের সন্দেহ জাগে লোকটি আপনাকে অশোকবাবু ভেবে কথাটা বলেছেন। এই স্ট্যাম্পের ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ সেট-আপ সে ব্যাপারে আমি কনভিন্সড হয়ে যাই, যখন বেভ ম্যাডামের কাছে আপনি জানতে পারেন ফিলাটেলিস্ট কর্নারের একমাত্র সেলস পার্সন এসব ঘটনার অনেক আগেই অন্য জায়গায় কাজ নিয়েছেন। এরপর থেকেই স্যার দেবরাজবাবু আমার ফোকাসের মধ্যে এসে যান। এবার কতগুলো ঘটনার কথা বলছি, যেগুলো স্যার আপনারা সবাই জানেন। এক নম্বর, ইন্দ্রবাবুর বয়ান আনুয়ায়ী অশোকবাবুকে 'জন' বলে একজন ভদ্রলোক জরুরি কারণে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরে আর ফোন করেননি। নিউ হেরিটেজ হোটেলে অপারেটর স্যান্ডিও সেটা কনফার্ম করলেন। তিনিই অশোকের বাড়ির ফোন নম্বরটা সেই জন, যাঁর নামটা স্যান্ডি মনে করতে পারেননি, তাঁকে দিয়েছিলেন। অশোকের ভয়েস মেল এবং ইমেলের অ্যাড্রেসও স্যান্ডি ভদ্রলোককে দিয়েছিলেন। আমরা ধরে নিতে পারি ভদ্রলোক অশোককে ইমেল পাঠিয়েছিলেন, হয়তো ভয়েস মেলেও মেসেজ রেখেছিলেন। প্রশ্ন হল, কী এত জরুরি প্রয়োজন ভদ্রলোকের ছিল? দু'নম্বর, আমরা একজন জনের খবর জানি, জন হেক্টার। তিনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন বিষ্ণুমূর্তির ব্যাপারে আর কল্পনা বলে এক মহিলাকে ইন্টারভিউ করতে..."

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। জন ইংরেজিতে কমন নাম," প্রমথ বলল। "হাজার হাজার জন আছে, এ দুটোকে মেলাবার চেষ্টা করছেন কেন?"

"টাইমিংগুলো যদি মেলান স্যার, তাহলে দেখবেন জন হেক্টার ইন্ডিয়াতে যেদিন খুন হন, তার অল্প সময়ের মধ্যেই অশোক হোবোকেনে খুন হন।"

"সো হোয়াট?"

"মানছি স্যার, তবু প্রশ্ন থাকে, এই জন কি সেই জন হেক্টার যিনি অশোককে কোনো একটা খবর দেবার চেষ্টা করেছিলেন? দু'জনের মৃত্যুর মধ্যে কি কোনও যোগ আছে? জাস্ট এ কোয়েশ্চেন স্যার, বাট ইট স্টার্টেড বদারিং মি।"

প্রমথ আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে থামিয়ে বললাম, "তুই চুপ করবি!" তারপর একেনবাবুকে বললাম, "প্লিজ কন্টিনিউ।"

"এবার ভাবুন স্যার, জন হেক্টার ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন বিষ্ণুমূর্তিটা সাউথ ইন্ডিয়ার ত্রিচি মন্দির থেকে আনা, সেটা প্রমাণ করতে। আমরা জানি যে, উনি সত্তর দশকে সাউথ ইন্ডিয়ার মন্দির নিয়ে বই লেখার জন্যে বহু ছবি তুলেছিলেন। সম্ভবত ত্রিচিতে গিয়েও মন্দির এবং তার ভিতরের নানান মূর্তির ছবি তুলেছিলেন, আর সেই ছবির একটার সঙ্গে বিপাশা ম্যাডামের বিষ্ণুমূর্তির হুবহু মিল দেখেছিলেন। সেইজন্যেই আকাহাশির কাছে প্রাভানেন্স নিয়ে উনি এত প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ফটো থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

উনি গিয়েছিলেন যে-মন্দিরে উনি বিষ্ণুমূর্তির ছবিটা তুলেছিলেন, সেখানে ওই মূর্তিটা এখনো আছে কিনা দেখতে। সেটা না থাকলে একটা সম্ভাবনা, ওখান থেকে কেউ চুরি করে ওটা সুজয় মিত্রকে বিক্রি করেছে। জন হেক্টার স্যার, একজন দুঁদে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার। মূর্তিটা যে চোরাই মাল সেটা প্রমাণ করতে পারবেন সহজেই, কিন্তু চুরিটা করেছে কে? কার কাছ থেকে সুজয় মিত্র মূর্তিটা কিনলেন? এটা যদি উনি বার করতে পারেন, তাহলেই সেটা সত্যিকারের নিউজ হবে।"

"এবার বুঝেছি, বিপাশা কেন বিষ্ণুমূর্তি চুরি গেছে বলে বাইরে বলেছিল," প্রমথ বলল, "যাতে এসব কেচ্ছা বেরোলেও গায়ে তেমন লাগবে না, মূর্তিটা তো আর ওর কাছে নেই।"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার। কিন্তু যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, মনে আছে স্যার, মিস্টার হেক্টারের সেক্রেটারি প্যামেলা জোনস এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের কথা বলেছিলেন? কল্পনা নামে বার্নার্ডস কলেজে ওঁর এক ছাত্রী ছিলেন, যিনি গ্রাজুয়েশনে আগেই হঠাৎ দেশে ফিরে যান, আর একটা মার্ডারে জড়িয়ে পড়েন?"

"মনে আছে," আমি বললাম।

"আর এক কল্পনার কথা আমরা জেনেছি হেমন্ত চুগানি আর তাঁর আঙ্কলের কাছ থেকে। সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পেলের পুরোহিতের মেয়ে, যিনি একটা মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই দুই কল্পনা কি একই লোক? মিস কল্পনার কাছে মন্দিরের কিছু গয়না পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ওঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন, যাঁর গুলিতে গার্ডের মৃত্যু হয়, তাঁকে ধরা যায়নি। পুলিশের ধারণা তিনি ছিলেন কল্পনার বয়-ফ্রেন্ড, যাঁর পরিচয় কল্পনাকে বহু জেরা করেও পাওয়া যায়নি। খবরটা মিস্টার হেক্টার যে জানতেন, সেটা হেমন্তবাবুই আমাদের বলেছেন। মন্দির থেকে মূর্তি চুরি যাবার ঘটনাটা আমরা কোথাও শুনিনি। ধরে নিচ্ছি বিগ্রহ চুরি হয়ে থাকলেও মন্দিরের কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থে সেটা হয়তো চেপে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্য কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ভক্তদের ঠাকুর-দর্শন থেকে নিরাশ করেননি। এটা আমার স্পেকুলেশন স্যার, মিস্টার হেক্টারও নিশ্চয় সেটাই ভেবেছিলেন। ত্রিচিতে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই মন্দিরটা বার করার পর হেক্টার দেখলেন, সত্যিই আগে যেখানে পুরোনো বিষ্ণুমূর্তিটা ছিল, সেখানে আর সেটা নেই। এবার মিস্টার হেক্টার স্টার্টেড কানেক্টিং ডট্‌স। উনি চিন্তা সুরু করলেন, সুজয় মিত্রের সঙ্গে কল্পনার কোনও যোগ আছে কিনা! উনিই কল্পনার সেই বয়ফ্রেন্ড কিনা!

ডঃ আর মিসেস দাসের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, বিপাশা মিত্রের বাবা, সুজয় মিত্র ১৯৭৫ সালে মাস ছয়েকের জন্যে ভারতবর্ষে গিয়ে ছিলেন। এমনিতে ওঁর ইন্ডিয়ার প্রতি কোনও প্রেম ছিল না স্যার। ইনফ্যাক্ট এর পর উনি আর কোনও দিন ইন্ডিয়াতে যাননি। এবার চিন্তা করুন স্যার, প্রথম স্ত্রী মানে বিপাশা ম্যাডামের মায়ের মৃত্যুর পর এত লম্বা সময়ের জন্যে উনি ইন্ডিয়া কেন গেলেন?"

"হয়তো মানসিক ভাবে উনি এত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, যে হি নিডেড এ চেঞ্জ অফ প্লেস," প্রমথ বলল।

"কিন্তু তা বলে ইন্ডিয়া স্যার? যে দেশের ব্যাপারে ওঁর কোনও ইন্টারেস্টই ছিল না!"

আমি বললাম, "একেবারে ছিল না বলছেন কেন, ইন্ডিয়ার বিষ্ণুমূর্তি তো একটা ছিল।"

"কম্বোডিয়ার স্যার, দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লেইম। না স্যার, ইন্ডিয়াতে এভাবে যাওয়ার অন্য কোনও কারণ আছে।"

“প্রেম?” প্রমথ বলল।

“এক্স্যাক্টলি স্যার। কোনও ইন্ডিয়ান মেয়ের প্রেমে হয়তো উনি পড়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর আগেই হয়তো পড়েছিলেন। হি ডিসাইডেড টু লিভ দ্য কান্ট্রি উইথ হার। আমরা জানি স্যার, কল্পনা এদেশে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন। হঠাৎ পড়া বন্ধ করে দেশে চলে যান।”

প্রমথ বলল, “কিন্তু শি ওয়াজ নট দ্য ওনলি উওম্যান যে সত্তর দশকে এখান থেকে দেশে ফিরে গিয়েছে।”

“ট্রু স্যার, ট্রু,” মাথা নাড়লেন একেনবাবু। “কিন্তু ধরুন এই কল্পনার প্রেমেই সুজয় মিত্র পড়েছিলেন। আমি ধরে নিচ্ছি, এই তথ্যটা মিস্টার হেক্টারের মতো ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের পক্ষে বার করাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সুজয় মিত্র নানান দেশের পুরোনো মূর্তি কালেক্ট করেন। কল্পনার সঙ্গে একদিন মন্দিরে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তিটা দেখে লোভ হয়। কল্পনাকে নিশ্চয় বলেন সে কথা। কল্পনার বাবা মন্দিরের পুরোহিত, সুতরাং সেখানে অসময়ে ঢুকতে পারাটা তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন নয় স্যার। মিস্টার সুজয় মিত্রের একান্ত ইচ্ছায়ে ওঁরা দুজনে মিলে মন্দির থেকে মূর্তিটা সরাতে যান। তখন আচমকা একটি সিকিউরিটি গার্ড এসে পড়ায় সুজয় মিত্র তাকে গুলি করতে বাধ্য হন। মিস্টার সুজয় মিত্র পালাতে পারেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে গার্ডের বিবৃতি থেকে কল্পনা ধরা পড়ে যান।”

“এবার বুঝেছি,” আমি বললাম। “তারপর ডাঃ দাস যাঁর কথা বলছিলেন, কাস্টমসের সেই বন্ধুর সাহায্য নিয়ে সুজয় মিত্র মূর্তিটা পাচার করে এদেশে নিয়ে আসেন।”

“এক্স্যাক্টলি স্যার, কিন্তু পরিচিতদের বলেন এটা কম্বোডিয়ার বিষ্ণুমূর্তি।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান,” প্রমথ বলল। “না হয় মানলাম এই পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। সুজয় মিত্র গার্ড খুন করে মূর্তিটা পাচার করে নিয়ে এসেছেন, সুতরাং এর প্রাভানেন্স-টেন্স কিচ্ছু নেই। সো হোয়াট, তার সঙ্গে অশোক বা জন হেক্টারের মৃত্যুর সম্পর্কটা কী?”

“বলছি স্যার, বলছি। এটাই হচ্ছে স্যার মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্ট। আমরা সবাই জানি, যাঁর গুলিতে গার্ডের মৃত্যু হয়, তাঁকে ধরা যায়নি। পুলিশের ধারণা তিনি ছিলেন মিস কল্পনার বয়-ফ্রেন্ড যাঁর পরিচয় কল্পনাকে বহু জেরা করেও বার করা যায়নি। কিন্তু এই ‘বয়ফ্রেন্ড’ কথাটা হঠাৎ উঠছে কেন? কেন পুলিশ বা পত্রপত্রিকা এই কথাটা ব্যবহার করবে? ইট ট্রাবল্ড মি স্যার, ট্রাবল্ড মি এ লট। অবভিয়াসলি শি ওয়াজ নট ম্যারেড; ওয়াজ শি প্রেগনেন্ট যখন উনি ধরা পড়েন? সেইজন্যেই হয়তো ওঁর কাছ থেকে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়নি। নিজে জেলে থাকলেও ওঁর অনাগত সন্তানের বাবা জেলের বাইরে থাকবেন, এটাই উনি চেয়েছিলেন। দেন ইট মেকস সাম সেন্স স্যার। যা এখন পর্যন্ত শুনেছি, তার অনেক কিছুই স্পষ্ট হতে থাকে। বাচ্চা ডেলিভারির সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, মিস কল্পনা ততোই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকেন। বেবিকে কার হাতে তুলে দেবেন? ধরে নিতে পারি ওঁর ধর্মনিষ্ঠ বাবা-মা তাঁদের অপরাধী মেয়ের পাপের ভার নিতে রাজি ছিলেন না। মিস্টার সুজয় মিত্রের কথা বললে পুলিশ কানেকশনটা ধরে ফেলবে। মিস্টার দুবে তখন সেখানকার জেলার। মিস কল্পনার মানসিক অবস্থা দেখে তিনি চিন্তিত হলেন, এরকম অবস্থায় অনেকে সুইসাইডও করে।”

“এটা আপনি কোত্থেকে জানলেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“কেন স্যার, আপনার কাছ থেকে!”

“আমার কাছ থেকে!”

"কী মুশকিল স্যার, হেমন্তবাবুর কাকা আপনাকে বলেননি যে, জেলে কল্পনা খুব মানসিক কষ্টে ছিলেন, একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন? এও বলেছিলেন, তখন নাকি জেলার আর জেলারের স্ত্রীর চেষ্টায় অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। আর সেই জেলার যে অশোক দুবের বাবা সেটা তো আপনার বন্ধু কিশোরের আঙ্কল বলেছিলেন!"

এবার আমার মনে পড়ল। "ঠিক আছে, বলুন।"

"হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম স্যার, এই সময়ে মিসেস দুবে মানে অশোকবাবুর মা কল্পনাকে অনেক দেখভাল করেন। কল্পনার বাচ্চা যেন ভদ্র পরিবারে ঠিক ভাবে কোথাও বড় হয়, সেটা দেখার প্রতিশ্রুতি বোধহয় দেন। আমি শিওর মিস্টার হেক্টার নানান লোকের সঙ্গে কথা বলে এইরকমই একটা আইডিয়া পেয়েছিলেন। মিসেস দুবের নিজের কোনও বাচ্চা হয়নি, সেটাও উনি খুঁজে বার করেছিলেন।"

"কী করে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"তা তো বলতে পারব না স্যার। অনুমান করছি ত্রিচির হাসপাতালগুলোর ডেলিভারি রেকর্ড থেকে বা মিসেস দুবের গাইনোকলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে, কিংবা ওঁদের কোনও নিকট আত্মীয়ের কাছে খোঁজ নিয়ে। হু নোজ? কিন্তু এর পরেই হি মেড এ লিপ অফ ফেইথ স্যার। মিস কল্পনা মারা গেছেন, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে কিছুই জানা সম্ভব নয়। উনি মিস্টার আর মিসেস দুবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমার বিশ্বাস উনি বার করতে চাইছিলেন অশোকবাবুই মিস কল্পনার সেই সন্তান কিনা। কিন্তু ওঁরা কেউ দেখা করতে রাজি হলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন মিস কল্পনার প্রসঙ্গ এলে অশোকবাবুর কথা উঠতে পারে। অশোকবাবু যে অ্যাডপ্টেড সে নিয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে ওঁরা রাজি ছিলেন না।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি এমন ভাবে বলে যাচ্ছেন অশোক যে অ্যাডপ্টেড, সেটা যেন আপনি আগে থেকেই জানতেন!" আমি বাধা দিয়ে বললাম।

"এটা আমার অনুমান স্যার," এইজন্যেই সীমার জীবনের সঙ্গে অশোকবাবু নিজেকে জড়াতে চাননি। সীমার মা যখন অশোকবাবু ব্রাহ্মণ বলে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, অশোকবাবু মনে মনে অত্যন্ত আপসেট হয়েছিলেন, যার জন্যে সীমাকে বলেও ছিলেন আমি জাত-টাত নিয়ে ভাবি না, আমার কী জাত সে নিয়ে চিন্তা করি না।"

"এরকম ট্যাঞ্জেনশিয়ালি না বলে সোজাসুজি বললেই তো চুকে যেতো, সীমার সম্পর্কে যেটুকু আপনাদের কাছে শুনেছি, তাতে তো ওকে খুব আন-রিজনেবল মেয়ে বলে মনে হয়নি।" প্রমথ মন্তব্য করল।

"অশোকবাবু নিজে নিশ্চয় কারো কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে উনি অ্যাডপ্টেড, কিন্তু মিস্টার বা মিসেস দুবের কাছ থেকে নয়। তাঁরা এই সত্যটা গোপন রেখেছিলেন, কোনও মতেই অশোককে জানতে দিতে চাননি। ঠিক এই কারণেই অশোকবাবু জেনেও না জানার ভান করে গেছেন সারা জীবন, যাতে ওঁর মা-বাবা কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে কষ্ট না পান। মানুষের সাইকোলজি স্যার নানা ভাবে কাজ করে।"

"বুঝলাম, অশোকই হলেন সুজয় আর কল্পনার ছেলে, সো হোয়াট?"

"সেটা সত্যি কিনা জানি না স্যার, কিন্তু হলে এর ইমপ্লিকেশন ট্রিমেন্ডাস। অশোকবাবু সুজয় মিত্রের ছেলে হওয়া মানে সুজয় মিত্রের সম্পত্তির ফিফটি পার্সেন্টের মালিক।"

"কল্পনাকে তো সুজয় মিত্র বিয়ে করেনি, অশোক ওর ছেলে হলেও ইল্লেজিটিমেট চাইল্ড।"

"তাতে কিছু এসে যায় না স্যার। লেজিটিমেট ইল্লেজিটিমেট সবারই সম্পত্তিতে সমান

অধিকার, যদি না সুজয় মিত্রের উইলে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কোনও বিশেষ ইনস্ট্রাকশন থাকে। মনে হয় না সেটা ছিল বলে স্যার। যাই হোক, আমার সন্দেহ হল অশোক যে সুজয় মিত্রের ছেলে, এটাই অশোককে জন হেক্টার জানিয়েছিলেন ফোনের মেসেজে এবং ইমেল-এ।"

"সেটা কেন করতে গেলেন? ওঁর কাছে তো কোনও প্রমাণই ছিল না অশোক সুজয় মিত্রের ছেলে বলে!" আমি প্রশ্ন তুললাম।

"কেন, এর উত্তর আমি দিতে পারবো না স্যার। মিস্টার হেক্টার দুয়ে দুয়ে এক করেছিলেন। অনুমান করছি ওঁর হিসেব অনুযায়ী কল্পনার সন্তান আর অশোকের প্রায় একই সময়ে জন্ম। মিসেস দুবে কল্পনার বাচ্চা হবার সময় দেখাশুনো করেন। কল্পনার সেই সন্তানের খবর কোথাও পাওয়া যায়নি। যেটা উনি জেনেছেন, মিসেস দুবের নিজের কোনও সন্তান হয়নি। ছোট্ট শিশু অশোক হঠাৎ করে দুবে পরিবারে চলে আসে, সন্তানের আদরে বড় হয়। এখন ওঁর দাবি ঠিক না ভুল, সেটা একমাত্র প্রমাণিত হবে ডিএনএ টেস্ট করে। তারজন্যে অশোককে সেই দাবি কোর্টে গিয়ে জানাতে হবে। একই সঙ্গে জন হেক্টার প্রমাণ দাখিল করবেন যে, বিষ্ণুমূর্তিটা কম্বোডিয়ার নয়, ত্রিচি থেকে চুরি করা বিষ্ণুমূর্তি। চোর হচ্ছেন প্রয়াত বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুজয় মিত্র। চিন্তা করুন স্যার, এর ন্যাশেনাল ইমপ্যাক্টটা!"

"মাই গড! তারপর?"

"মিস্টার সিং যখন খবর পেলেন জন বলে কেউ অশোকবাবুর সঙ্গে বিশেষ দরকারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, তখন প্রথমে হয়তো এমার্জেন্সি ভেবেই ইমেল-টা চেক করে দেখেন। হয় অশোকবাবুর পাসোয়ার্ড উনি জানতেন, অথবা ওঁর হোটেলের আই-টির স্টাফ দীনেশবাবুর সাহায্য নিয়ে সেটা বার করেন। ইমেলটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ডিলিটও করেন যাতে অশোকবাবু ব্যাপারটা জানতে না পারেন। পরে হয়তো অশোকবাবুর ভয়েস মেলটাও দীনেশবাবু বা কাউকে দিয়ে ডিলিট করান। কিন্তু মনে হয় তার আগেই ভয়েস মেল চেক করে অশোকবাবু খবরটা জেনে গিয়েছিলেন। ভয়েস মেল তো রিমোটলিও চেক করা যায়। অন্য কোনো ভাবেও জেনে থাকতে পারেন।"

"অনেক সম্ভাবনাই আছে, কল ফরওয়ার্ডিং, দীনেশবাবুর কাছ থেকে ফোন পেয়ে, ওদের হোটেলে অটোম্যাটিক ইমেল ফরওয়ার্ডিং অ্যালাও করলে," প্রমথ বলল।

"যাই হোক স্যার, খবরটা জেনে অশোকবাবু দু'জনকে ফোন করেন মিস্টার ক্যাসেল আর মিস সীমাকে। কাউকেই পান না। মিস সীমাকে দেওয়া মেসেজটা তো আমরা জানি 'আই হিট দ্য জ্যাকপট'। অশোকবাবু জানতেন, এত বড় খবর আর চাপা থাকবে না। বাবা-মা এতদিন কথাটা গোপন রাখলেও, উনি যে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড সেটা বিশ্বের সবাই জানবে। সুতরাং সীমাকে সুখবরটা না জানানোর এবং এতদিন কেন এরকম অদ্ভুত ব্যবহার সীমার সঙ্গে করছিলেন, সেটা না বলার কোনো কারণই থাকে না। মিস সীমাকে দেওয়া মেসেজের অন্য এক্সপ্লানেশনও হতে পারে, কিন্তু মিস্টার ক্যাসেলকে দেওয়া মেসেজ স্যার, একেবারে আন-অ্যাম্বিগুয়াস। সেটাই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট উদ্ধার করেছেন। মেসেজটা হল, 'এইমাত্র খবর পেলাম, আমি বিপাশার বৈমাত্রেয় ভাই। সুতরাং রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ফিফটি পার্সেন্ট আমার হবে। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে। ফোন কোরো।' এখন দেবরাজবাবু হ্যাড টু অ্যাক্ট ফাস্ট। মিস্টার হেক্টারের মতো ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারের খবর হালকা ভাবে নেওয়া যায় না। ইট মাস্ট বি ট্রু। তার মানে মিস্টার হেক্টারকে সরাতে হবে, সেই সঙ্গে অশোকবাবুকেও। এই সময়ে মিস্টার ক্যাসেল কিন্তু

দেবরাজবাবুর ফোকাসে নেই। উনি জানেনও না মিস্টার ক্যাসেল এ বিষয়ে কিছু জানেন বলে।”

“সরাতে হবে কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“সরাতে হবে টু প্রোটেক্ট বিপাশা মিত্র।”

“মেকস নো সেন্স,” প্রমথ বলল। “বিপাশা মিত্রের সম্পত্তির দাবিদার থাকলে দেবরাজ সিং-এর তাতে কী?”

“আপনি ভুলে গেছেন স্যার, দেবরাজবাবু ম্যাডাম বিপাশার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওঁর হোটেলের একটা বিরাট এক্সপ্যানশানের প্ল্যান করেছিলেন, সেগুলো তো সব লাটে উঠবে!”

“কেন লাটে উঠবে, অশোককে নিয়েও তো সেটা করা যেত,” আমি বললাম।

“আই ডাউট ইট স্যার, অশোকবাবুর ইন্টারেস্ট ছিল সোশ্যাল কজ-এ, এম্পায়ার বিল্ডিং-এ নয়। দেবরাজবাবু সেই চান্সটা নিতে চাননি।”

“এক্সপ্যানশনটা না হয় নাই হতো,” আমি বললাম।

“স্যার, যে ভদ্রলোক দশ বছরে একটা ছোটো হোটেল থেকে একটা হোটেল-সাম্রাজ্য বানিয়েছেন, তিনি কখনোই তাতে সন্তুষ্ট হতেন না। এছাড়া আমি নিশ্চিত দু'বছরের মধ্যে এত বড় এক্সপ্যানশানের জন্য বাজারে অনেক ধার দেনাও হয়েছে। থামতে চাইলেও থামাটা কঠিন স্যার, বিশেষ করে দেবরাজবাবুর মতো লোকের পক্ষে।”

“আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পারছি।”

“যা বলছিলাম স্যার, বিপাশা মিত্র ও দেবরাজের স্বার্থ এখানে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। দেবরাজের সঙ্গে বিপাশার একটা কুইক প্ল্যান হয়। অশোকবাবুকে সরাতে হবে। কাজটা দেবরাজবাবুই করবেন, ম্যাডাম বিপাশাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। ওঁকে শুধু পুলিশকে বলতে হবে, যে-রাতে অশোকবাবু খুন হন, সেদিন দেবরাজবাবু ওঁর সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ছিলেন। এতে দুজনেরই একটা অ্যালিবাই থাকে। কিন্তু অশোকবাবুর খুন হবার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খাড়া করা দরকার। যাতে খুনি ধরা না পড়লেও, টাকার জন্যেই তিনি খুন হয়েছেন, সেটা যেন মনে হয়। সেক্ষেত্রে মিস্টার সিং একেবারেই সন্দেহের উর্ধ্বে থাকেন। অশোকবাবু হাজার দশেক ডলার খুঁজছেন, সেটা মিস্টার সিং জানতেন। তখনই বিপাশা ম্যাডামের স্পেশাল ফটো শুদ্ধু খাম হারিয়েছে গল্পটা বানানো হয়, আর আমাদের খেলার পুতুল হিসেবে কাজে লাগান হয়।”

“সোজা স্ট্যাম্প চুরি গেছে বলাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না?” প্রমথ বলল। “বিপাশা মিত্র ফটো চুরির কাহিনি ফাঁদলেন কেন?”

“আমি বলব ওটা দেবরাজবাবুর আইডিয়া স্যার। ‘স্ট্যাম্প চুরি গেছে’ বড় সোজাসুজি হয়ে যেত, দেবরাজবাবু টুইস্ট, মানে একটু ধোঁকা দিতে ভালোবাসেন। মনে নেই ইন্দ্রবাবু প্রথম দিন কি বলেছিলেন? দেবরাজবাবু জানতেন ফটোকে পাশ কাটিয়ে আমরা স্ট্যাম্পের দিকেই এগোব, বলা যায় স্যার উনিই আমাদের একটু খেলিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবেন। আমরা তদন্ত করে সিদ্ধান্তে আসব, দামি স্ট্যাম্প কেড়ে নেবার জন্যে অশোকবাবুকে খুন করা হয়েছে। সেটা পুলিশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এখন অশোকবাবু মিস্টার হেক্টারের কাছ থেকে পাওয়া খবরটা দেবরাজবাবুকে জানিয়েছিলেন কিনা স্যার, সেটা জানা অসম্ভব। কিন্তু দেবরাজবাবু অশোকবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার অছিলায় খুন করেন। প্রায় একই সঙ্গে ওঁর পরিচিত সুপারি কিলার দিয়ে জন হেক্টারকে খুন করান। কারণ মিস্টার হেক্টার বেঁচে থাকলে দেবরাজবাবুর উপর অশোকবাবুকে খুন করার দায় বর্তাতে পারে।

তিনি অশোকবাবুকে যে-খবর জানিয়েছেন, সেটা দেবরাজবাবু যদি কোনমতে জেনে থাকেন, তাহলে অশোকবাবুকে খুন করার একটা মোটিভ ওঁর থেকে যায়। এরপরেই ইন্ডিয়াতে গিয়ে স্যার, দেবরাজবাবু একটু নাটক করেন কিশোরবাবুর কাকার সঙ্গে কী করে ওঁর হোটেলের সিকিউরিটি বাড়ানো যায় সেই নিয়ে।"

"আর ইউ শিওর অ্যাবাউট অল দিস? অশোক তো বব ক্যাসেলের ভয়েস মেল-এ জোক করেও সম্পত্তি পাবার কথাটা বলতে পারে! বন্ধুদের সঙ্গে আমরা মজা করি না!" আমার বিস্ময় এখনও কাটেনি।

"কাল রাত পর্যন্ত ছিলাম না স্যার, কিন্তু এখন 'ইয়েস'। মিস্টার ক্যাসেলের ভয়েস মেলের মেসেজকে অশোকের জোক বলে এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। অশোকের ই-মেল ডিলিট করা হলেও মিস্টার হেক্টারের ইমেল ডিলিটেড হয়নি। ওঁর সেন্ট ফোল্ডার থেকে অশোককে পাঠানো ই-মেলটা পাওয়া গেছে। সেটাই কাল রাতে আমায় ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জানালেন।"

"সবই বুঝলাম, কিন্তু তার থেকে দেবরাজ যে খুনি সেটা প্রমাণ হয় কী করে?"

"সেটাই একটু ট্রিকি স্যার। এখন পর্যন্ত যেটা জানি, সেটা হল দেবরাজবাবুর মোটিভ আছে এবং ওঁর কোনও অ্যালিবাই নেই। হি ওয়াজ ক্লেভার স্যার, ওঁর মোবাইল সুইচ-অফ করে রেখেছিলেন, যাতে করে মোবাইল টাওয়ারের ডেটাবেস থেকে পুলিশ বার না করতে পারে উনি কোথায় ছিলেন। সেইজন্যেই বব ক্যাসেল ওঁকে সেদিন রাতে মোবাইলে ধরতে পারেননি। বিপাশা ম্যাডামের সঙ্গে উনি সন্ধে থেকে মোটেই ছিলেন না। সাড়ে আটটা পর্যন্ত দেবরাজবাবু যে বিপাশা ম্যাডামের কাছে আসেননি, সেটাতো সতীশবাবুর কাছেই শুনলাম।"

"হোবোকেনে আটটায় কাউকে খুন করে ন'টার আগে বিপাশার কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়। প্রায় এক ঘণ্টার পথ।" আমি মন্তব্য করলাম।

"কিন্তু বব ক্যাসেল তো ডেড, বিপাশা যে সাড়ে আটটা পর্যন্ত একা ছিলেন, সেটা তো সতীশ কুমারের শোনা কথা, তিনি নিজে তো দেখেননি। এ ব্যাপারে আদালত প্রত্যক্ষদর্শী খোঁজে।" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।

"আর কেউ দেখেননি তা তো নয় স্যার, ক্লিনিং লেডি দেখেছিলেন। মনে নেই সতীশবাবু তাকে মিস্টার ক্যাসেলকে অফিস থেকে ডেকে আনতে বলেছিলেন। সেটা আমি স্টুয়ার্টসাহেবকে জানিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় তার স্টেটমেন্টও নেওয়া হয়ে গেছে।"

"সবই তো বললেন, বব ক্যাসেল মারা গেলেন কেন, সুইসাইড না খুন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দিস ইজ মাই স্পেকুলেশন স্যার, পুলিশ যখন মিস্টার ক্যাসেলকে জেরা করতে আসে, তার আগেই উনি অশোকবাবুর মেসেজটা পেয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাডাম বিপাশা সাড়ে আটটার সময় চিন্তিত ভাবে কারোর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, সেটা মিস্টার ক্যাসেল জানতেন। আর দেবরাজবাবুর অ্যালিবাই হচ্ছে ম্যাডাম বিপাশা, সেটাও তিনি কারো কাছ থেকে জেনেছিলেন। না জানার কারণ নেই স্যার, দেবরাজবাবু নিজেই তো সবাইকে বলে বেরিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই মিস্টার ক্যাসেল সন্দেহ করেন দেবরাজবাবু ও ম্যাডাম বিপাশা অশোকবাবুর খুনের সঙ্গে জড়িত। আমার মনে হয় সেইজন্যেই স্যার সেদিন একটু ঠাট্টার ছলে আমাদের বলেছিলেন, অ্যাডভান্স না নিয়ে ম্যাডাম বিপাশার কাজ না করতে, কারণ উনি বুঝতে পারছিলেন ম্যাডাম বিপাশা আর দেবরাজবাবু দুজনেই

হেডিং ফর ট্রাবল! যাই হোক, মোদ্দাকথা হল স্যার মিস্টার ক্যাসেল নাউ হ্যাস দ্য ট্রাম্প কার্ড। দেবরাজবাবুর অ্যালিবাই আর থাকে না, যদি মিস্টার ক্যাসেল পুলিশকে সত্যি কথাটা বলেন। উনি ঠিক করলেন এরই জোরে দেবরাজবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবেন। মায়ের অসুখের জন্যে মিস্টার ক্যাসেলের প্রচুর টাকার দরকার, সেটা একমাত্র এভাবেই পাওয়া সম্ভব। মিস্টার ক্যাসেল যখন ওই হাইরাইজ কনস্ট্রাকশন সাইটে যান, তখন দেবরাজবাবু সেখানে আসেন। হয়তো আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, ওখানে ওঁরা নিরিবিলিতে কথা বলবেন। দেবরাজবাবু কোনো চান্স নিতে চাননি, দুটো মার্ডারের বদলে তিনটে হলে তফাৎ আর এমন কী? ধাক্কা দিয়ে কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে কাউকে ফেলে দেওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।”

“দ্যাটস ইনসেইন,” আমি বললাম।

“হি ইজ নট এ সেইন ম্যান স্যার, হি ইজ ম্যাড এ ম্যাডম্যান। নইলে এমন কাজ কেউ করতে পারে?”

“কিন্তু ঐ স্ট্যাম্পের ব্যাপারটা কী, যেটা এড-এর লকারে পাওয়া গেছে।

“আমি শিওর স্যার, এড অ্যারেস্টেড হয়েছে শুনে দেবরাজবাবু নিজেই ওটাকে ওখানে রেখে দিয়েছিলেন। এক ঢিলে দু-পাখি মারা। অশোক খুনের রহস্যের সমাধান হল, নিজেও বেঁচে গেলেন।”

“কিন্তু উনি স্ট্যাম্পটা পেলেন কোত্থেকে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ইডিয়টের মতো কথা বলিস না,” প্রমথ বলল। পাঁচ হাজার ডলারের স্ট্যাম্প কেনা তো ওঁর কাছে ললিপপ কেনার মতো। সেটা কিনেই তো নিয়ে গিয়েছিলেন ফিলাটেলিস্ট কর্নারে।”

“আপনারা ভুলে গেছেন স্যার,” প্রথম দিনই বিপাশা ম্যাডাম বলেছিলেন, “দেবরাজ স্ট্যাম্প চেনেন। আমি ধরে নেব স্যার উনি স্ট্যাম্প একটু আধটু কালেক্ট করেন, নইলে বিপাশা ম্যাডাম কথাটা বলতেন না। যাইহোক, দেবরাজবাবুকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওঁর অফিস আর বাড়ি সার্চ করার ওয়ারেন্টও ইস্যু হয়েছে। হয়তো ইতিমধ্যে অশোককে যে হ্যান্ডগান দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেটাও পাওয়া যাবে। পুলিশ যে বিপাশা ম্যাডামকেও প্রশ্ন করার জন্যে এল, সেটা তো আমরা বেরোনোর সময়েই দেখলাম। কিন্তু আয়রনিটা কি জানেন স্যার?”

“কী?”

“কল্পনাদেবীর বাচ্চা জন্ম নিতে গিয়ে মারা যায়। তখনই বোধ হয় ওঁর মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়। এনিওয়ে, অশোকবাবু অ্যাডপ্টেড ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সুজয় মিত্রের ছেলে ছিলেন না।”

“এটা আবার কোত্থেকে জানলেন!”

“কাল তো আর মিস্টার দুবেদের ফোন করা হয়নি। আমার এক কলিগ এখন ত্রিচিতে পোস্টেড। তাঁকে ফোন করে ইনফর্মেশনটা জানতে চেয়েছিলাম। তিনিই মিস্টার দুবেদের কাছে খবরটা নিয়ে জানালেন। কিন্তু তারজন্যেই কী ঘটল দেখুন! আসলে স্যার, মানি করাপ্টস পিপল। দ্য এফেক্ট কুড বি ডেঞ্জারাস স্যার, ইফ এ ম্যাড ম্যান ইজ ইনভলভড।”

।। পরিশিষ্ট ।।

পরদিন ভোরে একেনবাবু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের ফোন পেয়ে আমাদের সুখবরটা দিলেন। দেবরাজ সিং অপরাধ স্বীকার করেছেন। যে সুপারি কিলার দিয়ে জন হেক্টারকে খুন করা হয়েছিল, সে ধরা পড়ায় দেবরাজ সিং-এর নাম বলে দিয়েছে। ইন্ডিয়ার জেলে পচা-র থেকে নিউ ইয়র্কের জেলে যাওয়াটাই বোধহয় দেবরাজবাবুর বেশি বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। বিপাশা মিত্রও অ্যারেস্টেড হয়েছেন। আপাতত ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে মিথ্যে অ্যালিবাই দিয়ে অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস। কিন্তু মনে হয় হত্যাকারীর সহযোগী হিসেবে আরও গুরুতর চার্জ পরে আনা হবে।

হাউসবোটে নিখোঁজ

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।।১।।

বেশ কিছুদিন আমি একেনবাবুর কীর্তিকলাপ নিয়ে কিছু লিখে উঠতে পারিনি। আমি লেখক নই। তরতর করে লেখা হাত থেকে বেরোয় না। কষ্টেসৃষ্টে যা লিখি, পরে সেটা পড়ে মনে হয় ছেলেমানুষী। তবে প্রমথ আমার লেখা নিয়ে যেরকম বিদ্রূপ করে, তত বাজে বোধহয় আমি লিখি না। প্রমথ আমার ছেলেবেলার বন্ধু নিউ ইয়র্কে আমরা একটা অ্যাপার্টেমেন্ট শেয়ার করি। অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় বাসিন্দা, যাঁর গুণকীর্তনের চেষ্টা আমি করি, সেই একেনবাবু কিন্তু সবসময়ে আমাকে উৎসাহ দেন, "স্যার, সকলে তো আর আগাথা ক্রিষ্টি বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারেন না, আর আপনি স্যার সাহিত্য লিখছেন না, লিখছেন ঘটনা।"

এ ব্যাপারে প্রমথর একটাই বক্তব্য, মুখে স্বীকার না করলেও একেনবাবু পাবলিসিটি চান, শুধু অজিত বা হেস্টিংস-এর মতো ওঁর কোনও লিপিকার নেই অক্ষম আমিই একমাত্র ভরসা।

ম্যানহাটানে মুণ্ডুহীন ধর বলে একটা লেখা শুরু করেছিলাম, কিন্তু দু'মাসে দেড়পাতাও এগোল না। তারই মধ্যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে স্যাবাটিক্যাল নিয়ে এক বছরের জন্য কলকাতায় চলে এলাম। আমার মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। আর আমিও নিউ ইয়র্কে একটু হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। চলে এসে অবশ্য নিউ ইয়র্কের কিছু কিছু জিনিস মিস করছিলাম, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক টাইমস, স্টারবাক্স-এর কফি, হাগেনডস-এর আইসক্রিম, আর ভিলেজ, অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আশেপাশের রাস্তাঘাট-দোকানপাট। কিন্তু সেটা কয়েক সপ্তাহ মাত্র। তারপর দেখলাম দেশের চিনি-লেবু মেশানো চা কিংবা কামধেনুর মিষ্টির কাছে স্টারবাক্সের কফিই বলুন বা হাগেনডসের আইসক্রিমই বলুন, কোনওটাই দাঁড়াতে পারবে না। যেমন পারবে না প্রমথর রান্না আমার মায়ের রান্নার কাছে। দেশের শাকসব্জি বা মাছের অমন স্বাদ নিউ ইয়র্কে মিলবে কী করে? নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর অবশ্য বিকল্প নেই। কিন্তু কলকাতার বাংলা দৈনিকগুলোর একটা আলাদা স্বাদ আছে। গরম গরম খবর দিয়ে তথ্যের দিক থেকে না পারলেও, রস-কথনে নিউ ইয়র্কের যে কোনও পত্রিকাকে টেক্কা দিতে পারে। মোটকথা নিউ ইয়র্ককে বলতে গেলে প্রায় ভুলেই গেলাম।

কলকাতায় আসার মাস দুয়েকের মধ্যে বাসস্থান নিয়ে একটা সমস্যা হল। আমাদের বাড়িটা বহুদিনের পুরোনো, ঠাকুরদার আমলে তৈরি। আজ ছাত থেকে জল পড়ছে, কাল দেয়ালের পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, পরশু মর্চে-ধরা স্ক্রু ভেঙ্গে জানলার কবজা খুলে আসছে একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। তার ওপর মা একলা এত বড় বাড়িতে থাকেন নিরাপত্তার দিক থেকেও সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। এইসব ভেবে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রমোটারদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এবার এসে দেখলাম প্ল্যানট্যান সব অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে। চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হবে। আমরা পাব দুটো বড় ফ্ল্যাট। তবে সেটা কমপ্লিট হতে সাত-আটমাস লেগে যাবে। ওই সময়টা আমাদের অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। প্রমোটার ভদ্রলোকই একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে দিলেন গড়িয়ার কাছাকাছি। অ্যাপার্টমেন্টটা নতুন, আমাদের প্রোমোটারই তৈরি করেছেন। বাড়ির বেশির ভাগ জিনিসপত্র গুদামজাত করে অল্প কিছু জিনিস নিয়ে আমি আর মা সেখানে এসে উঠলাম।

গড়িয়ার এই অঞ্চলটার সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচিতি নেই। অত্যন্ত সরু রাস্তা, কাঁচা ড্রেনগুলোকে সবে পাকা করা শুরু হয়েছে। জাম্বো সাইজের মশায় জায়গাটা অধ্যুষিত। অল্প জমির উপর গায়ে গায়ে লাগানো সব বাড়ি, যার অনেকগুলো ভেঙ্গে এখন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং হয়ে গেছে। বেশির ভাগ জমিই বোধহয় জবরদখলি ছিল। সেইজন্য রাস্তাঘাটের ব্যাপারে কোনও প্ল্যানিং নেই, এঁকেবেঁকে নানান দিকে ছড়িয়ে আছে। সাইকেল রিকশার ক্ষেত্রে তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু এখন সেখানে ট্যাক্সি আর প্রাইভেট গাড়ি চলে। দু'দিক থেকে গাড়ি এলেই সর্বনাশ! বেশ কিছুক্ষণ কসরত এবং দুই ড্রাইভারের মধ্যে বিস্তর আলোচনার পর গাড়ি পাস করতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে সাউথ এন্ড পার্কের সুন্দর পাড়া ছেড়ে এখানে এসে থাকাটা খুবই পীড়াদায়ক।

আমাদের প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। বিজয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী থাকেন আমাদের উলটো দিকের ফ্ল্যাটে। বিজয়বাবুর বয়স বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। মেদবহুল শ্যামবর্ণ দেহ। চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। ভদ্রলোক কথা খরচা করতে ভালোবাসেন না। আর একটা মুদ্রাদোষ আছে, কথায় কথায় 'ওর নাম গে' বলার। প্রথমদিন আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওর নাম গে, থ্রি সি-তে?"

ঝট করে প্রশ্নটা ধরতে পারিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে আবার বললেন, "থ্রি সি-তে তো?"

এবার বুঝলাম অ্যাপার্টমেন্ট থ্রি-সি-তে এসেছি কিনা জানতে চাইছেন। বললাম, "হ্যাঁ।"

"ব্যাচেলার?"

প্রশ্নের পারম্পর্য বুঝলাম না, তাও উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।"

"একা?"

ইচ্ছে হল বলি, 'তাতে আপনার কী মশাই?' কিন্তু নতুন জায়গায় এসে প্রথমেই প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হল না। বললাম, "না, মায়ের সঙ্গে থাকি।"

"বেশ। ওর নাম গে, আসি," বলে ভদ্রলোক হনহন করে চলে গেলেন।

ভেরি স্ট্রেঞ্জম্যান।

বিজয়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হল, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাবার্তায় সপ্রতিভ, সুন্দরী না হলেও চেহারায় একটা অলগা শ্রী আছে। বোঝা যায় বয়সে

বিজয়বাবুর চেয়ে অনেক ছোটো, নাম দীপা। ছেলেপুলে নেই, স্বামী-স্ত্রীর সংসার। বিজয়বাবুর পেশাটাও জানা গেল ওঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। নেতাজি সুভাষ রোডের উপরে পুরোনো বাণ্টি সিনেমার কাছে বিজয়বাবুর একটা ওষুধের দোকান আছে।

দীপা চলে যাবার মা বললেন, যখন বলে গেল মেয়েটা, ওই দোকান থেকেই আমার ওষুধপত্র কিনিস।

আরও দুয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু না হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এ বাড়ি ছেড়ে গেলে এদের কারোর সঙ্গেই যোগাযোগ থাকবে না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাকে আমার ভালো লাগল, সে হল বারীন। লম্বা, ফরসা, চোখে গোল্ড রিমের চশমা। ব্যাকব্রাশ করা বেশ লম্বা চুল। মুখটা খুবই সুন্দর, কেবল নাকটা একটু থ্যাবড়া। ওইটিই চেহারায় বেমানান। প্রায় আমারই বয়সি। কোনও একটা ইন্সিওরেন্স এজেন্সিতে কাজ করছে। সেটা শুনে আমার সতর্ক ভাব দেখে বারীন আশ্বস্ত করল, "চিন্তা নেই ব্রাদার, আপনাকে পলিসি কিনতে বলব না। সবাইকে ক্লায়েন্ট বানালে, বন্ধু পাব কোথায়?" বলে হা হা করে হাসল কিছুক্ষণ।

কথাটা শুনে লজ্জা পেলাম। মুখে বললাম, "না, না আমি মোটেই তা ভাবছিলাম না।"

উত্তরে বারীনের মুচকি হাসি দেখে বুঝলাম ধরা ঠিকই পড়েছি।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সম্পর্ক তুমি-তে এসে দাঁড়াল। বারীন আমার কলেজের বন্ধু অনিমেষকে খুবই ভালো চেনে। অনিমেষ পালিত স্ট্রিটের যে বাড়িতে থাকে, সেটা যে বারীনের পৈত্রিক বাড়ি সেটা অবশ্য প্রথমে জানতে পারিনি। আসলে বছর পাঁচেক আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়িতে আর পা দেবে না বলে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর বারীন আর ওমুখো হয়নি। দু'বছর আগে বাবা মারা গেলেন। বারীন নিজে ওখানে যাবে না, তাই মা-কে দেখভাল করার জন্য বন্ধু অনিমেষকে ওখানে গিয়ে থাকতে অনুরোধ করে। এখন অবশ্য মা-ও নেই। তবে শেষদিন পর্যন্ত অনিমেষ বারীনের অসুস্থ মা-কে দেখাশুনো করেছে। অনিমেষ ছাড়াও আরও দুয়েকটা কানেকশন বেরিয়ে গেল।

কথাচ্ছলে বারীন বলল, "আমি তোমাকে পলিসি বেচলুম না বটে, কিন্তু দীপাবউদি হয়তো বেচে দেবেন, সতর্ক থেকো।"

"দীপাবউদিও ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট নাকি?"

"এই কিছুদিন হল হয়েছে। এখন আমরা ফিয়ার্স কম্পিটিটর। এই যে তোমার সঙ্গে আড্ডা মারছি, দীপাবউদি নিশ্চয় ভাবছে, তোমাকে কবজা করার চেষ্টা করছি।"

আমি বললাম, "তাহলে তো ভালোই হল, আমাকে ইন্সিওরেন্স বেচতে এলে বলে দেব, তুমি অলরেডি কিনিয়ে দিয়েছ।"

"ওরে বাবা, ওটি কোরো না, তাহলে আমার লাইফ হেল করে দেবে।" বলে বারীন আবার হা হা করে হাসলো।

বিজয়বাবুদের সঙ্গে বারীনের খুবই বন্ধুত্ব, সেটা অবশ্য ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম। মাঝেমাঝেই সন্ধ্যাবেলায় বিজয়বাবুদের বাড়ি থেকে হই-হুল্লোড়ের আওয়াজ আসে, তাতে বারীনের গলাও পাওয়া যায়। এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় বারীন এসে বলল, "এই বাপি, কী করছ?"

"বই পড়ছিলাম, কেন বল তো?"

"তাহলে এসো।"

"কোথায়?"

"বিজয়দার বাড়িতে। তুমি নিউ ইয়র্কে থাক শুনে শেখরদা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।"

"শেখরদা কে?"

"আমার বহুদিনের চেনাজানা। ওঁর ছোটো শালা নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে। যেই বললাম তুমি ওখানে পড়াও, শেখরদা আর শীলা দুজনেই চেপে ধরল, এক্ষুনি আলাপ করিয়ে দাও। সুতরাং দেরি নয়, এসো আমার সঙ্গে।"

ওর ব্যস্ততা দেখে আমি হেসে ফেললাম, "তা আসছি, কিন্তু ছেলেটি যখন নিউ ইয়র্কে যাবে, আমি তো তখন এখানে?"

"হু কেয়ার্স! আর কিছু না হোক, আড্ডা তো হবে!"

বুঝলাম, এটা একটা ছুতো, আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাবার অজুহাত খুঁজছে বারীন।

খানিকবাদে বিজয়বাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলাম কয়েকটি অপরিচিত মুখ। বারীনের শেখরদা বেশ দিলখোলা লোক। আমাদের থেকে বয়সে খুব একটা বড় নন। কিন্তু হাবেভাবে মনে হয় জ্যাঠামশাই! আপনি ফাপনি নয়, সোজা তুমি দিয়েই শুরু করলেন। তারপর বললেন, "কী চটলে নাকি?"

"কেন বলুন তো?"

"এই যে 'তুমি' বলছি।"

আমি হেসে বললাম, "আমি আপত্তি করলে আপনি শুনবেন?"

"শুনতে চেষ্টা করব, তবে মাঝে মাঝে ভুল হবে। আসলে এখানে আপনি বলার মতো রয়েছে শুধু বিজয়দা। তাও বিয়ের ব্যাপারে আমি বিজয়দার থেকে সিনিয়র, বুঝলে? আমাদের বিয়ে হয়েছে এইটিন ইয়ার্স। দাঁড়াও দাঁড়াও, সেখান থেকে আবার শীলার বয়স হিসেব করার চেষ্টা কোরো না, বিয়ের সময় শীলার বয়স ছিল মাত্র ষোলো। তারপর চোখ টিপে বললেন, বিয়েটা বে-আইনী বুঝতেই পারছ।"

"ক্রেডল স্ন্যাচার!"

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। ঘরের কোণে জিনস আর হালকা-সবুজ টপ পরা একটা মেয়ে বই মুখে দিয়ে বসেছিল। বেশ মিষ্টি চেহারা। বড় বড় চোখ, ঘন কোঁকড়া চুল, গাঢ় করে লিপস্টিক মাখায় ঠোঁটটা একটু পুরু লাগছে। বয়স ষোলো-সতেরোর মধ্যেই হবে। মন্তব্য করেই আবার বইয়ে চোখ রাখল।

শেখরদা আমাকে বললেন, "আমার মেয়ে, ভাস্বতী।"

আমি হাতটা একটু তুলে 'হ্যালো' বললাম।

"হ্যালো," অত্যন্ত দায়সারা ভাবে উত্তর দিয়ে মেয়েটা আবার বইয়ে মুখ গুঁজল।

এই বয়সে বাবা-মায়ের বন্ধুদের পার্টিতে কেউ উৎফুল্ল হয়ে আসবে আশা করি না। কিন্তু ভাস্বতীকে মনে হল একটু বেশি চুপচাপ। যতক্ষণ ছিলাম বই মুখে দিয়ে বসে রইল। যে বইটা পড়ছিল, সেটা আমারও আছে। অক্সফোর্ড প্রেস-এর এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইণ্ডিয়ান সিনেমা, পাঁচ-ছশো পাতার একটা বিশাল বই। নিশ্চয় সিনেমার পোকা। সেই সূত্র ধরেই বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, তারপর হাল ছেড়ে দিলাম। ও-ও বোধহয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বারীন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভাস্বতী এখন এ জগতে নেই। সিনেমা ভালোবাসে বলে কী কুক্ষণে ক'দিন আগে বইটা ওর জন্মদিনে দিয়েছিলাম!"

বইটা সস্তা নয়। হার্ড কভারের এই বইটা আমিই সেল-এ প্রায় ৫০ ডলার দিয়ে কিনেছিলাম। এখানেও নিশ্চয় কয়েক হাজার টাকা দাম হবে। ইন্সিওরেন্স বেচে বারীন মনে হয় ভালোই টু-পাইস কামাচ্ছে।

"উপহারটা তো ভালোই দিয়েছ।"

"যা বলেছ। শীলা এখন আমাকে শাসাচ্ছে। আগে যদিও বা দুয়েকটা কথাবার্তা বলত, এখন বইটা মুখেই পড়ে থাকে।

ভাস্বতীর মা শীলা অবশ্য তার উলটো। শেখরদার মতোই হইচই করতে ভালোবাসে। "আমিও কিন্তু তোমাকে আপনি, টাপনি বলতে পারব না, যতই প্রফেসর হও।" প্রথমেই ঘোষণা করল শীলা। "আর তুমিও আপনি আজ্ঞে করবে না, নাম ধরে ডাকবে। এই শর্ত যদি মানতে না পারো, তাহলে আর কথা বোলো না।"

এর পর আর আপনি বলা যায় কী করে?

চেহারার দিকে থেকে শেখরদা আর শীলা দু'জনেই মডেল হবার উপযুক্ত। শীলার দুয়েকটা ছবি, মনে হল বিজ্ঞাপনে বোধহয় দেখেওছি। একটু আমতা আমতা করে কথাটা জিজ্ঞেসই করে ফেললাম।

শীলা শেখরদাকে দেখিয়ে বলল, "ওকে বলো না, আজেবাজে মেয়েদের ছবি না দিয়ে বউয়ের ছবি দিতে!"

"শেখরদা একটা অ্যাড-এজেন্সিতে কাজ করেন," বারীন বলল।

শীলাকে কেন দেখেছি মনে হচ্ছিল পরে অবশ্য বুঝলাম। একটা বাংলা চ্যানেলে শীলা মাঝে মাঝে খবর পড়ে।

আড্ডাকে জমিয়ে তোলার জন্য খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজনও দেখলাম প্রচুর। গরম গরম শিঙাড়া, মিটরোল, আর চিকেন টিক্কার পাশে সাজানো রয়েছে হুইস্কি, আর রামের বোতল।

পানীয়-সেবন আগে থেকেই চলছে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গ্লাস।

দীপাবউদি বললেন, "দেশের হুইস্কি আপনার কেমন লাগবে জানি না। ট্রাই করতে পারেন। ফ্রিজে বিয়ারও আছে। কী দেব আপনাকে?"

যেটা খেতে ইচ্ছা করছিল সেটা হল গরম শিঙাড়ার সঙ্গে চা। কিন্তু গৃহকর্ত্রীকে তার জন্য বিব্রত করতে চাইলাম না।

"না, আমার কিছু লাগবে না।"

শীলা আমার দিকে কটাক্ষ হেনে বলল, "গুডবয়, মদ্যপান কর না ঠিক?"

"তা ঠিক নয়, আজ ইচ্ছে করছে না।"

"তাহলে কোল্ড ড্রিংক নাও।"

টেবিলের এক কোণে কয়েকটা সফট ড্রিংক-এর বোতল ছিল, আগে নজরে পড়েনি। শীলাকে সন্তুষ্ট করতেই তার থেকে একটা তুলে নিলাম।

শেখরদা দেখলাম হুইস্কির বোতল আর বরফের পাত্রটা নিয়ে শীলা আর দীপাবউদির গ্লাস দুটো ভর্তি করছেন। নিজের পাত্রে বরফের থেকে হুইস্কিই ঢাললেন বেশি। বারীন

রেফ্রিজারেটর থেকে একটা বিয়ারের বোতল বার করে এনে বিজয়বাবু আর নিজের জন্য দুটো গ্লাসে ঢালল।

"আবার তোমরা ড্রিংকস মিক্স করছ?" দীপাবউদি বারীন আর বিজয়বাবুকে ধমকের সুরে বললেন।

"সরি ম্যাডাম," মুচকি হেসে বাঁ-হাতে দীপাবউদির কোমর জড়িয়ে ডান হাতে নিজের গ্লাসটা তুলে বারীন বলল, "চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স।"

"বাপি, শিঙাড়াটা খান," দীপাবউদি বললেন। "গোপালের শিঙাড়া। ফুলকপির এমন শিঙাড়া আমেরিকাতে পাবেন না।"

খেয়ে দেখলাম সত্যিই চমৎকার! আমেরিকা কেন, কলকাতাতেও এমন খাইনি।

"দীপাবউদিকে ক্রেডিট দিও না। দোকানটা আমার আবিষ্কার।" বারীন বলল।

মিটরোল আর চিকেন টিক্কার স্বাদও মনে রাখার মতো।

খেতে খেতেই বললাম, "নাঃ, এই জায়গাটা সম্পর্কে আমার ধারণাটা পালটাতে হচ্ছে।"

বিজয়বাবু আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। "ওর নাম গে, তার মানে?" এই প্রথম উনি মুখ খুললেন।

"মানে এখানে এসে মশার কামড়ে এত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম, যে ভালো দিকগুলো চোখে পড়েনি। যেমন, এইরকম খাবার।"

"শুধু খাবার, আমরা বুঝি বাদ?" শীলা হুইস্কির গ্লাসটা গালের পাশে ধরে মধুর হেসে আমার দিকে তাকাল।

বারীন শীলার পাশে বসেছিল। কানে কানে কিছু বলাতে শীলা ব্লাশ করল। কী বলল জানি না, আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

শীলা হঠাৎ উঠে এসে আমার কনুইটা ছুঁয়ে বলল, "পালিও না, আমি এক্ষুনি আসছি।" বলে পাশের ঘরে অদৃশ্য হল।

বিজয়বাবু শীলার শূন্য চেয়ারে বসে বারীনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর নাম গে, প্রমোটারের সঙ্গে তোমার ডিল ফাইনাল? ক'টা ফ্ল্যাট পাচ্ছো?"

"দুটো। কিন্তু আপনারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। আমি কোত্থাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকব আর আপনাদের জ্বালাব।"

"বেশ তো, জ্বালাও না।"

"কোম্পানি, বুঝলে বাপি কোম্পানি সেটাই হল মোস্ট ক্রিটিক্যাল।" শেখরদা একটু ঢুলু ঢুলু চোখে বললেন, মনের মতো লোক না থাকলে, আড্ডা দেওয়া যায় না। আর আড্ডাই জীবন।"

নেশাটা ধীরে ধীরে সবারই চড়ছে।

বারীন ইতিমধ্যে ভাস্বতীর পাশে ধপ্ করে বসে কী একটা বলতে গেল।

"গো অ্যাওয়ে।" মাছি তাড়ানোর মতো করে ভাস্বতী বারীনকে তাড়াল। মেয়েটা ডেফিনেটলি অবনক্সাস।

দীপাবউদি আমার পাশে বসেছিলেন। তিনিও লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। নীচু গলায় আমাকে বললেন, "শীলা একদম বোঝে না, এতদিন ধরে মেয়েটাকে বাড়িতে রেখে বাইরে বাইরে পার্টি করে বেড়িয়েছে, এখন হঠাৎ সঙ্গে এনে নজরদারি করতে চাইলে মানবে কেন?"

আমি এঁদের কাউকেই তেমন চিনি না, সুতরাং চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে হল।

শীলা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। “এই, তুমি এদিকে একটু এসো,” বলে আমার হাত ধরে প্রায় টেনে আমায় জানলার পাশে নিয়ে গিয়ে কাজের কথাটা পাড়ল। ওর ভাই নেক্সট উইকেই নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে। আমি প্রমথর ফোন নম্বর দিলাম যোগাযোগ করার জন্য। প্রমথকে ওর ভাইয়ের যাবার কথাটা জানিয়ে দেব সেটাও বললাম।

“ভুলে যাবে না তো? আমি কিন্তু তোমায় ফোন করব।”

“ভুলব কেন!”

“তাও যদি ফোন করি?

“নিশ্চয় করবে, কী আশ্চর্য!”

“বেশি গায়ে পড়া ভাববে না তো?”

আমি হাসলাম।

শুনতে পেলাম শেখরদা বারীনকে ডাকছেন, “এই বারীন, কোথায় তুমি?”

বারীন একটু দূরে, বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বলছিল। আমরা যেখানে সেখান থেকে বাথরুমের দরজা একটুখানি দেখা যায়। শেখরদা যেখানে সেখান থেকে কিছুই যায় না। ওখানে দাঁড়িয়েই বারীন উত্তর দিল, “আসছি, বলুন।”

“আমাদের বোট-এ আর জায়গা নেই? বাপিকে আসতে বল না?”

“কেষ্টবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে।”

আমি শেখরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী ব্যাপার?”

ইতিমধ্যে বারীন বসার ঘরে ফিরে এসেছে। বারীনই উত্তর দিল, “এই শনিবার একটা হাউসবোট ভাড়া করেছি দু’দিনের জন্য। গঙ্গায় বেড়াব শুধু আমরা। ইন্টারেস্টেড? তাহলে দেখব আরেকটা জায়গা ম্যানেজ করা যায় কিনা। অবশ্য নো গ্যারান্টি।”

“এখানে হাউসবোট ভাড়া পাওয়া যায়?” আমি একটু অবাক হলাম।

“আগে যেত না, এখন যায়। কেরল থেকে বেশ কয়েকটা এসেছে। চমৎকার বোটগুলো। যাবে কিনা বল?”

“ইচ্ছে খুবই করছে, কিন্তু এ যাত্রায় হবে না। মাকে নিয়ে এক জায়গায় যাবার কথা আছে।”

“তাহলে তো আর হল না। কিন্তু পরের বার কোনও অজুহাত চলবে না।”

।। ২ ।।

মা’কে সাত দিনের জন্য বাণীপুরে মাসির বাড়িতে রেখে সোমবার ট্রেন ধরে ফিরছি। সকাল সকাল বলে ট্রেনটা একটু ফাঁকা। হাত-পা ছড়িয়ে পত্রিকা উলটোতে উলটোতে একটা ছোট্ট খবর চোখে পড়ল।

প্রমোদতরি থেকে নিখোঁজ

গঙ্গায় হাউসবোটে বেড়ানোর সময়ে সতেরো বছরের একটি

মেয়ে অদৃশ্য হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

খবর বলতে এইটুকুই। প্রথমে এ নিয়ে কিছু ভাবিই নি। হঠাৎ মনে পড়ল, বারীনরা তো ওই সময়ে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিল! মেয়েটা কি ভাস্বতী হতে পারে? অশুভ চিন্তা একবার পেয়ে বসলে যেতে চায় না। সেটা দূর করার জন্যেই বারীনকে ফোনে ধরার চেষ্টা করলাম। ফোনটা সুইচড অফ। বাকি পথটা কিছুটা উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটল। বাড়িতে পৌঁছলাম সাড়ে ন'টা নাগাদ। বারীনের অ্যাপার্টমেন্টে দেখলাম তালা ঝুলছে। সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছি, বিজয়বাবু নামছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, একটা ঝড় বয়ে গেছে ওঁর উপর।

আমাকে দেখে দোতালার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ালেন। "ওর নাম গে, শুনেছেন তো?"

আমার মুখ দিয়ে ফট করে বেরিয়ে গেলো, "ভাস্বতী?"

"নেই। নিখোঁজ!"

"নিখোঁজ মানে?"

বিজয়বাবুর তাড়া ছিল, দোকান খুলতে যাচ্ছেন। যেটুকু জানলাম, সেটা হল শনিবার রাত সাড়ে বারোটার একটু আগেও লঞ্চের পেছনে বসে মেয়েটা বই পড়ছিল। তার একটু পরেই বিজয়বাবু যখন সেখানে যান, ওর কোনও চিহ্ন নেই। ভ্যানিশড!

অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু বিজয়বাবু আর দাঁড়াতে পারলেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, "দীপাবউদি বাড়িতে আছেন?"

উনি নামতে নামতে বললেন, "ওর নাম গে, ও আর বারীন একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম-এ তিন দিনের জন্য দুর্গাপুর গেছে।"

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম। ভাস্বতীর মুখটা বারবার চোখে ভাসছিল। অল্পক্ষণের জন্যেই ওকে দেখেছি, তাও মুখটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল। শীলা আর শেখর-দা নিশ্চয় ডিভাস্টেটেড। মনে পড়লো শীলাকে কথা দিয়েছিলাম, প্রমথকে ওর ভাইয়ের কথাটা জানাব। এই মুহূর্তে দ্যাট মাস্ট বি লাস্ট থিং ইন হার মাইন্ড। তবু প্রমথকে ফোন করলাম। কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো বোধ করব। প্রমথ নেই, ফোন ধরলেন একেনবাবু।

"কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো নেই।"

"কেন স্যার?"

"আমার চেনা একটি মেয়ে গঙ্গায় বেড়ানোর সময়ে হাউসবোট থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে।"

একেনবাবু আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলেন না। "কতদূরে গিয়েছিল বোটটা সমুদ্রের কাছাকাছি?"

"আরে না, বোটের কিছু হয় নি। শুধু মেয়েটা বোট থেকে অদৃশ্য হয়েছে।"

"কী করে?"

"গড নোজ। হয়তো সুইসাইড। অন্য সম্ভাবনা হল খুন, যদি না অ্যাকসিডেন্টালি জলে পড়ে গিয়ে থাকে।"

"সবই সম্ভব স্যার, যদি মনে করেন শি ইজ ডেড।"

"তার মানে?"

মানে স্যার, নিখোঁজ তো অন্য কারণেও হওয়া সম্ভব। হয়তো কোনও লোকের সঙ্গে মেয়েটা পালিয়েছে।"

"হাউ ইজ ইট পসিবল, গঙ্গার মাঝখানে?"

"কখন অদৃশ্য হয়েছে স্যার?"

"মাঝরাতে।"

"বোটটা চলছিল?"

জানি না, তবে অত রাতে বোধহয় নয়।"

"আগে থেকেই হয়তো প্ল্যান করা ছিল স্যার। হাউসবোটে কেউ এসে নৌকো লাগিয়েছে, তাতে উঠেই মেয়েটা চলে গেছে।"

"পালাতে চাইলে তো মেয়েটা বাড়ি থেকেও পালাতে পারত! মাঝগঙ্গা থেকে এত কষ্ট করে পালানোর মানেটা কী?"

"গুড পয়েন্ট স্যার। তবে কিনা এক্ষেত্রে পুলিশ আর হয়তো তেমন খোঁজ খবর করবে না। বডি না পাওয়া গেলে ধরে নেবে জলে ভেসে গেছে।"

এই অ্যাঙ্গেল থেকে অবশ্য আমি ভাবিনি।

"কিন্তু এই ভাবে তো মেয়েটাকে একা পেয়ে কেউ অ্যাবডাক্টও করতে পারে!"

"তাও পারে স্যার।"

"তাহলে তো আরেকটা পসিবিলিটি বাড়ল?"

"তা বাড়ল স্যার।"

ভেরি ট্রাবলিং... আর যদি মার্ডার হয়, তাহলে ওই হাউসবোটে যারা ছিল তাদেরই কেউ নিশ্চয় করেছে। সবাই চেনাজানার মধ্যে।"

"এখনই এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন স্যার, পুলিশ নিশ্চয় ইনভেস্টিগেট করছে।"

"ধরে নিচ্ছি করছে। আপনার তো সব চেনাজানা লোক, একটু খোঁজ করবেন?"

একেনবাবু এককালে কলকাতা পুলিশে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। এখন অবশ্য নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ক্রিমিনোলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত, গেস্ট লেকচারার। সাইডে কিছু কিছু গোয়েন্দাগিরি করেন। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও বেশ ভালো যোগাযোগ আছে।

"আপনি যখন এত দুর্ভাবনা করছেন স্যার, তখন খোঁজ নেব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। ভালো কথা, প্রমথকে বলবেন আমাকে ফোন করতে। একটি ছেলে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়, একটু যেন দেখে।"

"ছেলেটি কে স্যার?"

"যে মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তার মামা।"

"আমাকে নামটা দিয়ে দিন। দরকার হয় আমি দেখব।"

নামটা দিয়ে বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ, আপনি ব্যস্ত মানুষ।"

"কী যে বলেন স্যার, কলকাতার ছেলে, তাকে একটু দেখতে পারব না?"

স্নানটান সেরে রেডি হয়ে বেরোতে বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গেল। অফিসের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক নিতাইবাবুর ফোন পেলাম।

"আপনি কি আজ আসছেন?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"আপনার জন্য এক ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।"

"আমার জন্য! কে?"

"বললেন তো আপনার বন্ধু, অনিমেষ দত্ত।"

"আমার ঘরে বসান, আমি পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব। কিন্তু বলে দেবেন দুটোর সময় আমার সেমিনার আছে, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না।"

গতবার এসে অনিমেষের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। অনিমেষের মামার বাড়ি আমাদের পুরোনো পাড়ায়। মাঝেমাঝেই ও সেখানে আসত। ছেলেটা পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট ছিল, গানও ভালো গাইত। কিন্তু এম.এসসি পড়তে পড়তেই রাজনীতিতে এমন মাতল, পড়াশুনো উঠল মাথায়। কোনওমতে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাশ করে কিছুদিন এদিক ওদিক করে এখন একটা স্কুলে ফিজিক্স পড়াচ্ছে। টাকাকড়ির অবশ্য অভাব নেই। স্কুলের মাইনের থেকে অনেক বেশি আয় টিউশানিতে। বাড়ির ছাদে একটা বড় ঘর ছিল। সেখানে গ্যালারির মতো চেয়ার বসিয়ে একসঙ্গে কুড়িজনকে পড়ায়! তার সঙ্গে তুলনা করলে আমার নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির দুটো গ্র্যাজুয়েট ক্লাসেও বারোজনের বেশি ছাত্র জোটে না।

ঘরে ঢুকে দেখি অনিমেষ বসে আছে। মুখ দেখেই বোঝা যায় বেশ চিন্তিত।

"কীরে, তুই? কেমন আছিস?"

"নট শিওর, তোর একটু সাহায্যের দরকার।"

"কী ব্যাপার?"

"কালকে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিস তো?"

"কালকের দুর্ঘটনা!" আমি চট করে ধরতে পারলাম না। তারপরেই খেয়াল হল অনিমেষ বারীনের বন্ধু। "তুই কি ভাস্বতীর...।"

আমায় কথাটা শেষ করতে দিল না অনিমেষ। বলল, "আমিও ছিলাম ওদের সঙ্গে।"

"মাই গড, কী হয়েছিল বল তো?"

"অ্যাবসোলুটলি স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। রাত সাড়ে বারোটার একটু আগেও ভাস্বতী ডেকে বসেছিল। তার অল্প কিছুক্ষণ বাদে বিজয়দা গিয়ে ওকে দেখতে পাননি। তবে ও যে বোটে নেই সেটা জানতে পারা যায় প্রায় ভোর চারটের সময়ে, যখন শেখরদা মেয়েকে ঘরে না দেখে বাইরে আসেন। খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে আমাদের সবাইকে ডেকে তোলেন।"

"দাঁড়া দাঁড়া, অত রাত্রে মেয়েটা ওখানে একাই বসেছিল?"

"হ্যাঁ, আমরা সামনের ডেকে গল্পগুজব করছিলাম। কিছুক্ষণ ও আমাদের সঙ্গে ছিল, একটা কোণে বই নিয়ে বসেছিল। তারপর একসময়ে উঠে পেছনের ডেকে চলে যায়।"

"কখন?"

"বলতে পারব না, খেয়াল করিনি।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? বারীনদের পার্টিতে যা হয়, অজস্র মদ্যপান আর ঢলাঢলি। গিয়েছিলাম নিতান্ত বারীনের চাপে পড়ে। আমি ওদের মতো মদও গিলতে পারি না, আর তোকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, শীলা আর ওর মেয়েকে আমি একটু এড়িয়েই চলি।

কথাটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তাই বোধহয় বলেই অনিমেষ একটু লজ্জা পেল। আই মিন ড্রিংক করলে শীলা বড্ড গায়ে এসে পড়ে। খারাপ কিছু নয়, শুধু আমার অস্বস্তি হয়।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু ভাস্বতী কী দোষ করল?"

"আমি ওকে মাস দুই প্রাইভেট পড়িয়েছিলাম। ওর একটু ইয়ে আছে।"

"তার মানে?"

"মানে পড়াশুনোর থেকে ছেলেদের দিকেই ওর বেশি ইন্টারেস্ট। আমার সঙ্গেও ফাজলামির চেষ্টা করত। একবার তো একটা বাজে ক্যারেক্টারের সঙ্গে... যাই হোক, ওটা শোনা কথা।"

ওসব নোংরামি নিয়ে আর প্রশ্ন বাড়াতে চাইলাম না। "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে কী সাহায্য চাইছিস?"

"সেটাই বলছি। ভাস্বতীকে লঞ্চে শেষ দেখি আমি আর বারীন। তারপর থেকে ও অদৃশ্য। পুলিশের যে কর্তাটি তদন্ত করছেন, তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমরা ওঁর কাছে অনেক কিছু লুকোচ্ছি। বারবার একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক জেরা করার পরে বলেছেন, আমরা যেন ওঁকে না জানিয়ে কোথাও না যাই। বারীনকে পারমিশন দিয়েছেন ট্রেনিং প্রোগ্রামে যেতে, কিন্তু আমার কলকাতার বাইরে যাওয়া বারণ।"

"কিন্তু পুলিশ তো এইভাবেই তদন্ত করে। তুই ক্লিন, তুই এত চিন্তা করছিস কেন। আর তুই একা তো নোস, বারীনও তো ছিল।"

"তুই বুঝছিস না। পুলিশ কেয়ার লেস অ্যাবাউট সলভিং দ্য কেস। কিন্তু এই ফাঁকে আমাদের ভয় দেখিয়ে যদি টু-পাইস কামাতে পারে, তারই ধান্ধায় আছে।"

"তুই বলছিস ক্লিন চিট পেতে তোকে পয়সা দিতে হবে?"

"ঠিক ধরেছিস।"

"মাই গড! কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করতে পারি? তুই তো জানিস এখানে আমার কোনও কানেকশন নেই, আমি সাধারণ একজন প্রফেসর।"

আমার ভয় হচ্ছিল অনিমেষ পাঁচ-দশ হাজার ডলার চেয়ে বসবে। এর আগেও অন্য একটা ব্যাপারে ধার চেয়েছিল। সেবার কোনও মতে কাটিয়েছিলাম।

"তোর বন্ধু একেনবাবুর সাহায্য চাই। আমি শিওর হি উইল ফিগার আউট ঠিক কী হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখানকার পুলিশের উঁচু মহলে ওঁর সুনাম আছে। উনি ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করছেন জানলে খুদে অফিসাররা এইভাবে হ্যারাস করতে পারবে না।"

"একেনবাবুর সঙ্গে আজ সকালে আমার কথা হয়েছে। কিন্তু...।"

"কিন্তু না ভাই, তোকে এটা করতেই হবে। একেনবাবুর প্রাপ্য ফি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু ভাস্বতীর কী ঘটেছে, তা আমরা সবাই জানতে চাই। একটা সম্মান-দক্ষিণা নিশ্চয় সবাই মিলে আমরা দেব।"

"তা না হয় দিবি, কিন্তু উনি তো এখানে নেই। অত দূরে বসে কী করতে পারেন?"

"তাও তুই ওঁকে বল। উনি যা জানতে চান, সব আমরা জানাব। তুই ওঁর হয়ে আমাদের প্রশ্ন কর।"

"আচ্ছা দেখি, এখন তো নিউ ইয়র্কে রাত। আজ রাতে ধরার চেষ্টা করব।"

"কখন ফোন করবি?"

"ধর আটটা নাগাদ। ওখানে তো এখন ডে-লাইট সেভিংস চলছে, তার মানে নিউ

ইয়র্কে তখন সকাল সাড়ে দশটা... কথা বলার ভালো সময়।"

"'ডে-লাইট সেভিংস' কী?"

"এক ঘণ্টা সময় এগিয়ে দেওয়া। ওটা নিয়ে ভাবিস না।"

"তাহলে আমি ঠিক আটটার সময়ে তোর বাড়িতে আসব। তুই তো বারীনের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আছিস, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ওখানেই যেতাম, কিন্তু মনে হল এখানেই তোকে সহজে ধরতে পারব।"

দুটো প্রায় বাজে। আমি ঘড়ি দেখছি দেখে অনিমেষ নিজেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল, "ওই যাঃ, তোর সেমিনারে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন চলি, রাতে দেখা হবে।"

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমি একেনবাবুকে স্কাইপে ধরলাম। স্কাইপ-এর সঙ্গে হয়তো সবাই পরিচিত নন। এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার। যাদের কম্পিউটারে ক্যামেরা আর ব্রডব্যান্ড কানেকশন আছে, তারা এটা ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে নিজেদের মধ্যে ভিডিওতে কথা বলতে পারে।

আমি সংক্ষেপে অনিমেষের পরিচয় দিলাম। তারপর ওর সঙ্গে সকালে যা কথা হয়েছে সংক্ষেপে বলে ওর অনুরোধটা জানালাম। একেনবাবুকে অবশ্য সংক্ষেপে কিছু বলা কঠিন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "আপনার বিশেষ বন্ধু স্যার?"

"বিশেষ না হলেও বন্ধু তো বটেই।"

"আপনি স্যার কী বলেন?"

"আমি আর কী বলব?"

একেনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি যদি সঙ্গে থাকেন, আমি আছি স্যার।"

পেছন থেকে শুনি প্রমথ টিপ্পনী কাটছে, "বাপিকে অ্যাসিস্টেন্ট বানিয়ে লং ডিস্টেন্স ডিটেকটিভগিরি করবেন, আপনার সাহস আছে বটে।"

আমি বললাম, "লুকিয়ে লুকিয়ে কমেন্ট করছিস কেন, সামনে এসে কর।"

প্রমথ গলা বাড়িয়ে ক্যামেরার সামনে মুখটা এনে বলল, "গো টু হেল!"

বলেই আমাকে কোনও উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে অদৃশ্য হল। টিপিক্যাল প্রমথ।

আমি একেনবাবুকে বললাম, "আটটার সময় অনিমেষ এখানে আসবে। আপনি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন?"

"নিশ্চয় স্যার। তার আগে, আপনি এদের সবার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বলুন।"

আমি পার্টিতে সবার সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকে শুরু করে যা যা মনে পড়ল সবকিছুই বললাম।

"ইন্টারেস্টিং গ্রুপ," একেনবাবু মন্তব্য করলেন। তারপর বললেন, "যাই বলুন স্যার, আপনার গড়িয়ার লাইফটা তো মনে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের থেকে অনেক বেশি এক্সাইটিং।"

"তা যা বলেছেন। এরকম হ্যাজার্ডাস ড্রিঙ্কিং এই ধরণের মধ্যবিত্ত পাড়ায় দেখব কল্পনা করিনি। পুরুষ-মহিলা কেউই কম যান না।"

"আপনি মনে হচ্ছে স্যার একটু ডিসগাস্টেড?"

"তা ঠিক নয়, তবে এ ধরণের পার্টি ইজ ব্যাড ফর মাই স্টমাক এন্ড হার্ট।"

কথা বলতে বলতে দেখি আটটা বেজে দশ হয়ে গেছে। বললাম, "বুঝছি না অনিমেষের কি হল, আটটার সময় আসার কথা।"

ঠিক এমন সময়ে ডোর বেল। দরজা খুলে দেখি অনিমেষ।

"দেরি করলি যে?"

"দেরি কোথায়?"

আমারই বোঝা উচিত ছিল। কলকাতায় টাইম মাফিক কেউ চলে না। যাই হোক, আমি বাইরের ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে অনিমেষের সঙ্গে কম্পিউটারের সামনে বসলাম। অনিমেষ তো স্কাইপ দেখে মুগ্ধ। মনিটরে একেনবাবুর মুখ দেখে বলল, "এ তো টেলিভিশনের সামনে বসে আছি!"

আমি একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

অনিমেষ ওর বিপদের কথা বিশদ করে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একেনবাবু বললেন, "আমি সব শুনেছি স্যার। আমার যেটুকু করার আমি করব। কিন্তু তার আগে আমায় পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে।"

"আমাকে স্যার বলবেন না। নাম ধরেই ডাকবেন।"

"ওটা আমার হ্যাবিট স্যার।"

অনিমেষকে আমি বললাম, "তুই ওটা পালটাতে পারবি না, এখন উনি যা জানতে চাচ্ছেন বল।"

"বলুন, কী জানতে চান?"

"আমি স্যার সব কিছুই জানতে চাই... যা যা ঘটেছে, দরকারি অদরকারি সবকিছু।"

অনিমেষ একটু ভেবে শুরু করল। হপ্তাতিন আগে আমার বন্ধু বারীন, বাপি ওকে চেনে, এসে বলল যে, ওরা দু'দিনের জন্য বোট-পার্টি করছে। দু'হাজার টাকা লাগবে, খাওয়া থাকা সবকিছু ঐ টাকার মধ্যেই। তবে ড্রিংকস আলাদা। কিন্তু সেটার জন্য আমায় ভাবতে হবে না। আমি আসব কি না। আমি প্রথমে যেতে চাইনি। দু'দিনের জন্য দু'হাজার টাকা খরচ করতে গা খচখচ করছিল। তাছাড়া যে গ্রুপটা যাচ্ছে, তাদের সবার সঙ্গে আমার খুব বনেও না। কিন্তু বারীন এত জোরাজুরি করল যে, 'না' বলতে পারলাম না। যাই হোক, পরশুদিন, অর্থাৎ শনিবার সকালে আমরা হাউসবোটে উঠি।"

"কত বড় হাউসবোট স্যার?"

"ছোটো নয়, বেশ বড়ই।"

"একটু ডেসক্রিপশন দিন স্যার। ক'টা কেবিন, কতটা জায়গা..."

"গেস্টদের জন্য পাশাপাশি তিনটে বড় কেবিন, সবগুলোতেই অ্যাটাচড বাথরুম।"

"দাঁড়ান স্যার, পাশাপাশি মানে কী? অ্যালং না অ্যাক্রস?"

"অ্যালং। মানে বলতে চাচ্ছি, বোটের লম্বা দিক ধরে সারি করে তিনটে কেবিন।"

"এবার বুঝেছি স্যার।"

"বোটের সামনে একটা বড় ডেক। সেখানে খাবার আর বসার জায়গা। রান্নাবান্না করার কিচেন গেস্ট কেবিনগুলোর পেছনে। কিচেনের একদিকে ব্যাটারি আর জেনারেটরের ছাউনি, অন্যদিকে বোটের লোকেদের থাকার জায়গা। বোটের একদম পেছনে একটা ছোটো ডেক, সেখানেও কয়েকজন বসতে পারে। সামনে আর পেছনের ডেকে যাবার জন্য কেবিনগুলোর দু'পাশ দিয়ে ছোটো দুটো প্যাসেজ।"

"থ্যাঙ্ক ইউ সার। তারপর?"

"আমাদের পার্টিতে ছিল মোট সাত জন। আমি, বারীন, শেখরদা, বিজয়দা, গীতাবউদি, শীলা, আর ভাস্বতী। ভাস্বতী শীলা আর শেখরদার মেয়ে, যে নিখোঁজ হয়েছে।"

"হ্যাঁ স্যার, ওঁদের পরিচয় আমি বাপিবাবুর কাছে পেয়েছি। তিনটে কেবিন বললেন, আপনারা কে কোথায় ছিলেন?"

"একেবারে পেছনের কেবিনে আমি আর বারীন, মাঝের কেবিনে দীপাবউদি আর বিজয়দা, সামনের কেবিনে শীলা, শেখর-দা আর ভাস্বতী।"

"ঠিক আছে স্যার। বোটে আর কারা ছিলেন?"

বোটের পাইলট কেষ্টবাবু ছিলেন। মিডল-এজড ম্যান, বারীনের পরিচিত। শুনেছি বি.এ. পাশ করা বড়লোকের ছেলে। বাপের টাকাকড়ি খুইয়ে এখন এই ব্যাবসায় নেমেছেন। আর ছিল উনিশ কুড়ি বছরের একটা ছেলে, নাম মন্টু। একটু বোকাসোকা। ওর কাজ রান্না করা, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা আর গেস্টদের জন্য অন্যান্য খিদমত খাটা।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, বলতে থাকুন।"

"গঙ্গাবক্ষে বিহার মানে গঙ্গাবক্ষে বিহারই। কোথাও নামার কথা ছিল না। প্রোগ্রাম ছিল শনিবার সকাল ন'টায় রওনা দিয়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে কোথাও নোঙর করে দাঁড়ানো। সেখানে রাত্রিটা কাটিয়ে রবিবার বিকেলে কলকাতায় ফিরে আসা। আমি প্রথমে না আসতে চাইলেও খুবই এনজয় করছিলাম সারাটা দিন। মন্টু রান্না খারাপ করে না। আর কেষ্টবাবুও বেশ মজাদার লোক। সামনের ডেক যেখানে শেষ হয়েছে, বোটের একদম মুখে পাইলটের জায়গা। সেখানে বসে বোট চালাতে চালাতে নানান গল্পে আমাদের মাতিয়ে রাখছিলেন। সন্ধেতে ঠিক কোথায় আমরা নোঙর করলাম বলতে পারব না, তবে গঙ্গা সেখানে বেশ চওড়া। দূরে একটা ঘাট দেখা যাচ্ছিল, কয়েকজন সেখানে স্নানটান করছিল মনে আছে। দুপুরে প্রচুর খেয়েছিলাম সবাই। রাত্রে খাবারের থেকে পানীয়ের আয়োজনটাই ছিল বেশি। বোট নোঙর করা হয়ে গেছে। আজকের মতো কেষ্টবাবুর পাইলটিং-এর কাজ শেষ। নিজের ঘরে যাবার আগে কেষ্টবাবু ঘোষণা করলেন, রাত ন'টার সময়ে জেনেরেটার বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার আগেই যেন রাতের খাওয়া খেয়ে নিই।

'তারমানে? এখানে আলো থাকবে না?' আমরা সবাই হইহই করে উঠলাম।

'তা নয়, আলো থাকবে, হ্যারিকেনের আলো। ন'টার একটু আগে মন্টু এসে কয়েকটা হ্যারিকেন রেখে যাবে। সেগুলোও মন্টু এসে ঠিক সাড়ে বারোটার সময়ে নিয়ে যাবে।'

শেখরদা সেটা শুনে প্রতিবাদ করলেন, 'এ আবার কী নিয়ম? ডেকে সাড়ে বারোটার পর থাকতে পারব না?'

'তা পারবেন না কেন? কিন্তু আলো থাকবে না।'

বারীনও বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, সেটা হয় না। মহিলারা আছেন, একটা হ্যারিকেন অন্ততঃ জ্বলুক।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মন্টুকে বলে দেব একটা হ্যারিকেন রেখে দেবে।'

'আর ঘরের আলো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেষ্টবাবু বললেন, 'ঘরের কমজোরি আলো সবসময়েই থাকবে, ওটা ব্যাটারিতে চলে।'"

"আমি একটু কনফিসড স্যার," একেনবাবু অনিমেষের কথার মাঝখানেই বললেন,

"হ্যারিকেন তো নিভিয়ে দিলেই হয়, সেগুলো তুলে নিয়ে যাবার কারণটা কী?"

"কেষ্টবাবু চলে যাবার পর সেটা নিয়েই আমাদের মধ্যে একটু আলোচনা হল। বারীন বলল, 'হয়তো চুরি হয়ে যাবে বলে।'

'মাঝগঙ্গায় কে হ্যারিকেন চুরি করতে আসবে? হোয়াট ননসেন্স!' শেখরদা বললেন।

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' দীপাবউদি বললেন, 'জায়গাটা সেফ তো?'

'খুবই নিরাপদ,' বারীন সবাইকে আশ্বস্ত করল। 'কেষ্টবাবু দু'বছর ধরে এই ব্যাবসা করছেন, কোনও সমস্যা হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

"যাইহোক রাতের খাওয়াটা গৌণ। খাওয়া দাওয়ার পর পানীয়ের আসর বসল। শেখরদা আর বারীন গান ধরল। আমিও দুয়েকটা গান গাইলাম। ন'টা বাজার ঠিক কয়েক মিনিট আগে মন্টু এসে চারটে হ্যারিকেন রেখে গেল। কেষ্টবাবু আমাদের গুডনাইট বলতে এলেন।

বারীন কেষ্টবাবুকে বলল, 'আপনিও বসুন না, আমাদের সঙ্গে?'

'না, আমি যাই।' বুঝলাম সংকোচ বোধ করছেন।

'খালি হাতে যাবেন কেন,' বারীন একটা গ্লাসে মদ ঢেলে কেষ্টবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যান।'

কেষ্টবাবু সেটা নিতেও অস্বস্তি বোধ করছেন দেখে বারীন বলল, 'আরে মশাই, আপনি তো আর মদ খেয়ে বোট চালাচ্ছেন ন। অফ ডিউটিতে খাচ্ছেন। কালকে যখন চালাবেন, এক ফোঁটা অ্যালকোহলও থাকবে না শরীরে।'

তাতেই কাজ হল, গ্লাসটা হাতে নিয়ে 'গুডনাইট' বলে কেষ্টবাবু বিদায় নিলেন। এর কয়েক মিনিট বাদেই আলো নিভে গেল।

তখন বোধহয় শীলার খেয়াল হল, ভাস্বতী নেই। 'ভাস্বতী কোথায়?'

ভাস্বতী পেছনের ডেকে চলে গেছে অনেক আগেই। আমি মধ্যে একবার বাথরুমে গিয়েছিলাম। ফেরার সময়ে দেখেছিলাম ও পেছনের ডেকে বসে বই পড়ছে। আমায় দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। ভাস্বতীকে আমি একটু এড়িয়েই চলি। কিন্তু ডাকলে তো আর না গিয়ে পারা যায় না।"

"আমি একটু কনফিউসড স্যার," একেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "কেন আপনি মিস ভাস্বতীকে এড়িয়ে চলেন?"

"আসলে"... অনিমেষ একটু আমতা আমতা করল। মনে হল যে নিখোঁজ বা মৃত, তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে অসুবিধা বোধ করছে। "আই মিন ও একটু গায়ে পড়া... আর কিছু নয়।"

"আই সি, তারপর?"

"আমি কাছে যেতেই ও বলল, 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।' ও আপনি টাপনির ধার ধারে না, প্রায় সবাইকেই তুমি করে বলে।

'কী সারপ্রাইজ?'

'এখানে বলা যাবে না, তোমার বন্ধু রাগ করবে। পরে তোমার বাড়ি গিয়ে বলব।'"

"দাঁড়ান স্যার, 'আপনার বন্ধু' বলতে কাকে মেয়েটি মিন করেছিল?"

"বোধহয় বারীন, কিন্তু নাম করে বলেনি।"

"বন্ধুটি কে, আপনি জিজ্ঞেস করেননি স্যার?"

"না, সত্যি কথা বলতে কি, আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিল ওর চোখেমুখে একটা কিছু ছিল, যেটা আমার ভালো লাগেনি।"

"কী ছিল স্যার?"

"ঠিক বলতে পারব না। আসলে ও খুব মুডি আর আনপ্রেডিক্টেবল। মনে হচ্ছিল হঠাৎ কিছু বলে বসবে বা করে ফেলবে, যার জন্য আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ব। আমি আর ওখানে দাঁড়াইনি।"

"মিস ভাস্বতী কি ড্রিংক করছিল স্যার?"

"মনে হয় না। মদের বোতলগুলো সব সামনের ডেকে ছিল। এমনিতে ও ড্রিংক করে বলে তো শুনিনি।"

"যেটা আমায় বললেন, সেটা কি আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"না। এটা কি খুব রেলেভেন্ট?"

"হু নোজ স্যার! ভালো কথা, মিস ভাস্বতীকে আপনি কতদিন চেনেন?"

"তা প্রায় এক বছর হবে। বারীন একদিন এসে বলল, ওর পরিচিত একটি মেয়ে স্কুলে ভীষণ বাজে রেজাল্ট করছে। ফাইনাল ইয়ার, কিন্তু টিউটর ছুটিতে। আমি যদি এই সময়টাতে একটু পড়িয়ে দিই। বারীন বিশেষ করে বলাতে ওকে মাস দুই প্রাইভেট পড়িয়েছিলাম। সেই থেকে ওর বাবা-মা শেখরদা আর শীলার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়।"

"ঠিক আছে, বলুন স্যার।"

"আমি শীলাকে বললাম, একটু আগেই পেছনে ডেকে দেখলাম বই পড়ছে।

শীলা বলল, 'বুঝেছি, বারীনের সেই সিনেমার বই। কী উপহারই যে মেয়েটাকে দিয়েছে!'

'দাঁড়াও আমি একবার দেখে আসি,' বলে শেখরদা উঠে পিছনে গেলেন। খানিক বাদেই ফিরে এসে বললেন, 'ঠিকই বলেছে অনিমেষ, ডেকে বসে বই পড়ছে।'

শীলা অবাক হয়ে বলল, 'হ্যারিকেনের আলোয়?'

শেখরদা উত্তর দিলেন, 'মেয়েকে তো চেনো।'

ও, একটা কথা কথা বলতে ভুলে গেছি, সেদিন পূর্ণিমা ছিল। হ্যারিকেনের আলো না থাকলেও আমাদের চলাফেরাতে তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না।"

এ পর্যন্ত বলে, অনিমেষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি কি বেশি ডিটেল-এ বলছি?"

"এতটুকু না স্যার, প্লিজ বলুন।"

"তারপর সবারই নেশা চড়তে শুরু করেছে। বারটেন্ডার হচ্ছে বারীন। মজার ব্যাপার, আমি যে বেশি মদ খেয়েছি তা নয়। কিন্তু নিজেকে একটু জানি আনস্টেডি লাগতে শুরু করেছে। ইনফ্যাক্ট শেখরদাও বললেন, 'বারীন, এটা এই বোটের গুণ না চাঁদের আলো জানি না, কিন্তু আজ এক গেলাসেই দু'গেলাসের নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে!'

বারীন ফাজলামি করল, 'কেন, আমার হাতের জাদু বলছেন না কেন?'

'তাও বলছি,' শেখরদা হাসতে হাসতে বললেন।

শীলা একটু 'হাই' হয়ে গেলে কী যে করে ঠিক ঠিকানা নেই। হঠাৎ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওর সঙ্গে গাইতে হবে।

'কী গান?'

'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ!'

বললাম 'সব কথা আমার মনে নেই।'

‘মনে না থাকলে বানাও... তাই দিয়েই আমার সঙ্গে গাও। না গাইলে তোমাকে আজ ছাড়ব না।’ বলে আরও টাইট করে আমায় জড়িয়ে ধরল।

যে রেটে বারীন সবাইকে মদ গিলিয়েছে, বেশ বুঝতে পারছিলাম নিজের উপর কন্ট্রোল হারিয়েছি। আমিও শীলাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। শীলা কানে কানে বলল, ‘গাওয়ার পরও যদি না ছাড়ি?’ এর পর ঠিক কী ঘটেছিল পরিষ্কার করে বলতে পারব না। শুধু মনে পড়ছে গাইতে গিয়ে দুজনেই কথা ভুলে যাচ্ছিলাম, যা খুশি তাই লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। দীপাবউদি গানের মাঝখানেই বলে উঠলেন, ‘শীলা, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস, এবার ঘরে যা।’

এরপর যেটা মনে আছে, বারীন আমার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। বারীনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী রে আউট হয়ে গিয়েছি?’

‘তা একটু গিয়েছিস। এখন কেমন বোধ করছিস?’

‘আমি ঠিক আছি। ওরা সবাই কোথায়?’

‘যে যার ঘরে, এখানে শুধু তুই আর আমি।’

‘ক’টা বাজে?’

‘অনেক রাত। চল, ঘরে চল।’ বলে আমাকে ধরে বারীন তুলল।

আমি ঘড়িতে দেখলাম বারোটা কুড়ি। ‘ছাড়, আমি নিজেই হাঁটতে পারব।’

কেবিনের দরজার সামনে যখন এসেছি বারীন বলল, ‘দাঁড়া, ভাস্বতী কি এখনও পিছনে বসে আছে?’

একটু সরে উঁকি দিয়ে দেখলাম ঠিক তাই। বারীন তখন এগিয়ে গিয়ে ভাস্বতীকে কী যেন বলল। ভাস্বতী মাথা নাড়ল।

‘ওকে এক্ষুনি ঘরে যেতে বললাম,’ বারীন বলল। ‘সবাই শুয়ে পড়েছে। এভাবে একা একা বসে থাকা সেফ নয়।’

‘আমি ঘরে যাচ্ছি, আর দাঁড়াতে পারছি না,’ বলতে বলতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম, বারীন চট করে ধরে ফেলল। তারপর আমাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। পেটটা ভীষণ গোলাচ্ছিল, এত খারাপ আগে কখনও বোধ করিনি। ‘আজ মরেই যাব রে,’ বারীনকে বললাম।

‘অত সহজে মরবি না,’ বারীন অভয় দিলো, ‘গা গোলাচ্ছে?’

‘ভীষণ।’

‘বাথরুমে যা, বমি করলে একটু ভালো লাগবে।’

বেশ খানিক্ষণ বমি করার পর চোখে মুখে জল দিয়ে যখন ফিরলাম, তখন একটু ভালো ফিল করছি। দেখলাম বারীনের হাতে একটা ফেনাচ্ছল গ্লাস।

‘এটা খেয়ে দেখতে পারিস, একটু রিলিফ পাবি।’

‘দে,’ বলে ঢক ঢক করে খেলাম। বারীনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হ্যাঁ রে, আমি বেশি মাতলামো করিনি তো?’

বারীন বলল, ‘তা একটু করেছিস, শীলাও করেছে। বাট ইট ইজ অ্যামং ফ্রেন্ডস, কেউ মাইন্ড করেনি।’

‘কী করেছি বল তো?’

‘এখন শোনার দরকার নেই, ঘুমো।’

‘না, বল।’

‘শুনে লাভটা কী হবে, যা হয়েছে তা হয়েছে। আর বলছি তো সবাই জানে যে তোরা

একটু বেশি আউট হয়ে গিয়েছিলি। আউট তো অল্পবিস্তর আমরা সবাই হয়েছিলাম। মদ খাব অথচ নেশা হবে না, তাহলে আর মদ খাওয়া কেন!'

এইরকম আরও কিছু কথা হয়তো হয়েছিল, আমার এখন মনে নেই। শুধু মনে আছে, বারীন যখন বলল, 'চোখ বোজ, ঘরের বাতি নেভাচ্ছি,' তখন ঠিক সাড়ে বারোটা।''

''আপনি শিওর স্যার?''

''হ্যাঁ, ঘুমোতে যাবার সময় আলো নেভার আগে আমি সব সময়ে ঘড়ি দেখি, ওটা আমার বরাবরের অভ্যাস।''

''আই সি, স্যার, তারপর?''

''তারপর যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর প্রায় চারটে। দরজায় ভীষণ ধাক্কা। সবাই উদ্ভ্রান্ত, ভাস্বতীকে পাওয়া যাচ্ছে না! এটাই হল ঘটনা।''

''ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, আপনার কথায় যা বুঝলাম, সাড়ে বারোটার একটু আগেও মিস ভাস্বতী ডেকে বসেছিলেন। ঠিক?''

''হ্যাঁ। আর সাড়ে বারোটার পরে ওকে দেখতে পাওয়া যায়নি। বিজয়দা সাড়ে বারোটা নাগাদ পেছনের ডেকে গিয়েছিলেন, তখন ভাস্বতী ছিল না। প্রায় একই সময়ে মন্টুও হ্যারিকেন নিতে পেছনের ডেকে যায়। বিজয়দার সঙ্গে ওর দেখাও হয়।''

''আমি একটু কনফিউসড স্যার, বিজয়বাবু ওখানে কেন গিয়েছিলেন?''

''বিজয়দার কাছে যা শুনেছি, ওঁরও গা গোলাচ্ছিল। কেবিনের বদ্ধ বাতাসে দম আটকে আসছিল, ঘুমোতে পারছিলেন না। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে কীসের আওয়াজ দেখতে প্রথমে সামনের ডেকে যান। সেখানে কিছু দেখতে না পেয়ে পেছনের ডেকে আসেন।''

''বিজয়দা ওখানে আগে গিয়েছিলেন, না মন্টু?''

''তা বলতে পারব না, বোধহয় প্রায় একই সময়ে।''

''কী ধরণের আওয়াজ বিজয়বাবু শুনেছিলেন?''

''ধপ করে একটা আওয়াজ আর জলে কিছু পড়ার শব্দ। আর সেই সঙ্গে পায়ের আওয়াজ। মন্টু তখন হ্যারিকেনগুলো নিয়ে হাঁটছিল, সুতরাং পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।''

''আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?''

''না, তখন বোধহয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।''

''বারীনবাবু?''

''বারীনও শোনেনি। ও-ও ঘুমোচ্ছিল।''

''বিজয়বাবুর সঙ্গে কি কথা বলা যাবে?'' আমায় জিজ্ঞেস করলেন, একেনবাবু।''

''এখুনি ওঁকে পাব না। দোকান বন্ধ করে আসতে আসতে ওঁর ন'টা বেজে যায়। উনি এলেই ধরার চেষ্টা করব। আপনি বাড়িতে থাকবেন?''

''থাকব স্যার।''বলে অনিমেষের উদ্দেশ্যে বললেন, ''আর কিছু মনে পড়ছে স্যার ভাস্বতীর ব্যাপারে?''

''ও হ্যাঁ, একটা কথা। জানি না কতটা রেলেভেন্ট। ভাস্বতীকে কেউ কিছুদিন ধরে খুব উত্ত্যক্ত করছিল।''

''উত্ত্যক্ত বলতে?''

''লোকটি ভাস্বতীকে বিয়ে করতে চায়। না বললে শুনবে না, না চাইলেও ওর হাতেই ভাস্বতীকে ধরা দিতে হবে, ওর সন্তানের মা হতে হবে... এইসব আজেবাজে কথা।''

"লোকটি কে?"

"তা বলতে পারব না। তবে বারীনকে ও বলেছিল। বারীনের কাছ থেকেই কথাটা শুনেছি।"

"মিস ভাস্বতী মা-বাবাকে এটা জানায়নি?

"না। বারীনের ধারণা ভাস্বতী এ কথা বাড়িতে বললে শীলা ওকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। এমনিতেই শীলা সবসময়ে চোখে চোখে রাখে।"

"আই সি স্যার, তার মানে ধরে নিচ্ছি বারীনবাবুও জানাননি।"

"না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে বারীন একটা অ্যাকশন নিয়েছিল। তবে সেটা কী, ঠিক জানি না।"

"ইন্টারেস্টিং, পুলিশ এ কথা জানে?"

"বারীন নিশ্চয় বলেছে। তবে পুলিশ আমাদের কারোর কথাই খুব বিশ্বাস করছে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তদন্ত করছেন কে?"

"মলয় রায় বলে একজন ইনস্পেক্টর। আপনি চেনেন?"

"মনে করতে পারছি না। তবে খোঁজ নেব।"

"কাইন্ডলি একটু খোঁজ করুন। মনে হচ্ছে ওঁর হাত থেকে আমরা সহজে ছাড়া পাব না। কালকে আবার সকাল ন'টায় আমায় হাজিরা দিতে হবে।"

অনিমেষ চলে যাবার খানিকবাদেই পাশের অ্যাপার্টমেন্টে তালা খোলার আওয়াজ এল। অর্থাৎ, বিজয়বাবু ফিরেছেন। গিয়ে ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুললেন। খুবই ক্লান্তশ্রান্ত, কিন্তু তাও মনে হল একেনবাবুর কথাটা ওঁকে জানাই। আমার কাছে সব শুনে বললেন, পুলিশ ওঁকেও হ্যারাস করছে।

আমি বললাম, "আপনি কি এখন একটু আসতে পারবেন? একেনবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"ওর নাম গে, ফোনে?"

"ঠিক ফোনে নয়। আসুন না, দেখতে পাবেন।"

"চলুন।"

আমি ওঁকে কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে আবার স্কাইপে একেনবাবুকে ধরলাম। একেনবাবুর মুখ মনিটরে দেখতে পেয়ে বিজয়বাবু বললেন, "ওর নাম গে, এত ম্যাজিক!"

বিজয়বাবু সম্পর্কে আমি আগেই একেনবাবুকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। স্বল্পভাষী, বেশি কোনও বর্ণনা আশা করবেন না। একেনবাবু গুটিকতক প্রশ্নই করলেন। তাতে অনিমেষ যা বলেছিল, সেটাই কনফার্মড হল। নতুন যা জানলাম, তা হল শীলা আর শেখর-দা শুতে চলে যাবার একটু পরেই পৌনে বারোটা নাগাদ বিজয়বাবুরা নিজেদের ঘরে যান। দীপাবউদি ঘরে ঢোকার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েন, বিজয়বাবু মিনিট পাঁচেক বাদে। সোয়া বারোটা নাগাদ ওঁর ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। শরীরটা ভালো লাগছিল না, বিছানাতে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন। খানিক বাদে একটা ধপ আওয়াজ শোনেন আর জলে কিছু পড়ার শব্দ। পায়ের আওয়াজও পান।

এছাড়া অন্য কোনও শব্দ বা আওয়াজ উনি শোনেননি। এমনিতে উনি বেরোতেন না। কিন্তু ছোট্ট কেবিনের মধ্যে এত দমবন্ধ লাগছিল... বাইরের বাতাসে একটু ভালো বোধ করবেন ভেবে বেরিয়েছিলেন। বেরিয়ে অবশ্য কিছু চোখে পড়েনি। মন্টু হ্যারিকেন নিয়ে

সামনের ডেক থেকে আসছিল, বুঝলেন ওর পায়ের আওয়াজই শুনেছিলেন। সময়টা সাড়ে বারোটার কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক হয়তো হবে, নিজে ঘড়ি মিলিয়ে দেখেননি। তবে মন্টুর সাড়ে বারোটার সময় হ্যারিকেন নিয়ে যাবার কথা ছিল, তাই ধরে নিচ্ছেন সাড়ে বারোটাই হবে। জলের আওয়াজটা সম্ভবত কোনও বড় মাছের ঘাইয়ের আওয়াজ, সেটাই তখন মনে হয়েছিল।

বিজয়বাবুর কথা শেষ হতেই একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "একটা প্রশ্ন স্যার, আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে কোনদিকে গিয়েছিলেন, সামনের ডেকে না পেছনের ডেকে?"

"পেছনের।"

"সামনের ডেকে নয় কেন স্যার, ওদিকটাই তো খোলামেলা বেশি ছিল?"

"ওর নাম গে, অত ভেবে কোথাও যাইনি। মন্টু পেছনের ডেকে যাচ্ছিল, আমিও ওর সঙ্গে যাই।"

"গিয়ে কী দেখলেন স্যার?"

"কিছুই না, পুরোপুরি অন্ধকার।"

"আমি একটু কনফিউসড, স্যার। আপনি বলছেন অন্ধকার, কিন্তু পেছনের ডেকে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল না?"

"না।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং, কোথায় গেল সেটা?"

"ওর নাম গে, কে জানে! মন্টু ওটা খুঁজছিল।"

"পেয়েছিল?"

"বোধহয় না। ঘুম পাচ্ছিল বলে বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি, কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ি।"

।। ৩।।

পরের দিন সারা দিনই কাটল আমেরিকান সেন্টারে একটা কাজে। সেখান থেকে বেরোলাম প্রায় সাতটা নাগাদ। সেন্টারের ভিতরে মোবাইল ফোন নিতে দেয় না। বেরিয়ে দেখি অনিমেষের তিন তিনটে মিসড কল। নিশ্চয় আবার অনেক হেনস্তা হয়েছে পুলিশের কাছে। বাড়ি ফিরে ফোন করব। এরমধ্যে একেনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা বলতে হবে, কতটা এগিয়েছেন জানার জন্যে। অনিমেষের একটা কথা ওয়াজ ট্রাবলিং মি। একজন কেউ ভাস্বতীকে পাবার জন্য পাগল। সে-ই কি রাত্রে এসে ভাস্বতীকে অ্যাবডাক্ট করেছে? অসম্ভব নয়। তবে বাইরের কারোর পক্ষে কোনও রকম সাহায্য ছাড়া এভাবে নিঃশব্দে কাউকে অপহরণ করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন, বিজয়বাবু কেবিন থেকে বেরবার আগে মন্টু কি পেছনের ডেকে গিয়েছিল? সে কি ভাস্বতীর অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত? পেছনের ডেক থেকে হ্যারিকেনটাই বা কোথায় গেল? পুরো ব্যাপারটাই একটা রহস্য।

বাড়িতে ঢুকে কম্পিউটার খুলে দেখি, একেনবাবুও স্কাইপে আমাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। স্কাইপে পেলাম না, কিন্তু ফোনে ধরতে পারলাম। একেনবাবু এর মধ্যেই মলয় রায়ের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

"ছেলেটা ভালো, একেনবাবু বললেন, "ওকে ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না, কিন্তু আমার অফিসে কিছুদিন ছিল। নতুন কিছু ডেভোলপমেন্ট হয়েছে শুনলাম। কিন্তু বাইরের কেউ সঙ্গে ছিল, তাই আর কিছু বলতে পারল না। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে, আজ রাতে বা কাল সকালে যদি মলয়ের বাড়িতে যান, আপনাকে বলে দেবে।"

"আমাকে?" কথাটা বুঝলাম না, "আমাকে কেন, আপনি নিজেও তো ফোন করে জেনে নিতে পারেন?"

"ওর স্কাইপ নেই।"

তখনই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল। একেনবাবু হাড় কেপ্পন। এই কাজটা করে দিচ্ছেন আমার সুবাদে। কিন্তু এর জন্য টেলিফোনে কানাকাড়িও খরচ করবেন না। তবে নিজের থেকে যে মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাতেই আমি চমৎকৃত।

"আমাকে উনি বলবেন তো?" চিন্তা ছিল আমি একজন অপরিচিত লোক।

"হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়। বললাম তো, আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।"

মলয়ের ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলেন। লাকিলি মলয় রায়ের বাড়ি নাকতলাতে, আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হাঁটা পথে মাত্র মিনিট পাঁচেক।

একেনবাবুর কথা মতো ফোন করলাম। মলয় রায়ই ফোনটা ধরলেন। নাম বলতেই বললেন, "ও আপনি স্যারের বন্ধু। আমার সঙ্গে আজকেই কথা হয়েছে। আমি বাড়িতেই আছি। চাইলে আজই আসতে পারেন।"

এরকম অভ্যর্থনা পাব বুঝিনি। বললাম, "আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।"

মলয় রায়ের চেহারা একেনবাবুর ঠিক উল্টো। একেনবাবু টিংটিঙে রোগা, বেঁটেখাটো, আন-ইম্প্রেসিভ চেহারার একটি লোক। পোশাক-পরিচ্ছদও তথৈবচ। মলয় রায় সুপুরুষ, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। চওড়া কব্জি, এক্সারসাইজ-করা ফিট বডি। পুলিশ হবারই উপযুক্ত চেহারা।

একেনবাবু নিশ্চয় খুব ফলাও করে আমার কথা বলেছেন। যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। স্ত্রীকেও ডাকলেন, "আমার স্ত্রী মল্লিকা।"

খুবই মিষ্টি চেহারা। নমস্কার করলাম।

"এঁর কথাই স্যার বলছিলেন আজ। ডঃ দে, আমেরিকায় প্রফেসরি করেন।"

"আপনি বেড়াতে এসেছেন?" মল্লিকা নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক বেড়াতে নয়, এক বছরের ছুটি নিয়ে এখানে রিসার্চ করছি।"

"আমাদের একটু চা খাওয়াও না?"

"তা তো খাওয়াবোই। মিষ্টি খান তো?"

"শুধু চাই যথেষ্ট, না হলেও চলবে।"

"তা হয় নাকি!" বলে উনি ভিতরে গেলেন।

আমি মলয় রায়কে বললাম, "একেনবাবু বললেন, কিছু নাকি নতুন ডেভোলপমেন্ট হয়েছে?"

"তা হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, এই অনিমেষ আপনার কী রকম বন্ধু?"

"ওর সম্পর্কে যা জানি বললাম।"

"কিছু মনে করবেন না, ভদ্রলোক কিন্তু হ্যাবিচুয়াল লায়ার। একটু সতর্ক থাকবেন।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

"আজ সকালে ডেকেছিলাম। বললাম ঠিক ন'টার সময়ে আসবেন। আমাদের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সাহেবও কেসটাতে ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন, তিনি থাকবেন। এলেন দশ মিনিট বাদে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দেরি করলেন যে?'

অম্লান বদনে বললেন, 'ঠিক টাইমেই তো এসেছি।'

কথাটা শুনে আমি অবাক। 'ক'টা বাজে আপনার ঘড়িতে?'

ঘড়ির দিকে প্রায় না তাকিয়েই বললেন, 'ন'টা।'

পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওঁর হাতঘড়িতে ন'টা বেজে দশ।

তখন একটু ধমক দিয়েই বললাম, 'আপনার ঘড়ি তো বলছে ন'টা দশ!'

এবার দেখলাম থতোমতো খেয়েছেন। তাও বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'ওটা দশ মিনিট ফাস্ট।'

আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'দেখুন এটা সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশন, থানায় এসে এরকম রহস্য করার চেষ্টা করলে ফল ভুগতে হবে।'"

"টাইমের ব্যাপারে ও একটু ঢিলেঢালা," আমি বললাম। "কিন্তু এটা ঠিক নয়, আপনাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এইভাবে লেট করে যাওয়াটা।"

"ভদ্রলোক একটু ওভার-স্মার্ট! যাইহোক, স্যারকে বলবেন, দুটো ইন্টারেস্টিং খবর আছে। কিন্তু এটা আপনি আর স্যার ছাড়া কেউ যেন না জানে। আপনার বন্ধু তো নয়ই।"

আমি বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি একেনবাবুর অনেক কাজেই সাহায্য করি।"

"সেটা স্যার বলেছেন, আপনাকে বলাও যা ওঁকে সোজাসুজি বলাও তাই। তাও আমি টেকিং এ রিস্ক। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, নাম্বার ওয়ান হল, ভাস্বতীর ঘড়িটা মন্টুর কাছে থেকে উদ্ধার করেছি।"

"মন্টুর কাছ থেকে?"

"হ্যাঁ। মন্টুর বয়ান অনুযায়ী ভাস্বতী ওটা ওকে দিয়েছিল। ভাস্বতী পেছনে একা বসেছিল, আর খুব ভালো দিদিমণি বলে মন্টু ওর দেখভালটা বেশিই করছিল। ভাস্বতী যখন যা চাইছিল এনে দিচ্ছিল। ভাস্বতী ওর সঙ্গে অনেক গল্পও করেছে। মন্টুর এক বোন আছে শুনে ভাস্বতী নাকি ঘড়িটা খুলে মন্টুকে দেয়। মন্টু নাকি নিতে চায়নি, ভাস্বতীই জোর করে দিয়েছিল।"

"আপনি বিশ্বাস করেন?"

মলয় রায় মুচকি হাসলেন।

"সেকেন্ড ইনফরমেশন হল, ভাস্বতী ওয়াজ প্ল্যানিং টু ইলোপ।"

"ইলোপ! এটা কোত্থেকে জানলেন?"

"ওর স্কুলের এক বন্ধুর কাছ থেকে। শুক্রবার, অর্থাৎ বোটে ওঠার আগের দিন ভাস্বতী বন্ধুটিকে জানিয়েছিল।"

"মাই গড, কার সঙ্গে পালাবার প্ল্যান করেছিল?"

"বন্ধু সেটা জানে না। আর এই প্ল্যানটা বোধহয় হঠাৎ করে করা, আগে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি।"

"মাত্র সতেরো বছর বয়স মেয়েটার... ওর তো ভালো বোধ-বুদ্ধিও হয়নি।"

"যেটুকু জেনেছি, মেয়েটা স্বপ্নের রাজত্বে থাকত। তবে সত্যি সত্যিই ইলোপের কোনও প্ল্যান ছিল কিনা, সেটা আর জানাও যাবে না।" মলয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,

“শি ইজ ডেড, ভাস্বতী আর বেঁচে নেই।”

আমি নির্বাক।

মলয়বাবু বলে চললেন, “ওর বডিটা ভেসে যাচ্ছিল। একটা মাঝি দেখতে পেয়ে খবর দেয়। লোকাল পুলিশ বডিটা উদ্ধার করেছে। ভাস্বতীর চেহারা আর জামাকাপড়ের যে বর্ণনা পেয়েছি, তার সঙ্গে ম্যাচ করছে। আমি শিওর বডিটা ভাস্বতীর, কিন্তু ফর্মাল আইডেন্টিফিকেশন এখনও হয় নি। ওর বাবা-মাকে খবর দেওয়া হয়েছে।”

ইতিমধ্যে চা, নিমকি আর দু'রকমের সন্দেশ এসে গেল। কিন্তু এসব শোনার পর কিছু আর খেতে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, “শুধু যদি চা খাই কিছু মনে করবেন?”

মল্লিকা বুদ্ধিমতী। আমার মুখচোখ দেখে মনের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন।

“কিচ্ছু মনে করব না, আপনারা কথা বলুন,” বলে চলে গেলেন।

“আপনার কি মনে হচ্ছে মিস্টার রায়, এটা মার্ডার? ওই মন্টু ছেলেটা ইনভলভড? ঘড়ির লোভে কাজটা করেছে?”

উত্তর না দিয়ে, “আসছি” বলে মলয় রায় ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন একটা ফটো নিয়ে। ভাস্বতী, শীলা আর দীপাবউদির ফটো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

“এটা ভাস্বতীর বাবার তোলা, হাউসবোটে। ভাস্বতীকে দেখুন।”

প্রশ্নের তাৎপর্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বেশ সেজেগুজে বেড়াতে গিয়েছিল এইটুকুই চোখে পড়ল।

“মেয়েটার গলার হার আর দুলটা দেখছেন?”

“হ্যাঁ।”

“সেটটা খুব সস্তা নয়, দাম এক লাখ না হলেও কাছাকাছি। ঘড়ির দাম বড়জোর দু-তিনশো টাকা। ওটার জন্য কেউ খুন করবে না। করলে করবে সেটটার জন্যে।”

“সেটটা কি মিসিং?”

“হ্যাঁ, কিন্তু মন্টুর কাছে পাওয়া যায়নি।”

“মন্টু তো এরমধ্যে সেটটাকে পাচার করে ফেলতে পারে?”

“তা পারে। হি ইজ আওয়ার প্রাইম সাসপেক্ট, বিশেষ করে যদি প্রমাণ হয় ভাস্বতী খুন হয়েছে। তবে কিনা আমাদের কাছে এভরি ওয়ান ইজ এ সাসপেক্ট, ইনক্লিউডিং আপনার বন্ধু।”

।। ৪ ।।

মলয় রায়ের বাড়ি থেকে ফিরে একেনবাবুকে রিপোর্ট করলাম।

“ভেরি ইন্টারেস্টিং। মলয় কিছু বলল, ডেডবডির প্রিলিমনারি এক্সামিনেশনে কী পাওয়া গেছে?”

"না। তবে একটা কথা বলি, আপনি ডিরেক্টলি মলয়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আর প্লিজ, এরা তো আপনাকে ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্স দেবে আর ফি-ও দেবে বলেছে। যা খরচা করার দরকার করুন।"

একেনবাবু একটু লজ্জা পেলেন।

"আরে না স্যার, একটা ফোন করব, তাতে কী হয়েছে? আর আপনার বন্ধুর বিপদে সাহায্য করছি। এতে ফি নেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? আপনি ভাববেন না স্যার, আমি খোঁজ যা নিতে হয় নেব। কালকে আপনার টাইম রাত আটটার সময়ে স্কাইপে কথা বলব।

একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর অনিমেষের সঙ্গে কথা হল। অনিমেষ ভীষণ নার্ভাস। ওকে নাকি পুলিশ স্টেশনে ইনস্পেক্টর আর অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মিলে প্রচণ্ড জেরা করেছে। অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারকে যখন আনা হয়েছে। তখন অনিমেষ কনভিন্সড যে, ওকে ফাঁসানো হবে। জিজ্ঞেস করল একেনবাবুর সঙ্গে আর কথা হয়েছে কি না।

বললাম, "হয়েছে। তবে প্রোগ্রেস কী হয়েছে জানি না।"

মলয় রায়ের ইনফরমেশনগুলো অবশ্যই চেপে গেলাম।

পরের দিন সকালে অনিমেষ দু'-দু'বার ফোন করল আমাকে। বললাম, "এখন শুধু শুধু ফোন করছিস, রাতের আগে একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারব না।" ওর কাছ থেকে তৃতীয় ফোনটা পেলাম দুপুর বেলা। উত্তেজিত স্বরে বলল, "গঙ্গায় একটা বডি পাওয়া গেছে। শীলা আর শেখরদা দেখতে গেছেন ওটা ভাস্বতীর কিনা।" তারপর জিজ্ঞেস করল, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না।

উত্তর না দিয়ে উলটে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই শিওর বডি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ,"এক্ষুণি বিজয়দাকে ফোন করে জানলাম।

আমি একেনবাবুকে রাতে জিজ্ঞেস করব বলে অনিমেষকে কাটালাম।

রাত ঠিক আটটার সময়ে একেনবাবুই আমায় স্কাইপে ধরলেন। ওঁর গলার স্বরে একটু উৎফুল্ল ভাব। বললাম, "কী ব্যাপার, মনে হচ্ছে আপনি অনেকটা এগিয়েছেন?"

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি স্যার।"

এটা গুড সাইন। রহস্যের প্রায় কিনারা হয়ে এলে একেনবাবু এইসব ফিলসফি ঝাড়েন। আমি বললাম, "মনে হচ্ছে কিছু নিশ্চয় জানেন। কিন্তু এদিকে তো অনিমেষের নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার অবস্থা।"

"ওঁকে বলবেন হি ইজ দ্য মোস্ট হেল্পফুল পার্সন ইন দিস ইনভেস্টিগেশন।"

"কী বলছেন যা-তা?"

"আমার তো স্যার যা-তা বলাই স্বভাব।"

"তার মানে আসল কারণটা আমায় বলবেন না, তাই তো?"

"কী যে বলেন স্যার, তবে আগে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য আপনাকে দিই। মেয়েটার মুখে কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, তাতে নাকটা ভেঙ্গে যায়।"

"এটা তো মলয়বাবু আমাকে বলেননি!"

"অতক্ষণ ধরে বডিটা জলে ছিল, ভালো করে এক্সামিন না করে চট করে ভুল ইনফরমেশন হয়তো দিতে চায়নি।"

"তার মানে আপনি বলছেন, শি ওয়াজ মার্ডারড?"

"আমার তাই ধারণা, মিস ভাস্বতীকে খুনই করা হয়েছে। ভারী কিছু দিয়ে মুখে আঘাত করে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মুখে আচমকা ধাক্কা খেয়ে শি ওয়াজ স্টান্ড, চিৎকার করার সুযোগ মেলেনি।"

"তাহলে কি মন্টু? টাকার জন্যে?"

"পসিবল স্যার। তবে শুধু টাকার জন্যেই তো খুন হয় না।"

"অন্য আর কী দেখছেন এখানে?"

"আমার একটা থিওরি আছে স্যার," একেনবাবু বললেন, "তাতে এখনও কয়েকটা ফাঁক রয়ে গেছে। মলয় সেগুলো ভরাতে পারবে। ওর সঙ্গে একটু আগেই কথা হয়েছে। ও আসছে আপনার বাড়িতে। স্কাইপে একসঙ্গে সবাই কথা বলব।"

"কথাটা শেষ হতে না হতেই ডোর বেল বাজল। মলয় রায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওঁকে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসলাম।

"কেমন আছেন স্যার?"

"চমৎকার ভাই। এক্ষুনি বাপিবাবুকে বলছিলাম, কয়েকটা লুজ এন্ড আছে, তোমাকে সেগুলো দেখতে হবে।"

"তা তো দেখব, কিন্তু বলুন কী ব্যাপার? আপনার কথা মতো মন্টুকে এখনও অ্যারেস্ট করিনি দেখে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশন তো আমার ওপরে খাপ্পা!"

"কেন করতে বলিনি সেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে এখন আলোচনা করব। তার আগে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অনিমেষবাবুর সময় নিয়ে এত সমস্যা হল কেন? তোমার ওখানেও দশ মিনিট লেট, বাপিবাবুর বাড়িতেও। দশ মিনিট লেট অথচ ওঁর ধারণা উনি ঠিক টাইমেই এসেছেন।"

মলয় আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। বোঝার চেষ্টা করলেন একেনবাবু কী বলতে চাইছেন?

একেনবাবু বললেন, "জানি মলয়, তুমি অবাক হচ্ছ, কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ভাস্বতীর বইটা কোথায় গেল?"

আমি ভাবলাম, একেনবাবুর কি মাথা খারাপ হয়েছে! মলয় রায়ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর একেনবাবুকে বললেন, "স্যার, আপনি প্রায়ই নিজেকে কনফিউসড বলতেন, এখন কিন্তু আমিও কনফিউসড।"

"কনফিউশনের কোনও দরকার নেই, আমি আমার থিওরি বলছি। সেটা শুনে বল এরমধ্যে ফাঁক কোথায় আছে?"

"বলুন।"

"তুমি জানো কিনা জানি না মলয়, কিন্তু বাপিবাবুর কাছে আমি শুনেছি, বারীনবাবু তিন-চার হাজার টাকা দামের একটা বই ভাস্বতীকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটা শুনেই আমার খটকা লেগেছিল। একটা সতেরো বছরের মেয়েকে এত দামি জিনিস কোনও বিশেষ কারণ ছাড়া কেন কেউ উপহার দেবে? ফ্যামিলি কানেকশন? হয়তো। কিন্তু খটকাটা আরও জোরদার হল যখন বাপিবাবুর কাছে শুনলাম, একটা পার্টিতে মিস ভাস্বতী পাশে-বসা বারীনবাবুকে 'গো-এওয়ে' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আর তার একটু পরেই বাথরুমের সামনে আড়ালে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।" এইটুকু বলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ঠিক বললাম তো স্যার?"

সায় দিলাম, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

"আরেকটা পয়েন্ট, মিস ভাস্বতীকে কেউ একজন হ্যারাস করছিল, আর কাউকে না বলে বারীনবাবুকেই মিস ভাস্বতী সেটা জানিয়েছেন, আর বারীনবাবুও অ্যাকশন নিয়েছেন, অর্থাৎ ওঁরা দু'জন খুবই ক্লোজ। অনিমেষবাবুর কাছে শুনলাম, হাউসবোটে মিস ভাস্বতী ওঁকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, 'একটা সারপ্রাইজ আছে, কিন্তু এখানে বলা যাবে না, তোমার বন্ধু রাগ করবে।' এই বন্ধু নিশ্চয় বারীনবাবু। কিন্তু সারপ্রাইজটা কী? ওটা কি ইলোপ সংক্রান্ত, যেটা করতে যাচ্ছে বলে আগের দিন স্কুলের বন্ধুকে বলেছে? আর করতে যাচ্ছে কার সঙ্গে? বারীনবাবু?"

এবার একেনবাবু আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে চললেন, "স্যার, বয়ঃসন্ধিকালটা একটা গোলমেলে সময়। প্রেম বলুন, যৌন আকর্ষণ বলুন, এই সময়েই জাগতে শুরু করে। তার প্রাবল্যে ছেলেমেয়েরা অনেক সময়েই বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এই সময়ে অভিভাবদের দায়িত্ব ওদের মনকে বোঝার চেষ্টা করা এবং গাইড করা। লাগাম ছেড়ে বড় হতে দিলে পরে পস্তাতে হয়। আপনার নাকতলার পার্টির বর্ণনা থেকে যেটুকু বুঝতে পেরেছি, শিলাদেবী এই গাইডেন্সটা প্রথম দিকে দেননি। আপনার দীপাবউদির কমেন্টটা মনে আছে স্যার? আগে মেয়েকে বাড়িতে রেখে শীলাদেবীরা পার্টি করে বেড়াতেন, ইদানীং হঠাৎ নজরদারি করার জন্য সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। অবশ্যই মেয়ে তাতে বিরক্ত হচ্ছে। ঠিক বললাম কি?"

"হ্যাঁ, প্রায় সেরকমই বলেছিলেন।"

"আমার তো এটা শুনে মনে হল, মিস ভাস্বতীকে একা বাড়িতে রেখে ওঁরা যখন বাইরে পার্টিতে যেতেন, তখন কোনও অপ্রীতিকর ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছিল। তারপর থেকে শীলাদেবী যেখানেই যেতেন, ভাস্বতীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। তবে কারও পক্ষেই একজনকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়। এই রকম ইমোশানাল আর ভালনারেবল মেয়েকে কেউ যদি কামনা করে, অঘটন ঠেকানো যায় না। বারীনবাবু ওয়াজ এ ফ্রেন্ড অফ দ্য ফ্যামিলি। সেই সুবাদে বারীনবাবুর সঙ্গে মিস ভাস্বতীর মেলামেশার অবাধ সুযোগ ছিল এবং ভাইস-ভার্সা।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন, বারীনের সঙ্গে ভাস্বতীর একটা দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল? আর ওরা ইলোপ করার কথা ভাবছিল?"

"অসম্ভব কি স্যার?"

"দ্যাট ইজ ক্রেজি," আমি বললাম। "সতেরো বছর বয়স, ভাস্বতীকে তো আইনত বিয়েও করা যায় না। ওকে নিয়ে বারীন ইলোপ করার কথা ভাববে কেন? হি ইজ নট স্টুপিড!"

"ঠিক ধরেছেন স্যার, আমার কনক্লুশন হল, বারীনবাবু ভাস্বতীকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। ভাস্বতী নিশ্চয় চাপ দিচ্ছিল।"

একেনবাবু মুখে না বললেও ফ্যাসাদটা কী বুঝতে অসুবিধা হল না।

"এবার বারীনবাবুর অবস্থাটা ভাবুন স্যার। ভাস্বতী যদি ওদের দৈহিক সম্পর্কের কথা পুলিশকে জানায়, হি উইল এন্ড-আপ ইন জেল। আইনের চোখে ভাস্বতী নাবালিকা, পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করাও সম্ভব নয়। আর বিয়ে না করলে ভাস্বতী যদি অপমানে লজ্জায় সুইসাইড করে বসে, তাহলেও ওঁর প্রবল সমস্যা হতে পারে, যদি সুইসাইড নোটে ওঁর নাম থাকে। উনি হিসেব করলেন ওঁর সামনে দুটো পথ খোলা। এক মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মিথ্যে পরিচয়ে সারাজীবন কাটানো। যেটা মোটেই আজকাল সহজ নয়। অথবা মিস ভাস্বতীকে খুন করা। আমার ধারণা ইতিমধ্যে মিস ভাস্বতী সম্পর্কে

বারীনবাবুর মোহভঙ্গও হয়েছিল। তাই উনি ভাবনা চিন্তা করছিলেন, কী ভাবে ওকে সরানো যায়। তখন এই প্রমোদতরীর আইডিয়াটা মাথায় এল। অনিমেষবাবুকে প্রায় জোর করে দলে নিলেন একটা অ্যালিবাইয়ের জন্যে। মিস ভাস্বতীকে বলে রেখেছিলেন রাত সাড়ে বারোটায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বারীন আসবেন। নিভৃতে বসে প্রেম, পালানোর প্ল্যান বা কিছু একটা করতে। এই সময়ে উনি দুটো কাজ করলেন। একটা হল অনিমেষবাবুর মদে কিছু মিশিয়ে প্রায় বেহুঁশ করে দিলেন। অন্য সবাইকেও মদের মাত্রা বাড়িয়ে অল্পবিস্তর মাতাল করলেন, যাতে সবাই তাড়াতাড়ি কেবিনে চলে যায়। সবাই ডেক থেকে চলে গেলে অনিমেষবাবুর ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে বারোটা কুড়ি করলেন। তারপর জলের ঝাপটা দিয়ে অনিমেষবাবুকে জোর করে জাগিয়ে প্রায় ধরে ধরে ভাস্বতী বসে রয়েছে দেখালেন, তারপর কেবিনে নিয়ে এলেন। বমিটমি করার পর অনিমেষবাবু যাতে চট করে ঘুমিয়ে পড়েন, তার জন্য শরীর চাঙ্গা হবে বুঝিয়ে আর এক ডোজ ঘুমের ওষুধও অনিমেষবাবুকে দিলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে অভ্যাস বশে অনিমেষবাবু ঘড়ি দেখলেন। ওঁর ধারণা হল সাড়ে বারোটা বেজেছে, আসলে নয়। অনিমেষবাবু ঘুমোতেই বারীনবাবু ভাস্বতীর কাছে গেলেন। মিস ভাস্বতী বই পড়ছিল। বইটা পাশে রাখতেই, ওই ভারী বইটা তুলে আচমকা দড়াম করে ভাস্বতীর মুখে মারলেন। হঠাৎ ওই আঘাতেই মিস ভাস্বতী নিশ্চয় সংজ্ঞা হারায়। তখন মিস ভাস্বতীকে জলে ফেলে দ্রুত গতিতে নিজের কেবিনে ফিরে এলেন। বইটাও জলে ফেলে দিয়েছিলেন, সম্ভবত সেই সময়ে হ্যারিকেনটাও জলে পড়ে যায়। পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে সাড়ে বারোটার একটু আগে। বই দিয়ে আঘাত করার আওয়াজ আর জলে মিস ভাস্বতীর দেহ পড়ার শব্দে বিজয়বাবু বেরিয়েছিলেন। তিনি এবং মন্টু গিয়ে মিস ভাস্বতীকে দেখেননি। কারণ তার আগেই তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা পয়েন্ট, বিজয়বাবু সোয়া বারোটার সময়ে জেগে থাকা সত্ত্বেও অনিমেষবাবুর বমি করার শব্দ বা অনিমেষবাবু আর বারীনবাবুর কথাবার্তা শুনতে পাননি। অথচ ওঁদের দু'জনের ঘর পাশাপাশি। তার মানে বিজয়বাবু যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখনই অনিমেষবাবু বাথরুমে বমিটমি করছিলেন, বারীনবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার ধারণা ওইসব আওয়াজেই বিজয়বাবুর ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু উনি যখন পুরোপুরি জেগে উঠেছেন তখন অনিমেষবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"যাই হোক, বারীনবাবুর কথায় ফিরে আসি। এইবার শুরু হল বারীনবাবুর সমস্যা। মিস ভাস্বতীকে জলে ফেলে ফিরে এসে অনিমেষবাবুর ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলেন। কিন্তু সময়টা মেলালেন নিজের ঘড়ির সঙ্গে। এদিকে অনিমেষবাবু সব সময়ে ঘড়ি দশ মিনিট ফাস্ট রাখতেন। ফলে এর পরে সব জায়গাতে যেতেই ওঁর দেরি হচ্ছিল। মলয়, তুমি আর বাপিবাবু সময় নিয়ে খুব সচেতন বলে সেটা লক্ষ্য করেছ এবং বিরক্তও হয়েছ। কিন্তু অন্যরা এ নিয়ে ভাবেনি। পাঁচ-দশ মিনিটের এদিক ওদিক নিয়ে অনেকেই ভাবে না, যদি না ট্রেন বা প্লেন ধরতে হয়। তাই উনি নিজেও ধরতে পারছিলেন না সময়ের সমস্যাটা। ডাস ইট মেক সেন্স স্যার?" একেনবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

"যা বলছেন সবই তো লজিক্যাল। কিন্তু টাকার জন্য খুনের পসিবিলিটি কিন্তু এলিমিনেট করলেন না।"

"তা করলাম না, আমি শুধু আরেকটা পসিবিলিটির কথা বললাম। মলয়ের কাজ হবে চুরির জিনিস উদ্ধার করা, আর দেখা মেয়েটার কোনও চিঠিপত্র, ডায়রি বা খাতায় বারীনবাবুর উল্লেখ আছে কি না।"

মলয় রায় কাজ করেন খুব দ্রুতগতিতে। পরের দুপুরের মধ্যে উদ্ধার করে ফেললেন ভাস্বতীর গলার হার আর কানের দুল। যে মাঝি ডেড বডিটা জল থেকে তুলেছিল, তার বাড়ি থেকেই মিলেছে। দুর্গাপুর থেকেই বারীনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে জেরা করার জন্যে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে বা পিছিয়ে দিয়ে অ্যালিবাই সৃষ্টি করা ক্রাইম নভেলের একটা ক্লসিক মেথড। সেটা কেন আমি ভাবিনি, নিজেই অবাক হচ্ছিলাম। বেচারা ভাস্বতী... মাত্র সতেরো বছরের তরতাজা জীবনের কী শোচনীয় পরিণতি ঘটল! বারীনকে আমি অল্পই দেখেছি, কিন্তু একবারও মনে হয়নি এরকম জঘন্য কাজ সে করতে পারে! কামনার তাড়নায় মানুষ কী না করে, সেই অন্যায় ঢাকা দিতে আরও কত ঘোরতর অন্যায় করে ফেলে, এটাই বোধহয় এর থেকে শিক্ষণীয়। তবে অনিমেষ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। বার বার ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। একদিন খেতে নিয়ে যাবে কথা হয়েছে। এগুলো সব একেনবাবুর প্রাপ্য আমার নয়।

।। ৫ ।।

ক'দিন বাদে কলেজে একটা ফোন পেলাম একেনবাবুর কাছ থেকে। নিউ ইয়র্কে এখন রাত্রি সাড়ে বারোটা। এত রাত্রে পয়সা খরচ করে একেনবাবুর ফোন!

"কী ব্যাপার?"

আই ওয়াজ এ ফুল স্যার, আই ওয়াজ এ ফুল!"

"কী যা-তা বলছেন আপনি?"

"আমাকে শুধু বলুন, প্রথম দিন অনিমেষবাবু কি ঠিক দুটোর সময় আপনার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন?"

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, একেনবাবু কীসের কথা বলছেন।

"আপনার সেমিনারের দিন স্যার?"

"ও হ্যাঁ, আমার একটা সেমিনার ছিল, তাই।"

"সেটা জানি স্যার। উনিই কি ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আর বলেছিলেন আপনার সেমিনারের দেরি হয়ে যাচ্ছে?"

"তাই তো বলেছিল, কারণ তখন প্রায় দুটো বেজেছিল।"

"কিন্তু স্যার, ওঁর ঘড়ি অনুসারে তখনও তো দশ মিনিট সময় ছিল, এত তাড়াহুড়ো করলেন কেন?"

"আমার কোনও ধারণাই নেই।"

"আপনার বন্ধু অত্যন্ত ক্লেভার স্যার, এ ভেরি ক্লেভার এন্ড ডেঞ্জারাস ম্যান। আমি মলয়কে ফোন করে বলছি, টু টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশন।"

লাইনটা হঠাৎ কেটে গেল। মোবাইল ফোনের টিপিক্যাল সমস্যা। চেষ্টা করেও একেনবাবুকে ধরতে পারলাম না।

রাত্রে অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের সকালে একেনবাবুকে পেলাম।

"কী ব্যাপার, সাসপেন্সের মধ্যে ফেলে রেখে হঠাৎ ফোন কেটে দিলেন যে কাল?"

"ব্যাটারিতে চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল, স্যার। কিন্তু সাসপেন্স কেন, মলয় কিছু বলেনি আপনাকে?"

"নাঃ!"

"হয়তো অন্য কোনও তদন্তে জড়িয়ে পড়েছে।"

যাইহোক একেনবাবুর কাছ থেকে যা যা ঘটেছে সব কিছুই জানলাম। একেনবাবুর কথা শুনেই অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে বারীনকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন মলয়বাবু। জানতে পেরেছেন, বারীন যে পৈত্রিক বাড়িটা প্রমোটারকে বিক্রি করে দিচ্ছে, অনিমেষ সেই বাড়িতেই থাকে। এই তথ্য আমার অজানা নয়, নাকতলার পার্টিতেই জেনেছিলাম, আর একেনবাবুকে জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু এর তাৎপর্যটা কী হতে পারে খেয়াল করিনি। অনিমেষ শুধু বারীনের বাড়িতে ফ্রি থাকে তা নয়, ওই বাড়িতেই টিউটোরিয়ালের রমরমা ব্যাবসা চালায়। বাড়ি বিক্রি হলে সেই ব্যাবসা লাটে উঠবে। অনিমেষ বারীনকে বলেছিল বিক্রির ব্যাপারে অপেক্ষা করতে, কিছুদিন বারীন করেওছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ভালো ডিল পেয়ে যাওয়ায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হার্ড ফ্যাক্ট বলতে এটুকুই। এবার শুরু হচ্ছে লজিক। সেটাই একেনবাবু বিশদ করলেন।

"এই বিক্রিটা একমাত্র বন্ধ করা যায় যদি সুপারি কিলার দিয়ে বারীনবাবুকে সরানো যায়। কিন্তু তাতে সন্দেহের তির অনিমেষবাবুর ওপর পড়বে, যেহেতু ওঁর ফাইনানশিয়াল ইন্টারেস্ট আছে। তখনই এই ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা অনিমেষবাবুর মাথায় আসে। যদি বারীনবাবুকে কোনও মতে খুনের মামলায় জড়ানো যায়, তাহলে ফাঁসি না হলেও বহুদিনের জন্য বারীনবাবুকে শ্রীঘরে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে অনিমেষবাবুর বাড়ি ছাড়ার কোনও প্রশ্নই উঠবে না। ভাস্বতীকে অনিমেষবাবু খুব ভালোভাবেই চিনতেন, ওকে মাস দুই পড়িয়েছিলেন। শিক্ষক-ছাত্রীদের মধ্যে অনেক সময় যা হয়, একটু প্রেম প্রেম ভাব হয়তো এক সময়ে হয়েছিল। এইটেই অনিমেষবাবু কাজে লাগালেন। বোটে যাবার আগে একদিন কোনও এক ফাঁকে অনিমেষবাবু ভাস্বতীকে প্রেম নিবেদন করে ইলোপ করার প্রসঙ্গটা তুললেন। নিশ্চয় বলেছিলেন এটা খুব প্রাইভেট, বারীনবাবুকেও যেন না জানে। তবে কোনও এক বন্ধুকে জানিয়ে রাখতে বলেছিলেন, অবশ্যই অনিমেষবাবুর নাম না করে। তাহলে পালিয়ে যাবার পরে বাবা-মা বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না। আসল উদ্দেশ্য, পরে তদন্তের সময় পুলিশ যেন এই তথ্যটা পায়। ভাস্বতী সত্যি সত্যিই অনিমেষবাবুর সঙ্গে পালাত কি না বলা শক্ত। কিন্তু একজন যুবাপুরুষ ওকে এরকম ভাবে কামনা করছে ... খবরটা ভাস্বতী ওর এক বন্ধুকে না জানিয়ে পারেনি।

"বোটে উঠে সবাই যখন বাইরের ডেকে বসে আছে, অনিমেষবাবু চট করে ভাস্বতীর সঙ্গে দেখা করে আসেন। নিশ্চয় বলেন সাড়ে বারোটার আগেই ওর কাছে অনিমেষবাবু আসবেন। অন্যদের ড্রিংকস-এ ঘুমের ওষুধ অনিমেষই মেশান। তারপর ইচ্ছে করে আউট হয়ে যাবার ভান করেন। হাউসবোটে সময়ের হিসেব অনেকগুলোই হয়তো অনিমেবাবুর বানানো। তবে এটা মনে হয় ঠিক, সবাই চলে গেলে বারীনবাবুকে নিয়ে অনিমেষবাবু কেবিনে গিয়েছিলেন। তারপর বারীনবাবু শুয়ে চোখ বুজতেই গিয়েছিলেন ভাস্বতীর কাছে। ভাস্বতীর হাত থেকে কোনও এক ছুতোয় বইটা নিয়ে আচমকা দড়াম করে মুখে বা মাথায় মেরেছিলেন।..."

“খুন করার জন্য?”

“না স্যার, আমার ধারণা উদ্দেশ্য ছিল অজ্ঞান বা হতবুদ্ধি করে দেওয়া, যাতে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেওয়ার সময় ভাস্বতী চেঁচাতে না পারে। তারপর বই আর হ্যারিকেন দুটোই জলে বিসর্জন দিয়ে কেবিনে এসে শুয়ে পড়েন।”

একেনবাবুর কাছে এতটা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

“বইয়ে না হয় রক্ত লেগে থাকতে পারে, কিন্তু হ্যারিকেনটা ফেলে দেবার কারণ কী?”

“আমার ধারণা স্যার, হ্যারিকেনের আলোয় বসে মেয়েটা পড়ছিল। মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবার সময়ে হ্যারিকেনটাও উলটে জলে পড়ে যায়। বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে ‘বিসর্জন’ কথাটা ঠিক খাটে না। কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং, সেটা হল এর পরে অনিমেষবাবুর অভিনয় এবং আমাদের ভুল পথে চালানোর চেষ্টা। টুকরো টুকরো নানান ইনফরমেশন দিয়ে বারীনবাবুর ওপর সন্দেহ জাগানো, সবার যেন মনে হয় ভাস্বতীর এই অন্তর্ধান বা খুনের পেছনে বারীনবাবুর হাত আছে। না স্যার, সোজাসুজি নয়, তবে সেই তথ্যগুলোর যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা খাড়া করে সেই সিদ্ধান্তেই সবাই যেন আসি। যেমন ধরুন, দশ মিনিট বাদে মিটিং-এ এসে ঠিক সময়ে এসেছি ভান করা। মলয় তাতে বিরক্ত হলেও দেরিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই ছিল অনিমেষবাবুর প্ল্যান। দেরিটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। যাতে পরে আমরা ভাবি, এটা বারীনবাবুর টাইম-অ্যালিবাই তৈরি করার চেষ্টা... হাউসবোটে অনিমেষবাবুর ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়া এবং পরে সময় মেলানোতে ভুল করা... সবকিছুই পারফেক্ট। কিন্তু একটা ভুল করেছিলেন অনিমেষবাবু, সেটাই কাল হল। প্রথমদিন অসতর্ক ভাবে ঘড়ি দেখে দুটোর সময় দুটো বলা। এত করেও শেষ রক্ষা হল না।”

।। শেষ কথা ।।

তবে দোষী প্রমাণ শুধু লজিক দিয়ে হয় না। জেরার চাপে অনিমেষ অপরাধ স্বীকার করেছে। জেরা করার সময়ে মলয়বাবু মিথ্যে করেই ভাস্বতীর ডায়রিতে অনিমেষের উল্লেখ রয়েছে বলেছিলেন, তাতেই কাজ হয়েছে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে অনিমেষের ঘোরতর আপত্তির কথা বারীন জানিয়েছে। বারীনকে সরানোর জন্য অনিমেষ একজন কনট্রাক্ট কিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, সেটাও জানা গেছে। তদন্তের জাল মোটামুটি গুটিয়ে এসেছে।

বেসুরো বেহালার পরের কাহিনি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

আমার এক স্টুডেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট আছে, নাম ওডিন সেকো। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হলেও ওডিনের বয়স হয়েছে। আমার থেকে মাত্র বছর কয়েকের ছোটো। নানা ঘাটের জল খেয়ে আবার কলেজে ঢুকেছে। অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি নিয়ে মেরিল্যান্ডে এক এনার্জি রিসার্চ সেন্টারে ল্যাব অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করত। বেশ কয়েক বছর ছিল সেখানে, তারপর কী মনে হয়েছে আবার ডিগ্রি কোর্সে ঢুকেছে। কথাবার্তায় ভদ্র। মন দিয়ে কাজ করে। এবার আমার গ্র্যান্টে ফুল-টাইম অ্যাসিস্টেন্টশিপের টাকা নেই। ফুল-টাইম অ্যাসিস্টেন্টরা সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টা কাজ করে, সেই সঙ্গে পড়াশুনো। আমার গ্র্যান্টে যা আছে, তাতে অর্ধেক দেওয়া যায়। ওই টাকায় ওর চলছিল না। প্রমথর কেম-ল্যাবের এক অ্যাসিস্টেন্ট তিনমাসের মেটার্নিটি-লিভ নিয়েছিল। ডিপার্টমেন্ট হেডের সঙ্গে কথা বলে প্রমথ ওকে আরও দশ ঘণ্টার কাজ ম্যানেজ করে দিল। ফলে আমাদের প্রতি ওডিনের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। দরকারে অ-দরকারে এগিয়ে এসে সাহায্য করে। আমার তরফ থেকে যেটা করতে পেরেছি, আমার ঘরের এক কোণে ওর জন্য ডেস্ক আর চেয়ার রাখা।

কিছুদিন আগের কথা। ওডিন আর আমি অফিসে কাজ করছি, আমার বন্ধু প্রীতম এল। প্রীতমের সঙ্গে কলকাতায় বি এসসি পড়েছিলাম। পাশ করেই ও আমেরিকাতে চলে এসেছিল, তবে যোগাযোগটা ছিন্ন হয়নি। আমি যখন নিউ ইয়র্কে প্রথম এলাম, প্রীতমই খোঁজখবর করে আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল। অফিসের কাজে মাঝেমাঝেই ওকে এদিকে আসতে হয়, সময় থাকলে আমাকে 'হ্যালো' বলে যায়।

আমার বন্ধু হলেও প্রীতম অন্য জগতের ছেলে। থাকত আলিপুরে, অভিজাত পল্লীর একটা বিশাল বাড়িতে। অঢেল পয়সা-ওয়ালা ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র সন্তান। মায়ের পরিবার আরও বড়লোক। মায়ের ঠাকুরদা, অর্থাৎ প্রীতমের দাদুর বাবা যৌবনকালে কেনিয়াতে গিয়ে একটা ছোটোখাটো দোকান খুলেছিলেন। সেখান থেকেই রকেটের গতিতে তাঁর উত্থান। ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রি এখন একটা বিশাল কনগ্লমারেট�অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল, প্লাস্টিক থেকে শুরু করে আইটি, বায়োটেক � কী নেই তার মধ্যে! ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির অফিস শুধু কেনিয়াতে নয়, ইউরোপ, জাপান, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া� সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে!

হেড কোয়ার্টার নাইরোবিতে। প্রীতম রয়েছে কোম্পানির নিউ ইয়র্ক অফিসে। দাদু মারা যাবার পর প্রীতমের বড়মামা গুরুবচন সিংহ ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির প্রধান। কয়েক বছর হল নিউ ইয়র্কে এসেছেন এদিকের অপারেশনটা বাড়ানোর জন্য। আমার ধারণা প্রীতমকে ট্রেনিং দিচ্ছেন যাতে নর্থ আমেরিকার ভারটা প্রীতমকে দিয়ে যেতে পারেন। প্রীতমের মামা হবার সুবাদে উনি আমাদেরও আঙ্কল, ওঁর স্ত্রী আন্টি। ওঁরা থাকেন ট্রাইবেকা অঞ্চলে একটা পেন্টহাউসে।

প্রীতম এসেছিল ওঁর মামার হয়ে আমাদের নেমন্তন্ন করতে। ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির স্ট্রং রুমে রাখা কিছু কিছু গোপন নথি নাকি চুরি হচ্ছিল! কী ভাবে সিকিউরিটিকে ধোঁকা দিয়ে কাগজপত্র সরানো হচ্ছিল, সেটা খুঁজে বার করার জন্যে প্রীতমের বড়মামা প্রাইভেট ডিটেকটিভের খোঁজ করছিলেন। কারো কাছ থেকে একেনবাবুর নাম শুনে যোগাযোগ করেন। তখন অবশ্য প্রীতমের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের কথা উনি জানতেন না। আর ব্যাপারটা এতই গোপনীয় ছিল যে প্রীতমও এই চুরির খবর জানত না। রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে একেনবাবুর লেগেছিল মাত্র দু’দিন! চোরকে হাতে নাতে ধরেননি ঠিকই, কিন্তু সিকিউরিটি ব্যবস্থায় একটা বড়সড় গলদ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সুযোগটাই চোর নিয়েছিল সন্দেহ নেই। একেনবাবুর সাহায্য নিয়ে সিকিউরিটির সেই ফাঁকটা সুরক্ষিত হল। যেসব তথ্য চুরি হয়ে গেছে, সেগুলো তো গেছে। কিন্তু আরও চুরি হওয়া তো আটকানো গেল!

এত তাড়াতাড়ি একেনবাবু সমস্যার সমাধান করবেন প্রীতমের বড়মামা স্বপ্নেও ভাবেননি! তারপর যখন দেখলেন, একেনবাবু টাকা নিতে চাচ্ছেন না, তখন তো বিস্ময়ে হতবাক! সেই প্রথম জানলেন আমরা ওঁর ভাগ্নের বিশেষ পরিচিত! প্রীতমের আজ নেমন্তন্ন করতে আসাটা সেই সূত্রেই। দুপুরে লাঞ্চের নেমন্তন্ন, এই রবিবার। প্রীতমকে বললাম, “একেনবাবু আর প্রমথ ফ্রি আছে কি না দেখি। থাকলে তো আসবই। যাই হোক, বিকেলের মধ্যেই জানাব।”

প্রীতম যেতে না যেতেই একেনবাবু অফিসে এলেন। সকালে তাড়াহুড়ো করে অ্যাপার্টমেন্টের চাবি না নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরে খেয়াল হওয়াতে আমাকে ফোন। এটা নতুন কিছু নয়, প্রতি মাসেই একাধিক বার হয়। ওঁর চাবিটা সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম, বরাবরই তা করি। চাবিটা হাতে দিয়ে বললাম, “কয়েক সেকেন্ড আগে এলে প্রীতমের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আপনার জন্য রবিবার সবাই লাঞ্চের নেমন্তন্ন পেয়েছি ওর মামার বাড়িতে।”

“আমার জন্য স্যার?”

“বাঃ, আপনি ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির চুরি ধরলেন যে?”

“চোর ধরলাম কই স্যার, সিকিউরিটির ফাঁকটা ধরলাম শুধু।”

“ওই হল, সেইজন্যই তো নেমন্তন্ন! আপনি ফ্রি তো?”

“আমি তো ফ্রি স্যার। কিন্তু প্রমথবাবু?”

“আমি ওকে ধরব, একটু বাদেই আসবে।”

একেনবাবুর বাড়ি যাবার তাড়া ছিল, আর বসলেন না।

একেনবাবু চলে যেতে ওডিন জিজ্ঞেস করল, “ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রি ... মানে, আফ্রিকার

ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রি?”

“হ্যাঁ, তুমি ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির নাম শুনেছ?”

ক্যাম্পর ইণ্ডাস্ট্রি বড় হলেও আইবিএম, জেনারেল মোটর্স বা এক্সনের মতো বিশাল নয়... ওরকম অজস্র কোম্পানি নিউ ইয়র্কে রয়েছে। কিন্তু নাম না শুনে থাকলে প্রশ্ন করবে কেন? আমার প্রশ্নটাই স্টুপিডের মতো!

ওডিন মাথা নাড়ল।

আমার একটা ক্লাস ছিল, এ নিয়ে আর কথা হল না।

।। ২।।

প্রমথ আমাদের সঙ্গে যাবে বলেছিল, শেষ মুহূর্তে কাটল। আমি অবশ্য আশ্চর্য হইনি। রবিবার ওকে পাওয়া কঠিন... গার্ল ফ্রেন্ড ফ্র্যান্সিস্কার সঙ্গে সময় কাটায়। তাও আগে থেকে বলবে তো!

পেন্ট-হাউসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এর আগে একবারই হয়েছিল। সেবার গিয়েছিলাম ম্যানহাটানের রিয়েল এস্টেট ম্যাগনেট বিপাশা মিত্রের কাছে। পেন্ট-হাউস কী সবাই হয়তো জানেন না... অন্তত আমি এদেশে আসার আগে জানতাম না। হাইরাইজ বিল্ডিং-এর সবচেয়ে উঁচু তলার অ্যাপার্টমেন্টকে বলা হয় পেন্ট-হাউস। এগুলোই সাধারণত হয় সবচেয়ে দামি আর লাক্সুরিয়াস।

প্রীতমের মামার অ্যাপার্টমেন্ট অবশ্য বিপাশা মিত্রের বাড়ির মতো বড় নয়, কিন্তু অনেক ছিমছাম। লোকেশনটাও ভালো, হাডসন নদীর লাগোয়া ব্যাটারি পার্কের ঠিক পাশে! তিরিশ তলায় পেন্টহাউসে ওঠার জন্য সার্ভিস এলিভেটর বাদ দিয়ে তিন তিনটে এলিভেটর বা লিফট! সেইসঙ্গে সিঁড়ি তো আছেই ফায়ার কোড-এর জন্যে। বাড়িতে আগুন লাগলে ফায়ার-প্রুফ সিঁড়ি দিয়ে লোকে যাতে নেমে আসতে পারে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম প্রীতমের বড়মামা তখন অফিসঘরে দরজা বন্ধ করে কাজে ব্যস্ত। প্রীতমই আমাদের লিভিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। বিশাল লিভিং রুম। আমি বলব চওড়ায় প্রায় কুড়ি ফুট, লম্বায় তো কম-সে-কম পঞ্চাশ ফুট হবে! সামনে একটা লম্বা টেরাস আর দু’দিকে দুটো ব্যালকনি বা বারান্দা। এখানে বলেই ফেলি টেরাস আর ব্যালকনির তফাৎটা আগে ঠিক বুঝতাম না। ভুলের মধ্যে সেটা একদিন বলে ফেলে প্রমথর কাছে গাল খেয়েছি।

“এটাও জানিস না! টেরাস হল ছাত, তার নীচে ঘরটর থাকে। ব্যালকনির নীচের একটা দিকে অন্তত কিছু থাকে না।”

প্রমথ অবশ্য অনেক সময়েই সবজান্তার মতো অনেক উলটো পালটা বলে। এটা সম্ভবত ভুল নয়।

খানিক বাদেই আন্টি ঘরে এলেন। প্রীতমের কাছে শুনেছিলাম আঙ্কল গুরুগম্ভীর লোক।

অফিসের লোকেরা তো ওঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। আন্টি কিন্তু একেবারেই উলটো, হাসিখুশি, ঘরোয়া... ভারী স্নেহশীলা।

আমাদের জন্যে দেখলাম ঢালাও অ্যাপেটাইজারের বন্দোবস্ত করেছেন যার টেন পার্সেন্টও আমরা শেষ করতে পারব না। 'এটা নাও, ওটা নাও' করতেই থাকলেন। যতটা পারলাম খেলাম। অ্যাপেটাইজারের ধাক্কাটা কাটলে একেনবাবু বললেন, "সত্যি ম্যাডাম, এত উঁচুতে এত বড় বাড়ি, একেবারে অ্যামেজিং!"

"বাড়িটা দেখবে?" আন্টি ভদ্রতা করেই মনে হল প্রশ্নটা করলেন।

একেনবাবু হ্যাংলার মতো বললেন, "দেখাবেন ম্যাডাম, এমন বাড়ি দেখার সুযোগ আর কবে পাব?" বলেই আমাকে তাড়া দিলেন, "চলুন স্যার, চলুন!

সত্যি, একেনবাবুকে নিয়ে আর পারা যায় না!

আন্টি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে অ্যাপার্টমেন্টটা দেখালেন। প্রীতমও আমাদের সঙ্গ দিল। মোট চারটে জাম্বো সাইজের বেডরুম, প্রত্যেকটাই উইথ অ্যাটাচড বাথ আর টেরাস। দুটো টেরাস পশ্চিম দিকে মুখ করে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়বে হাডসন নদী। স্পীড-বোট, ক্রুজার, ক্যাটামারান, যাত্রীবাহী স্টিমার, কী নেই সেখানে! নদীর এদিকে ব্যাটারি পার্ক, অন্যদিকে জার্সি সিটির নতুন কাচে ঢাকা আলোয় ঝলমল হাই-রাইজগুলো। ওই টেরাসে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যায়।

ডাইনিং রুমটাও খুব বড়। যে টেবিলটা সেখানে পাতা, সেখানে গোটা বারো চেয়ার সাজানো আছে দেখলাম। কিন্তু হাত পা ছড়িয়ে জনা কুড়ি গেস্ট সেখানে বসতে পারে। পাশেই প্রশস্ত কিচেন। সাদা কোট পরা একজন রান্না করতে ব্যস্ত, মাথায় শেফের ক্যাপ। কিচেনের লাগোয়া একটা প্যানট্রি আর তার পাশে বোধহয় হাবিজাবি জিনিসপত্র রাখার স্টোর রুম। সেটা বন্ধ।

ডাইনিং রুমের একদিকে মোটা কাচের দেয়াল। তার মাঝখানে বিশাল স্লাইডিং দরজা, টেরাস গার্ডেনে যাওয়ার জন্য।

এত বিশাল বাড়ি, অথচ থাকেন মাত্র ওঁরা দু'জন! একমাত্র মেয়ে বল্লরী ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, বাড়িতে আসে শুধু কোয়ার্টার ব্রেকে। আন্টির কথাবার্তা শুনে যা মনে হল রাতেও ওঁরা একাই থাকেন থাকেন, কোনও গার্ড বা হেল্প থাকে না। দিনের বেলায় একজন কুক আর একটি হাউসকিপার আসে। আন্টির বাগানের শখ বলে একজন গার্ডনার মাঝেমাঝে এসে টেরাস গার্ডেন তদারক করে যায়। একটা ছোট্ট গ্লাস-হাউসও ওখানে আছে। নিশ্চয় টেম্পারেচার কনট্রোলড... নইলে কি আর শীতকালে গাছ পালা বাঁচবে?

আন্টি বললেন, কয়েকটা গোলাপি আর হলুদ লেডিজ স্লিপার অর্কিড ফুটেছে গ্লাসহাউসে। সেটা শুনে একেনবাবু সুপার এক্সাইটেড। একেনবাবুর ওই অবস্থা দেখে আন্টি প্রীতমকে বললেন, একেনবাবুকে গ্লাসহাউসটা দেখিয়ে দিতে। প্রীতম ওঁকে নিয়ে গেল। অর্কিডে আমার এ্যালার্জি নেই, কিন্তু একেনবাবুর মতো ওরকম উৎসাহও নেই। আমি আন্টির সঙ্গে ডাইনিং রুমে বসে গল্প করতে লাগলাম। এমন সময়ে আঙ্কল ঘরে ঢুকলেন।

আন্টি পরিচয় করিয়ে দিতেই বললেন, "আমি একটা ফোন এক্সপেক্ট করছি। চলো, অফিস-ঘরে তোমার সঙ্গে কথা বলি।"

"তোমরা যাও, আমি লাঞ্চের ব্যাপারটা একটু দেখি।" বলে আন্টিও উঠে গেলেন।

আঙ্কলের অফিস-ঘর বেডরুমগুলোর তুলনায় ছোটো, কিন্তু লোকেশনটা চমৎকার একেবারে কর্নারে। দুটো দেয়াল পুরো কাচের। উলটো দিকের দুই দেয়ালে দুটো দরজা, একটা হলে যাবার, অন্যটা মনে হয় বাথরুমের। এক্সিকিউটিভ অফিস ডেস্কটা ওই দুটো দেয়ালে কোনাকুনি এমন ভাবে বসানো যে পেছনে চেয়ার বসেই হাডসন নদী পরিষ্কার দেখা যায়। ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ারের একটাতে বসলাম। ডেস্কে কাগজপত্রের জঞ্জাল ঘাঁটতে ঘাঁটিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন ইন্ডাস্ট্রিতে না ঢুকে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আছি?

এ ধরণের প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। তবে বুঝলাম আমরা কে কী করি, এ ব্যাপারে খোঁজখবর কিছু নিয়েছেন। আমি উত্তরে বলার চেষ্টা করলাম, পড়াতে আমার ভালো লাগে।

তখন জিজ্ঞেস করলেন, আগে অন্য কিছু করেছি কি না।

যখন বললাম 'না', তখন বললেন তাহলে সেটা যে আরও ভালো লাগবে না, কী ভাবে বুঝলাম? তারপর একটা লেকচার ঝাড়লেন। যার সার কথা, অ্যাডভেঞ্চারাস না হলে পৃথিবীতে কিছু পাওয়া যায় না। ভাগ্যিস প্রমথ সঙ্গে ছিল না। সঙ্গে থাকলে 'পাওয়া যায় না' বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন... সেই নিয়ে সাত রকম তর্ক জুড়ত। ফলে বিচ্ছিরি ভাবে ব্যাপারটা শেষ হত। আমি 'রা' কাড়লাম না বলেই বোধহয় আমার ওপর একটু করুণা হল। বললেন, "না, তোমাদের মতো ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। মানুষ তো তোমরাই গড়বে। কিন্তু কিপ ইওর মাইন্ড ওপন, অপরচুনিটি একবারই আসে জীবনে।"

ঠিক কী অপরচুনিটি সেটা অবশ্য পরিষ্কার হল না। এরপর যতক্ষণ ওঁর ঘরে ছিলাম, নিজের জীবনের কথাই বললেন। কী ভাবে বিজনেসটা বড় করে তুলেছেন, কোম্পানিকে ডাইভার্সিফাই করতে কত রিস্ক নিতে হয়েছে, কাট-থ্রোট কম্পিটিশনের ভয়ে পিছিয়ে যাননি, ইত্যাদি। কিন্তু রিস্ক নিয়েছেন বলে রিওয়ার্ডও এসেছে। আধঘণ্টা বাদে আন্টি যখন খেতে ডাকলেন, তখন পিঠটা চাপড়ে বললেন, "উই আর ডুইং গড'স ওয়ার্ক, কিপ ইট আপ!" অর্থাৎ একেবারে ১৮০ ডিগ্রি উলটো!

এই অদ্ভুত আচরণের কারণটা পরে প্রীতমের কাছে জেনেছিলাম। ওঁর একমাত্র ছেলে বাপের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বিজনেসে না ঢুকে মিউজিক নিয়ে পড়াশুনো করে স্কুলের টিচার হয়েছিল। ভালো বেহালা বাজাত। পরে কোনও দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেটা শুনে আর একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হল। আঙ্কলের অফিস ঘরে একটা শো-কেসে বেশ কয়েকটা জিনিস চোখে পড়েছিল। এখন বুঝলাম সেগুলো পরলোকগত ছেলের স্মৃতি চিহ্ন। কয়েকটা তারের যন্ত্র। ছোটোটা বেহালা, অন্য দুটো একটু বড় সাইজের। একটা তো মনে হল ভায়োলা, আরেকটা নিশ্চয় চেলো একটা এন্ড পিনের ওপর দাঁড় করানো। উনি আমাকে বসিয়ে রেখে কয়েক মিনিটের জন্যে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তখন উঠে শো-কেসটা ভালো করে দেখছিলাম। শেষ প্রান্তে একটা ভেলভেটের বাক্স, নিশ্চয়ই দামি কিছু আছে সেখানে। আর একবারে শেষে আরেকটা বেশ পুরোনো বেহালা। শো-কেসে কোনও লক নেই। তবে জিনিসগুলো সিকিওরড, একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখলাম ওদিকে তাক করে আছে। হয়তো একাধিক ক্যামেরা নানান দিকে লুকিয়ে আছে, বড়ো লোকদের ব্যাপার।

।। ৩।।

সোমবার কলেজে গেছি। ওডিন এসে বলল, “রবিবার ফোন করে ডিস্টার্ব করতে চাইনি, কিন্তু যে কাজটা দিয়ে গিয়েছিলে, সেটাতে এক জায়গায় আটকে গেছি, শেষ করতে পারিনি।”

একটা রেফারেন্স। আমারই দোষ, ভুল তারিখ দিয়েছি বলে বেচারা আর খুঁজে পায়নি।

“ফোন করলেই পারতে। আমি তো লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলাম।”

“তা হোক, মিস্টার সিং তো খুব বিখ্যাত লোক, আমি সাহস পাইনি ওখানে ফোন করতে।”

“তুমি কি চেন ওঁদের?”

“না, না, চিনি না। তবে আমার চেনা জানা অনেকে কাজ করতেন ওঁদের কোম্পানিতে। তাঁদের কাছে ওঁর কথা শুনেছি।”

“তোমার চেনা জানা লোক... এখানকার কেউ?”

“না, আফ্রিকার।”

একটু অবাক হলাম। আমি ওডিনকে ব্ল্যাক আমেরিকান বলেই জানি। এখানেই জন্ম, এখানেই বড় হয়েছে। মিডওয়েস্টার্ন অ্যাকসেন্টে কথা বলে। হয়তো সেকেন্ড জেনারেশন।

“আফ্রিকার? আঙ্কল তো সারাজীবন আফ্রিকাতেই ছিলেন, উনি নিশ্চয় চিনবেন। প্রীতমের কাছে শুনেছি, কোম্পানির অনেক লোককেই পার্সোনালি চেনেন।”

ওডিন হাসল, “হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে ওঁদের কোম্পানিতে।”

“তা ঠিক। কিন্তু ওডিন, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এদেশের ছেলে, তোমার সঙ্গে আফ্রিকার এত কানেকশন হল কী করে? কবে তোমার বাবা-মা এদেশে এসেছেন?”

“সে অনেক বছর।” মনে হল উত্তরটা একটু এড়াতেই চাচ্ছে। ব্যাক্তিগত ব্যাপার, আমিও আর বেশি প্রশ্ন করলাম না। এদেশে প্রাইভেসিটা সবাই মেনে চলে।

সামার শেষ হতে মাত্র সপ্তাহ তিনেক বাকি। অফিসে ঢুকে দেখলাম, ডেস্ক-এ একটা নোট...

May I get a three-week break to find my roots?
Best, OS.

নোটটা ওডিনের। সবসময় OS লেখে। ওডিন আর সেকো-র প্রথম দুটো অক্ষর। যাঁরা ‘Best’ দেখে অবাক হচ্ছেন, তাঁদের বলি, এদেশে অনেকেই ‘With best wishes’ না লিখে সংক্ষেপে ‘Best’ লেখে।

বেভকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী ব্যাপার?” বেভ আমাদের অফিস অ্যাসিস্টেন্ট, ভালো বন্ধুও।

“ওর কী একটা জানি জরুরী কাজ, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাবে, তাই নোটটা লিখে রেখে গেছে।”

“‘Find my roots!’...আমার তো মনে হচ্ছে অ্যালেক্স হেইলির কুন্তা কান্তের কথা... নিজের পূর্ব পুরুষকে খুঁজতে যাওয়ার মতো কোনও ব্যাপার...”

একটা ফোন আসাতে বেভ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারল কিনা কে জানে!

অ্যালেক্স হেইলির বইটার কথা অনেকে নাও জানতে পারেন। আমি নিজেই জানতাম না। বইটার কথা প্রথম শুনেছিলাম দিনুকাকার কাছে, যিনি প্রায় চার-পাঁচ দশক ধরে এদেশে আছেন। সাতের দশকে অ্যালেক্স হেইলির Roots: The Saga of An American Family বইটা একটা আলোড়ন তুলেছিল। মার্কিন মুলুকের বেশির ভাগ কালো বা ব্ল্যাক লোকদের পূর্বপুরুষরা এসেছিল কৃতদাস হিসেবে। বইটা ছিল লেখকের পূর্বপুরুষকে খোঁজার কাহিনি। এ নিয়ে বড় একটা টেলিভিশন সিরিজও হয়েছিল। আফ্রিকান-আমেরিকান জিনিওলজি নিয়ে তখনই প্রথম একটা আগ্রহের শুরু, ঝড়ের বেগে সেটা তুঙ্গে ওঠে। তারপর যা হয়, ধীরে ধীরে সেই আগ্রহ স্তিমিত। ওডিনের নোট পড়ে মনে হল আগ্রহ স্তিমিত হলেও লুপ্ত হয়নি।

আমার কাজ মোটামুটি ভালোই এগিয়ে রেখেছে ওডিন। তিন সপ্তাহ ছুটি নিলে অসুবিধার কোনও কারণ নেই। ফিরে এসে কয়েক ঘণ্টা এক্সট্রা কাজ করলেই রিপোর্টের ডেডলাইন মিস হবে না।

বিকেলে ফিরে এসে ওডিন জানাল, একটা দরকারি কাজে ওকে বাইরে যেতে হবে। ইমেল-এ যোগাযোগ করা যাবে, কিন্তু ফোনে পাওয়া যাবে না।"

"টু ফাইন্ড ইওর রুট্স?" ওর নোট থেকেই লাইনটা বলে ওর দিকে তাকালাম।

চাইলে উত্তর দিতে পারত, কিন্তু দিল না। শুধু একটু হাসল। কেন জানি না মনে হল একটু বিষণ্ণ। এ নিয়ে আর প্রশ্ন করা উচিত নয়। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, "সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

বললাম, "ও-কে, হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ।"

ফিরল সপ্তাহ তিনেক বাদেই, কিন্তু দেখি বেশ মনমরা। 'কী হয়েছে' দুয়েকবার জিজ্ঞেস করলাম। প্রতিবারই ওর উত্তর, 'আই উইল বি ওকে।'

বারবার একই প্রশ্ন করা যায় না। প্রেম-ঘটিত কিছু হতে পারে। ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলা কমাল... সব সময়েই অন্যমনস্ক। আমি ডাক্তার নই, তবে বুঝতে পারছি ডিপ্রেশনে ভুগছে।

বেভ ডিপার্টমেন্টের সবার হাঁড়ির খবর রাখে। ওর আকর্ষণীয় চেহারা আর ফ্লার্টি পার্সোনালিটির জন্যে অনেকেই সঙ্গ পেতে ওর কাছে আসে, হৃদয় উজার করে দেয়। বেভও ওডিন সম্পর্কে ক্লু-লেস। একদিন ওডিন যখন ঘরে নেই, বেভ এসে বলল "ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হেলথ সেন্টারে পাঠাও। ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার।"

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে কিছু বলেছে?"

"না, বাট আই নো।"

হাউ ড্যু ইউ নো, জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কিন্তু আমি নিজেও তো একই কথা ভাবছিলাম।

বেভ ইজ রাইট। সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হবে। ওডিন প্রথমে কথাটা কানেই তুলছিল না। শেষে প্রায় জোর করে ওকে ইউনিভার্সিটি হেলথ সেন্টারে পাঠালাম।

এদেশে ডাক্তাররা পেশেন্টদের সম্পর্কে বাইরের কাউকে কিছু বলে না। আমার এক বিশেষ পরিচিত সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে রেসিডেন্সি শেষ করে হেলথ সেন্টারে পার্ট-টাইম ডাক্তার হিসেবে কাজ শুরু করছে। ওর কাছ থেকেও কিছু আদায় করতে পারলাম না। শুধু এটুকুই জানলাম, ওডিনের মনের মধ্যে বিস্তর জট, ডাক্তাররাও খানিকটা অন্ধকারে। তবে অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেগুলো খাচ্ছে।

ওষুধ কী দিয়েছে জানি না, তাতে কিছুটা ফল মনে হয় হচ্ছে। ইদানীং আবার একটু একটু কথাবার্তা শুরু করেছে। কাজকর্ম আগের মতো করতে না পারলেও পারছে।

এর মধ্যে একদিন একেনবাবু আর আমি অফিসে বসে গল্প করছি, একটু বাদে লাঞ্চে যাব। ওডিনের আজ অফ ডে, নইলে অনেক সময় ওকেও পাকড়াও করে নিয়ে যাই। হঠাৎ বেভ ঘরে ঢুকে বলল, "তোমরা জানো, ওডিন অ্যাডপ্টেড?"

বেভ মাঝে মাঝে এরকম চমক-দেওয়া খবর আনে।

"তুমি কী করে জানলে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ওর বাবা মিস্টার জনসন কালকে এসেছিলেন ওর খোঁজে?"

"মিস্টার জনসন?" আমি বিস্মিত চোখে বেভের দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ, হি ইজ হোয়াইট। 'সেকো' পদবী ওডিন নিজের থেকে নিয়েছে।"

এবার বুঝলাম।

"আমার ধারণা ওডিন আফ্রিকা গিয়েছিল ওর বায়োলজিক্যাল পেরেন্টদের খোঁজে।"

আগেই বলেছি হ্যানো খবর নেই বেভ রাখে না।

তাও আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী করে জানলে?"

"মিস্টার জনসনই বলছিলেন। কয়েক বছর আগে... ওঁর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ওডিন মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, ওর বায়োলজিক্যাল বাবা-মা সম্পর্কে উনি কী জানেন? উনি সত্যিই খুব ডিটেল্স জানতেন না... জানতেন সেকো ছিল ওডিনের বাবার পদবী। যখন খুব ছোটো তখনই ওর বাবা-মা একটা বাজে ক্যানসার মেসোথেলিওমা-তে মারা গিয়েছিল। যে কাকা দেখভাল করেছিল, তারও ক্যানসার ধরে পড়ে। বলতে গেলে ও পাঁচ বছর বয়স থেকেই একেবারেই অনাথ। একটা অনাথ আশ্রম থেকে মিস্টার আর মিসেস জনসন ওকে আমেরিকা নিয়ে আসেন।"

"তা বুঝলাম, কিন্তু আফ্রিকা গেছে, সে খবরটা পেলে কোত্থেকে?"

"মিস্টার জনসনই বললেন। ওঁর এক বন্ধুর ল্যাবে ওডিন কিছুদিন কাজ করেছিল। এই বন্ধু বহুদিন নাইরোবিতে ছিলেন, ওডিনের পুরো হিস্ট্রি জানতেন। তাঁর সঙ্গে নাকি এ নিয়ে ওডিনের অনেক আলোচনা হয়েছে। তিনিই নাকি সেই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে ওডিনের যোগাযোগ করিয়ে দেন। মিস্টার জনসন এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, এই কিছুদিন হল জেনেছেন। ওডিন যে ওর পদবি পালটেছে, সেটাও একই সময় জেনেছেন।"

কথা শেষ করতে না করতেই বেভের ফোন বাজল, সেটা ধরতে আবার ছুটল।

আশ্চর্য! ওর রেসিউমিতে নিশ্চয় এগুলোর উল্লেখ আছে, আমি খেয়ালও করিনি। ফাইল ক্যাবিনেট থেকে ওর রেসিউমিটা বার করে চোখ বোলালাম। একেনবাবুও আগ্রহ নিয়ে দেখলেন।

"ঠিকই বলেছেন বেভ ম্যাডাম, এই তো এখানেই আছে নাম বদলানোর সার্টিফিকেট। এনারজেটিক্স ল্যাবে কাজ করার সময়। টাইমিংটাও মিলছে।"

সত্যি কথা বলতে কি, এই স্টুডেন্ট অ্যাসিস্টেন্টদের ব্যাপারে আমি তেমন মাথা আমি ঘামাই না। ডিপার্টমেন্ট যাকে পাঠায় তাকেই নিয়ে নিই। ভালো করে ওডিনের রেসিউমিও দেখিনি।

"আফ্রিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা আমারও মনে হয়েছিল," একেনবাবুকে বললাম, "কিন্তু অন্য একটা জিনিস ভেবে।"

"বুঝলাম না স্যার, তার মানে?"

"আমাকে একটা নোট লিখেছিল।"

"কী নোট স্যার?"

"এখানেই আছে সেটা।"

ডেস্ক ড্রয়ারের মধ্যে ওডিনের নোটটা ছিল। বার করে একেনবাবুর হাতে দিলাম।

নোটটা পড়ে একেনবাবু বললেন, "এইজন্যেই স্যার, মিস্টার ওডিনকে ভালো লাগে। কোনও লুকোছাপা নেই। সরাসরি লেখেন। নিজের রুট্স খুঁজতেই তো গিয়েছিলেন।"

"তা ঠিক, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অ্যালেক্স হেইলির কথা... দেড়শো দুশো বছর আগের পূর্বপুরুষকে খুঁজতে যাওয়া... ক্রীতদাস হিসেবে যাঁদের আনা হয়েছিল। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের কথা ভাবিনি।"

"সে তো স্যার মিস্টার ওডিনের দোষ নয়, আপনার বোঝার দোষ।" হাসিহাসি মুখে একেনবাবু বললেন।

।। ৪।।

দত্তক বা অ্যাডপ্টেড ছেলেমেয়েদের নানান সমস্যার কথা আমি এর-ওর মুখে কিছু শুনেছি। প্রমথর ল্যাবে কাজ করে এরিক স্ট্রুবিং, সেও অ্যাডপ্টেড। এরিক গল্প করতে ভালোবাসে। প্রমথর ল্যাবে গেলেই একটা না একটা ছুতো করে কিছুক্ষণ গল্প করে যায়। মজা করেই বলে ওর সমস্যার কথা। এদেশে কোনও ডাক্তারের অফিসে গেলে ফর্ম ফিল-আপ করতে হয়। ফ্যামিলিতে কারো ডায়াবিটিস আছে কিনা, হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, ক্যানসার হয়েছিল কিনা, ইত্যাদি নানান প্রশ্ন থাকে সেখানে।

"কী করে এর উত্তর জানব?" এরিক গল্প করত, "যাকে বাবা বলে জানি, তার তো চোদ্দপুরুষের কোনও ডায়াবিটিস ছিল না, আর আমার তো তেইশ বছরেই ধরা পড়ল! ওইসব প্রশ্নের উত্তরে আমি লিখি জি-ও-ডি... গড ওনলি নোজ। ডাক্তারের অফিসের লোকেরা বিরক্ত হয়, ভাবে আমি মজা করছি!"

ইদানীং অবশ্য ন্যাচারাল পেরেন্টসের মেডিক্যাল রেকর্ড জোগাড় করা হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে। আগে সেভাবে হত না। সত্যি কথা বলতে কি, অ্যাডপ্টেড ছেলেমেয়েদের এই সমস্যাগুলো আমরা অনেকেই বুঝি না। আর এগুলো তো শুধু দেহ-সংক্রান্ত, মনের দিকটা আরও বেদনাময়। একটা তীব্র চাপা ক্ষোভ অ্যাডপ্টেড ছেলেমেয়েদের পীড়িত করে... কেন নিজের বাবা-মা ওদের পরিত্যাগ করলেন? কী দোষ

ওরা করেছিল? বিশেষ করে শেষ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনও উত্তর নেই। আজীবন এই প্রশ্নগুলো নিয়েই ওদের কাটাতে হয়... কষ্টটা কারও কম, কারও বেশি।

এরিক খুব মজা করেই কথাগুলো বলত, কিন্তু পেছনে চোখের জলটা ঠিক লুকোতে পারত না। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে জন্মদাতা বাবা-মায়ের সন্ধান করতে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল দক্ষিণ দিকে। ফিরেছিল বিমর্ষ হয়ে। অনেক খুঁজতে খুঁজতে শেষে অ্যালাবামাতে পৌছে এরিক জেনেছিল ওর মা অ্যালকোহলিক, থাকে হোমলেস শেল্টারে। বাবা জেল-খাটা আসামি, বহুদিন জেল খাটার পর অল্প সময়ের জন্য ছাড়া পেয়ে আবার জেলে। সেখানেই মৃত্যু। অর্থাৎ বাপ-মা'র দিকে নাথিং টু বি প্রাউড অফ, না জানলেই বোধহয় ভালো হত। সে রকম কিছু হলেও হতে পারে ওডিনে ক্ষেত্রে, কে জানে? যেটা পজিটিভ, সেটা হল ওডিন ধীরে ধীরে নর্মাল হচ্ছে। কথাবার্তাও অনেক বেশি বলছে।

ইতিমধ্যে একদিন প্রীতম এল। ইংল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। ঠিক বেড়াতে যাওয়া নয়। একটি ভারতীয় ব্রিটিশ মেয়েকে ডেট করছিল বেশ কিছুদিন ধরে। তার আমন্ত্রণেই গিয়েছিল বার্মিংহামে, মেয়েটির বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হয়ে গেল। একেবারে বিয়েটাই সেরে ফেলল। ধুমধাম যা কিছু ওখানেই হয়েছে। প্রীতমের মেজোমামা লন্ডনে থাকেন। লন্ডনেই ওদের ইউরোপিয়ান হেড কোয়ার্টার। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে রিসেপশনটা মেজোমামাই দিয়েছেন লন্ডনে। এখানকার আয়োজন ছোটোখাটো, মূলত আন্টির উদ্যোগে। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, যারা লন্ডনে যেতে পারেনি তাদের জন্য। নিমন্ত্রণ পত্র অবশ্য আগেই পেয়েছি, RSVP-র উত্তরও দিয়েছি। একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে হওয়ার কথা ছিল। কোনও কারণে সেখানে হচ্ছে না। সেটা জানাতেই প্রীতম এসেছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়, বাড়িতেই ম্যানেজ করা যাবে।

আমার একটাই সমস্যা, পরের সপ্তাহে গ্র্যান্টের ইন্টারিম রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্রচুর কাজ বাকি আছে। অর্ধেক দিন নষ্ট করার সময়ও আমার নেই, অথচ প্রীতমের বিয়ের রিসেপশনে না গেলেও চলবে না। ওডিনকে বললাম ও যদি গ্রাফ আর টেবিলগুলো রিপোর্টে বসিয়ে দেয়। মুশকিল হল, সেগুলো সংখ্যায় অনেক, ঠিক মতো ফোরম্যাট করে বসাতে সময় লাগবে। তবে ওডিন দেখেছি কাজটা ভালো পারে। তাও আমি সতর্ক যদি কিছু গুবলেট করে, তাই লেখার একটা কপি রেখে কাজটা ওকে দিলাম।

কাজটা নিতান্তই ব্যক্তিগত কাজ, সেটা আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। অনুরোধ করতে একটু সংকোচই হচ্ছিল, কিন্তু ছেলেটা সত্যিই ভদ্র। বলল, “কোনও সমস্যা নেই।” তারপর জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাচ্ছি?”

বললাম। তখনই জানলাম, ওদের পরিবারে ঠাকুরদা থেকে শুরু করে অনেকেই প্রীতমের মামাদের কোম্পানিতে কাজ করতেন। তাতে অবশ্য অবাক হলাম না। প্রীতমের কাছেই শুনেছি, ইস্ট আফ্রিকার বহু লোকই ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে বা করেছে।

“ভালো হল,” আমাকে বলল, “উনি এখানে আছেন শুনে আমার আঙ্কল আর আন্টি ওঁকে দেবার জন্য আমার সঙ্গে একটা গিফট দিয়েছেন। বুঝতে পারছিলাম না, কী করে ওঁদের হাতে পোঁছে দেব।”

“এতে কী আছে, আমাকে দিয়ে দিতে পার। আমি তো যাচ্ছিই।”

যেদিন রিসেপশন সেদিনই সকালে এসে ও আমার হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট দিল প্রীতমের মামাকে দেবার জন্যে। বলল, "আঙ্কল আন্টির ভালো নাম ওঁর মনে থাকার কথা নয়, তবু যদি ডাক নাম মনে থাকে।"

সুন্দর রংচঙে রাংতা কাগজে মোড়া একটা উপহার। সঙ্গে একটা চিরকুট। চিরকুটটা ভালো করে দেখিওনি, যাবার আগে নজরে পড়ল। স্কচ-টেপ দিয়ে রাঙতার ওপর লাগানো।

> Dear Sir,
> I am the youngest nephew of Binni and Jackie Seko. You may know them as
> Best
> OS

একেনবাবুকে চিরকুটটা দেখিয়ে বললাম, "কী কাণ্ড দেখুন, তাড়াহুড়োতে আঙ্কল-আন্টির ডাকনামটাই লেখেনি।"

"তা তো দেখছি স্যার। একবার ফোন করুন না, আপনিই না হয় লিখে দিন নামটা।"

একবার ফোনে ধরার চেষ্টা করলাম। পেলাম না।

।। ৫ ।।

চারটে নাগাদ আঙ্কল-আন্টির বাড়িতে ঢুকতেই হলওয়েতে আঙ্কলের সঙ্গে দেখা। অচেনা একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন।

"এসো এসো, তোমাদের আন্টি চিন্তা করছিল ভেনু পালটে যাবার খবরটা পেয়েছিলে কিনা।"

"না না, প্রীতম জানিয়ে দিয়েছিল।"

প্রমথর হাতে বিয়ের উপহারটা ছিল। আগের বার আসেনি বলে উপহার কেনা ও আনার দায়িত্ব প্রমথর ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। বাক্সটা সাইজে বড় এবং ভারী। যে প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা ছিল, সেটা আবার ছিঁড়ে গেছে! প্রমথ হিমিসিম খাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই প্রমথর সঙ্গে আঙ্কলের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

"বাঃ, খুশি হয়েছি তুমি এসেছো।" প্রমথর অবস্থা দেখে হলওয়ের একদিকে একটা বড়সড় টেবিল দেখিয়ে আঙ্কল বললেন সেখানে রাখতে।

ওডিনের গিফটটা আঙ্কলকে দিয়ে বললাম, "এটা আমার এক অ্যাসিস্টেন্ট ওডিন আপনাকে দিতে বলেছে। ওর আঙ্কল আর আন্টি আপনার কোম্পানিতে কাজ করত। তারা এটা আপনাকে পাঠিয়েছে।"

আঙ্কল একটু বিস্মিত হয়ে প্যাকেটটা নিলেন। চিরকুট পড়ে নামটা চিনেছেন বলে মনে হল না।

"ডাকনাম বললে চিনবেন ওডিন বলেছিল, কিন্তু তাড়াহুড়োতে সেটা লিখতেই ভুলে

গেছে!”

“হতে পারে। তোমার অ্যাসিস্টেন্টকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। পরে তোমাকে একটা থ্যাঙ্ক ইউ নোট পাঠিয়ে দেব। ঠিক জায়গায় পৌছে দিও।”

“নিশ্চয় আঙ্কল।”

“ভালো কথা, তুমি যে বল্লরীকে পড়িয়েছিলে আমি জানতাম না। কালকেই শুনলাম, গুড।”

বল্লরী একটা টার্ম পেপার নিয়ে হিমসীম খাচ্ছিল। তখন প্রীতম ওকে নিয়ে আমার অফিসে এসেছিল। খুব অল্পই সাহায্য করেছিলাম। সেটাই কারো কাছে শুনে বোধহয় আঙ্কলের ধারণা হয়েছে আমি বল্লরীকে পড়িয়েছি! এই ভ্রান্ত ধারণাটা ভাঙার সুযোগ পেলাম না। কিছু বলার আগেই এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে বললেন, আমাদের টেরাসে নিয়ে যেতে।

ডাইনিং রুমের টেরাসে ককটেল ও স্ন্যাকস-এর বন্দোবস্ত। সেখানে অনেকগুলো টেবিল আর চেয়ার সাজানো। তারই একটা দখল করে আমরা বসলাম। আর একজন সেখানে বসে ছিল, ধোপ-দুরস্ত পোশাক, আমাদেরই মতো বয়স। চেহারাটা চেনা চেনা লাগল, কিন্তু কোথায় আগে দেখেছি মনে করতে পারলাম না। ‘হ্যালো’ বলে উনিই আলাপ সুরু করলেন। নাম অমল মিত্র। নিজের পরিচয় দিলেন ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির সেলস ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ বলে। আমরা সবাই নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত শুনে বললেন, উনিও এদেশে এসে প্রথমে ভেবেছিলেন গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

“তাতে খুব ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!”

প্রমথর এটা বলার কোনও দরকার ছিল না। এমনিতেই ও ডিপ্লোমেসির ধার ধারে না, তার ওপর এতটা পথ ভারী গিফট বইতে হয়েছে, মেজাজটা প্রসন্ন ছিল না। টেরাসে ঢুকে মেজাজটা আরও বিগড়েছে। এটা যে এত ফর্মাল ব্যাপার আমরা কেউই বুঝিনি। সবাই দামি স্যুটবুট পরা, আমরাই শুধু হংস মধ্যে বক যথা। সাধারণ সার্ট আর প্যান্ট। একেনবাবুর পোষাকের বিবরণ না দেওয়াই ভালো।

আমাদের পরিচয়টা জানার পর অমল মিত্র দেখলাম জানার চেষ্টা করছেন, আমরা কার আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। সরাসরি প্রশ্ন নয়, নানান অ্যাঙ্গেল থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বুঝতে পারছিলাম প্রমথ তাতে আরও চটছে। তাই বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে কানেকশনটা বলে দিলাম। সেটা শুনে অমল মিত্র উঠে কোথায় জানি গেলেন।

প্রীতম আর ওর নববধূ মল্লিকা সবাইকে অপ্যায়ন করছে। মল্লিকাকে আমরা বিয়ের আগে থেকেই চিনি। অক্সফোর্ড থেকে বি এ পাশ করে এখন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ল’ পড়ছে। খুব হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে। ইংল্যান্ডে জন্মেছে বলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলে। ‘শেইম’ বলে না, বলে ‘শাইম’। র-এর উচ্চারণ প্রায় শোনাই যায় না, গার্ল, ফার্স্ট এইসব কথাতে।

প্রীতমের মামাতো বোন বল্লরীও ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘাঙ্গি, ঢলঢলে মুখ। টানা উজ্জ্বল চোখ। দু’কাঁধ বেয়ে নেমে আসা লম্বা ঘন চুল, সচ্ছন্দে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন দেওয়ার

মতো। এমনিতেই সুন্দর দেখতে, আজকে একটু বেশী সাজায় স্টানিং লাগছে। শাড়িটাই শুধু একটু কোথায় জানি শুনেছিলাম কথাটা, ঝাল্লা মাড়োয়াড়ি ওভার-ব্রাইট টাইপের। ওর সঙ্গে ঘুরছে গুচি'র ডেনিম জিন-জ্যাকেট পরা একটা হলিউডি চেহারা। চকচকে মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর ব্যাকব্রাশ করা জেল-মাখা চুল। গলায় রুপোর চেন, বুক-খোলা লাল রঙের সার্টের মাঝখানে সেটা চকচক করছে। হাতে রুপোর ব্রেসলেট। ছেলেটাকে আগে দেখিনি। বল্লরী যখন আমাদের টেবিলে 'হ্যালো' বলতে এল, তখন পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বন্ধু বিপ্লব।

ইতিমধ্যে অমল মিত্র ফিরে এসেছেন। দেখলাম বল্লরীকে ভালো করেই চেনেন, বিপ্লবকেও। ওরা চলে যেতে নিজের থেকেই জানালেন ম্যানহাটানে বিপ্লবের বাবার একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের স্পেশালিটি স্টোর আছে। বিপ্লবের আগে একটা ব্যান্ড ছিল। সেখানে সুবিধা না করতে পেরে এখন মডেলিং করছে। কথার সুরেই বুঝলাম বিপ্লবকে খুব একটা পছন্দ করেন না।

কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা গল্প করতে ভালোবাসেন। অমল নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। ওঁরা তিন পুরুষ আফ্রিকায় সেটল্ড। ঠাকুরদা যে প্রীতমের দাদুর উকিল ছিলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে গেলাম! সেই সূত্রেই প্রীতমের পরিবারের সঙ্গে পরিচয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইংল্যান্ডেও গিয়েছিলেন। সেখানে কী হল না হল জানানোর কোনও দরকার ছিল না... কান একেবারে ঝালাপালা! সত্যিকথা বলতে কি, কী করে এই বক্কেশ্বরকে টেবিল থেকে ভাগাব, সেটাই ভাবছিলাম। ভাগ্যক্রমে একটু বাদেই আন্টি এসে অমলকে ডেকে নিয়ে গেলেন কী একটা কাজ করানোর জন্যে। অমল চলে যেতেই প্রমথ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "হ্যাঁরে, বিপ্লবকে হটিয়ে তুই ফিল্ডে নেম পড় না! বল্লরীর মতো বউ পাবি, আর বিশাল রাজত্ব।"

ভাগ্যিস কেউ শুনতে পায় নি, রাস্কেল একটা! কিন্তু তাতে কি নিস্তার আছে! একেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "কী গোপন কথা হচ্ছে স্যার?"

প্রমথ অম্লান বদনে বলল, "বাপিকে একটু সেট্ল করানোর চেষ্টা করছি।"

আমি বললাম, "শাট আপ! তুই নিজে আগে সেট্ল হ।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন স্যার, কী নিয়ে সেট্ল?"

"ওর কথায় কান দেবেন না একেনবাবু, প্রমথ বাজে বকছে।"

"কী যে বলেন স্যার, প্রমথবাবু কখনও বাজে বকেন না।"

একেনবাবুর একটা অনুসন্ধিৎসা জাগলে, সেটা না মেটা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন না। ঘ্যানঘ্যান করে মারবেন আর তখন বিশ্বশুদ্ধ লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করবে কী ঘটেছে! সেটা বন্ধ করার জন্যেই একেনবাবুকে কানে কানে প্রমথর স্টুপিড মন্তব্যটা শুনিয়ে দিলাম।

একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "এটা প্রমথবাবু ভালো বলেছেন। হলে তো খুবই ভালো হত স্যার।"

"দুম করে কথাটা বলে দিলেন? তাহলে বেভ ম্যাডামের কী হত?"

বেভের পরিচয় আগেই দিয়েছি, আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাজ করে, অফিস অ্যাসিস্টেন্ট। আমাকে পছন্দ করে, আমিও করি। তার বেশি কিছু নয়। প্রমথ সেটাকেই তিল থেকে তাল করে আমাকে হেনস্তা করার জন্য। একেনবাবুও মাঝে মাঝে সায় দেবার

চেষ্টা করেন।

"তাও তো বটে স্যার।"

"ব্যাস, এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়!" আমি ধমক লাগালাম।

এর মধ্যে দুটো ছেলে এসে একসঙ্গে বৃটিশ উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে?"

বোধহয় যমজ, বয়স বড় জোর দশ এগারো হবে। বোঝা যায় বেশ বজ্জাত। উত্তর দিলাম, "আমরা ব্রাইডগ্রুমের বন্ধু, তোমরা কে?"

"আমরা?" হা হা করতে করতে পালাল, আর কাউকে জ্বালাতে!

"নিশ্চয়, প্রীতমের মামা বাড়ির কেউ হবে। বজ্জাত দ্য গ্রেট!" একেনবাবু আর প্রমথকে বললাম।

প্রমথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। সময়ে আমাদের পাশের টেবিল থেকে ড্রিংকস-ভর্তি একটা গ্লাস ফেলে দিয়ে ছোঁড়াদুটো আবার পালাল।

"আরে, আরে!" সবার মনোযোগ সেদিকে গেল। কাচের কয়েকটা টুকরো ছিটকে এসে আমার জুতোর ওপরেও পড়েছিল। দাঁড়িয়ে উঠে প্যান্টটা আর জুতোটা একটু ঝাঁকিয়ে টেবিল থেকে সরে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ব্রাশ, হ্যাণ্ড-ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে পরিষ্কার করার লোক এসে হাজির। বাঁচা গেল!

।। ৬।।

ভ্যাকুয়ার ক্লিনারের ঘড়ঘড়ের মধ্যেই অমল হাসি হাসি মুখে ফিরে এসেছেন, "আজকে একটা দারুণ ব্যাপার হবে। একটু বাদেই রবার্ট দত্ত আসছেন।"

"রবার্ট দত্ত? যিনি বেহালা বাজান?" নামটা আমি জানতাম।

"হ্যাঁ, মিউজিক প্রডিজি রবার্ট দত্ত। বিপ্লবের বাবার কাছ থেকে আঙ্কল একটা 'ডেল গেসু' কিনেছেন এক মাস আগে। আমি রবার্ট দত্তকে খুব করে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যদি একবার এসে বাজিয়ে দেখেন বেহালাটা কী রকম? কথা দিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কে যখন আসবেন তখন বাজিয়ে দেখবেন। গতকাল নিউ ইয়র্কে এসে ফোন করেছিলেন আজকে আসার চেষ্টা করবেন বলে। কনফার্ম করলেন, এক্ষুনি আসছেন... কিন্তু খুব তাড়া আছে, একেবারেই বসবেন না।"

আমরা কিছু বলার আগেই কাকে জানি দেখতে পেয়ে 'এই যে, হ্যালো' বলতে বলতে ছুটলেন।

একেনবাবুর মুখ দেখে মনে হল অমল মিত্রের কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেননি। 'ডেল গেসু' যে বেহালার একটা বিখ্যাত ব্র্যান্ড, সেটা না জানা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমি নিজেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানতাম না। কথায় কথায় প্রমথর গার্লফ্রেন্ড ফ্র্যান্সিস্কা পুরোনো দিনের ভালো বেহালা প্রসঙ্গে নামটা তুলেছিল বলে জেনেছি।

অমল মিত্র চলে যেতেই একেনবাবু যেই 'ডেল গেসু' কী জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার জ্ঞানভাণ্ডার উজার করে দিলাম!

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। এখন বুঝতে পারছি সামনে উঁচু পোডিয়ামটা কেন রাখা হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো বর-বউ বসবে। কিন্তু উঁচু চেয়ার ছাড়া তো ওখানে আর কিছুই নেই। আচ্ছা স্যার, এই রবার্ট দত্ত কি খুব ফেমাস বেহালা বাজিয়ে? নামটা কেন জানি চেনা চেনা লাগছে?"

"ইৎসাক পার্লম্যান বা ইহুদী মেনুহিনের মতো নিশ্চয় নন। তবে একজন উঠতি প্রতিভা।"

"আপনি চেনেন স্যার?"

"না, তবে নাম শুনেছি। আরও শুনেছি কারণ কিছুদিন আগে ওঁকে নাকি খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আপনিও হয়তো সেই সূত্রেই নামটা শুনেছেন।"

"ও হ্যাঁ স্যার, মনে পড়েছে। আপনি একটা 'ন্যাশেনাল এনকোয়ারার' এনেছিলেন, সেখানে পড়েছিলাম।"

'ন্যাশেনাল এনকোয়ারার' সাধারণ ভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। নানান উলটোপালটা উত্তেজক খবর ওতে থাকে। কে জানি আমার অফিসে একটা কপি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। সেখানেই ছিল একটা কোরিয়ান গ্যাং নাকি রবার্ট দত্তকে খুন করার চেষ্টা করছে। কারণ? রবার্ট দত্তকে সরাতে পারলে কয়েকজন উঠতি কোরিয়ান মিউজিশিয়ানের পসার হবে। তাতে লাভ? তার উত্তরও ওখানে দেওয়া ছিল। জুলিয়ার্ড বা বড় বড় মিউজিক স্কুলে পড়তে পয়সা লাগে। আরও অনেক পয়সা লাগে ভালো ভালো কোয়ালিটির কোনও ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে। সত্যিকারের ভালো বেহালা বা চেলোর দাম হাজার হাজার ডলার। একজন ছাত্রের পক্ষে সেসব কেনা সাধ্যের বাইরে। যেসব ছাত্রদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে ইনভেস্টররা তাদের পেছনে টাকা ঢালে। কনট্রাক্ট থাকে, তারা রোজগার করতে শুরু করলে একটা পার্সেন্টেজ ওদের দিতে হবে। সুতরাং মিউজশিয়ানের পসারের সঙ্গে ইনভেস্টারদের রিটার্নের একটা স্বার্থ জড়িত। এইসব ইনভেস্টরদের আবার আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশন আছে।

আমার বিশ্বাস এটা পুরোপুরি গঞ্জিকাসেবন করে লেখা... বিন্দুমাত্র সত্য এতে নেই, কিন্তু পড়তে ইন্টারেস্টিং।

মনে মনে নিশ্চয় সেই খবরটাই ঝালাচ্ছিলেন একেনবাবু। আমাকে ছেড়ে এবার প্রমথকে ধরলেন।

"স্যার, আপনি চেনেন রবার্ট দত্তকে?"

"কেন মশাই, বাঙালি বলেই চিনতে হবে?"

"তা নয় স্যার, পাঞ্জাবিরাও তো দত্ত হয়।"

"তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন?" খোঁটা না দিয়ে প্রমথ পারে না!

খানিক বাদেই একজন মেমসায়েবের সঙ্গে যিনি ওপরে এলেন, তিনিই নিশ্চয় রবার্ট দত্ত। অমল মিত্র শশব্যস্ত হয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করতে ছুটলেন। শ্যামলা রঙ, বেঁটেখাটো চেহারা। মেমসায়েব খুব সেজেগুজে, ফর্মাল ড্রেস পরা। রবার্ট দত্ত পরেছেন সাদা শার্ট, কালো বো-টাই আর টাক্সেডো। পায়ে ঝকঝকে কালো অক্সফোর্ডের জুতো। বোঝাই যাচ্ছে কোনও ব্ল্যাক-টাই ডিনারে যাচ্ছেন। পথে এখানে কিছুক্ষণের জন্য এসেছেন। কোনও দিকে না তাকিয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলে পোডিয়ামের সামনে দুটো চেয়ারে দু'জন বসলেন। একজন অ্যাসিস্টেন্টকেও দেখলাম একটা বেহালার বাক্স হাতে। তিনিও পাশের চেয়ারে বসলেন। অমলের সঙ্গে কী কথা হচ্ছে আমরা বুঝলাম না, তবে হাতঘড়ি

দেখা আর হাত-পা নাড়া দেখে মনে হল ওঁর খুবই তাড়া আছে। অমল ওঁকে কিছু বলে দ্রুতগতিতে বাড়ির ভিতরে গিয়ে আঙ্কলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। আঙ্কলের হাতে একটা বেহালা, নিশ্চয় ওটাই ডেল গেসু-র সেই বেহালা। আঙ্কলের সঙ্গে রবার্ট দত্তর পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর আঙ্কলের আমন্ত্রণে রবার্ট দত্ত পোডিয়ামে উঠলেন, কিন্তু চেয়ারে বসলেন না। বেহালার বাক্সটা ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট খুব সাবধানে টেবিল-এর ওপর রাখলেন।

আঙ্কলের হাত থেকে বেহালাটা নিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে টেবিলে রাখা বেহালার বাক্স থেকে একটা ছড় তুলে বেহালায় টান দিতে যাবেন, হঠাৎ দুম করে আওয়াজ! সঙ্গে সঙ্গে টেরাসের সাইডে বসানো একটা বড় গ্লোবলাইট ফেটে কাচগুলো ছিটকে পড়ল! সেই ধাক্কা কাটতে না কাটতেই আরেকটা আওয়াজ! এবার ওর পাশের গ্লোব লাইটটা ফাটল! আলো-অন্ধকারের মধ্যে প্রায় প্যান্ডেমোনিয়াম! পত্রপত্রিকায় আর টিভিতে বন্দুকবাজদের আচমকা হানা দেবার খবর শুনে শুনে আজকাল সবাই সতর্ক এবং ভীত। কেউ কি গুলি চালাচ্ছে? দেখে কাজ নেই... সবার সাথে আমিও পড়ি কি মরি করে ডাইনিং রুমের দিকে দৌড়েছি। প্রমথ আমার পেছনে। ধাক্কাধাক্কি করে কোনওমতে ডাইনিং রুমে পৌঁছে দেখি বুক ধড়াস ধড়াস করছে। এর মধ্যে যাঁরা আগে ছিলেন তাঁদের বেশ কয়েকজন দরজা দিয়ে হলওয়েতে চলে গেছেন। সেখানেই লিফট এবং সিঁড়ি। প্রমথ আমার পাশে, কিন্তু একেনবাবু নেই। টেরাসের দিকে সাহস করে তাকাতে চোখে পড়ল রবার্ট দত্ত কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। মেমসাহেব সঙ্গিনী বেহালার বাক্স হাতে নিয়ে ওঁর হাত ধরে টানাটানি করছেন। অ্যাসিস্টেন্টটি উধাও, আঙ্কলকেও দেখতে পাচ্ছি না। পুরো টেরাসে ওঁরা দু'জন ছাড়া গোটা কয়েক লোক। যাঁরা আছেন, তাঁদের কয়েকজন আত্মরক্ষার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। আমাদের একেনবাবুও টেরাসে আছেন। তবে মাটিতে শুয়ে নয়, চেয়ারেই বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন□বলিহারি সাহস ওঁর! ইতিমধ্যে জনা কয়েক সিকিউরিটির লোক রিভলবার হাতে ডাইনিং রুমের কাচের দরজায় সামনে এসে গেছে। তারা দ্রুত গতিতে টেরাসে ঢুকে রবার্ট দত্ত আর বাকি সবাইকে ভিতরে নিয়ে এসেছে। একেনবাবুও সবার পেছন পেছন এসেছেন। সবকিছুই কয়েক মিনিটের মধ্যে। কেউ বোধহয় পুলিশকেও খবর দিয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এখন বিল্ডিং-এর নীচে, রাস্তায়।

ভাবছি এখন কী ঘটবে! অতিথিদের কেউ গুলি চালিয়েছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এরমধ্যে অভ্যাগতদেরই একজন প্রস্তাব দিলেন সবাইকেই সার্চ করা হোক, সকলের নিরাপত্তার জন্যেই এটা প্রয়োজন। কিন্তু এভাবে অতিথিদের সার্চ করতে বলাটাও তো গৃহস্বামীর পক্ষে লজ্জাজনক। কাছেই দেখলাম আঙ্কল খানিকটা বিধ্বস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। সিকিউরিটির একজন ওঁকে কিছু বলছে, উনি সম্মতি-সূচক মাথা নাড়ছেন। পেছন থেকে এক ভদ্রলোককে নীচু গলায় কাউকে বলতে শুনলাম, "গুলিটা রবার্ট দত্তকে মারার জন্যেই করা হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে দু'বারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।" যাঁকে কথাটা বললেন, তিনিও কেমন যেন সায় দিলেন, "হ্যাঁ, আগেও তো চেষ্টা করা হয়েছিল।"

কেন এখানে এসে কেউ রবার্ট দত্তকে খুন করতে চাইবে আমার কাছে সেটা স্পষ্ট নয়। তবে যদি সত্যিই কেউ সেই চেষ্টা করে থাকে, তাহলে নিশ্চয় টেরাসে ঢোকার মুখে বাঁদিক থেকে করেছে। সেখানে একটা টেম্পোরারি গ্রিল-এ কেটারারদের কিছু লোক সাদা কোট পরে কাবাব গ্রিল করছিল। একমাত্র সেক্ষেত্রেই টার্গেট মিস করে ওই দুটো

গ্লোবলাইট চুরমার হতে পারে। কেটারিং-এর লোকদেরই কি কেউ সেই কোরিয়ান গ্যাং-এর? সেক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজনকে সার্চ করলেই চলবে। রবার্ট দত্তকেও দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে অমল মিত্রের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত ব্যাজার মুখ, একটু যেন ভীতও। অল্পক্ষণের জন্যে বাজাতে এসে এই ঝামেলার মধ্যে পড়বেন বোধহয় ভাবেননি! ইতিমধ্যে কয়েকজন পুলিশও নীচ থেকে ওপরে উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন সার্জেন্ট বিল। তিনি দেখলাম একেনবাবুকে খুব ভালো করে চেনেন। একেনবাবুকে দেখে তিনি এগিয়ে যেতেই আড়ালে ডেকে একেনবাবু তাঁকে কিছু বললেন। তারপর দু'জনে মিলে টেরাসে সেই ফাটা বাতি দুটো পরীক্ষা করে ফিরে এলেন। সার্জেন্ট বিল-এর নির্দেশে একজন অফিসার গিয়ে একটা ছোট্ট কৌটোয় কিছু পুরে নিয়ে এল। বিল গলা উঁচু করে সবাইকে বললেন, "ইট্স অলরাইট, আপনারা এখন পার্টি করতে পারেন। দেয়ার ওয়াজ নো শ্যুটিং।"

"তাহলে কাঁচটা ভাঙল কী করে?" একজন প্রশ্ন তুললেন।

"কেউ প্র্যাক্টিক্যাল জোক করেছে, বাট নো বডি গট হার্ট। সো ম্যাটার্স এন্ড।"

ইতিমধ্যে একেনবাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

"কী ব্যাপার?"

"কেউ স্যার গ্লোব দুটো বেস থেকে তুলে ভিতরে বড়সড় পটকা রেখেছিল। বাতির গরমে পটকা দুটো ফেটেই এই বিপত্তি।"

আমার কেমন মনে হল, এটা নিশ্চয় ওই দুই যমজ ভাইয়ের কীর্তি। সেটা বুঝলাম যখন দেখলাম একজন বয়স্ক মহিলা কিচেনের সামনে দুটোকে ধরে আচ্ছাসে বকছেন আর ছেলেদুটোর কাঁদো কাঁদো মুখ। পুলিশ-টুলিশ দেখে ভয় পেয়ে বোধহয় দোষ স্বীকার করেছে! এসব ক্ষেত্রে পুলিশ অ্যারেস্ট করে, জ্যুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্ট বলে ছাড় পায় না। বিলের সঙ্গে আঙ্কল দেখলাম কথা বলছেন। শেষমেশ পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট না করেই চলে গেল। ছোঁড়া দুটোকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে কোথাও রাখা হল। নিশ্চিন্তি!

আমরা আবার টেরাসে ফিরে গেলাম বটে, কিন্তু ছন্দপতন যা ঘটার ঘটে গেছে। একটি কাজের লোক এসে দ্রুত ভাঙা কাচগুলো তুলে জায়গাটা ভ্যাকুয়াম করে চলে গেল। রবার্ট চলেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু অমলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাখ্-এর সোনাটা নম্বর ওয়ান থেকে একটু অংশ বাজাতে রাজি হলেন। বেহালাটা টেবিলেই ছিল। সেটা তুলে চিবুকের নীচে ভালোভাবে বসিয়ে ছড়ের একটা টান দিয়েই বললেন, "দিস ইজ নট এ ডেল গেসু।"

"হোয়াট?" কথাটা শুনে আঙ্কল দেখলাম উত্তেজিত হয়ে পোডিয়ামে উঠে পড়েছেন।

অমল উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আর ইউ শিওর?"

"আমি ডেল গেসু-র আওয়াজ জানি, শুধু ডেল গেসুই আমি বাজাই। এই বেহালা ডেল গেসু হতে পারে না।" বলে হাতের বেহালাটা নামিয়ে টেবিলে রাখলেন।

"কিন্তু এটার এমব্লেম তো ডেল গেসু-র?" এবার কথাটা বললেন আঙ্কল।

"মাস্ট বি ফেক!" বেশ চাঁছাছোলা ভাবেই রবার্ট দত্ত তাঁর রায় দিলেন।

"আই পেইড মোর দ্যান এ মিলিয়ন ফর দিস!" বেশ রাগত স্বরেই আঙ্কল কথাটা বললেন।

"ওয়েল," কাঁধটা ঝাঁকিয়ে রবার্ট নিজের বেহালার বাক্সটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর আঙ্কলকে বললেন, "এ জেনুইন ডেল গেসু ইজ নট চিপ।"

পোডিয়াম থেকে নেমে ইশারায় সঙ্গিনীকে ডেকে রবার্ট বেরিয়ে যাবার জন্যে ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়ালেন। তারপর বোধহয় আঙ্কলের জন্য একটু করুণা হল। একটু থেমে আঙ্কলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আই অ্যাম ট্রুলি সরি। যার কাছ থেকে কিনেছেন, তাঁকে ফেরৎ দিয়ে টাকাটা নিয়ে নেবেন। দিস ইজ চিটিং!"

পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল এত দ্রুত লয়ে যে অতিথিদের অনেকেই মনে হল বোঝেননি কী ঘটেছে। আমরা নিতান্ত সামনে ছিলাম বলে সব কিছু শুনেছি। একটু দূরে বল্লরী আর বিপ্লব। বিপ্লবের মুখ কালো, বোঝাই যাচ্ছে ঘটনার আকস্মিকতায় স্টান্ড হয়ে গেছে। বল্লরীর মুখটাও ফ্যাকাশে। হঠাৎ বিপ্লব বল্লরীকে কিছু বলে দ্রুত চলে গেল। বল্লরী ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অমল মিত্র বোধহয় সান্ত্বনা দিতে গেল। আঙ্কল ইতিমধ্যেই টেরাস থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। আন্টিই একমাত্র হাসিমুখে সবাইকে সামলাচ্ছেন। প্রীতম এরমধ্যে একবার এসে আমাদের বলে গেল, "কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হল! অমলের কী দরকার ছিল বল তো সর্দারি করে আজকে রবার্ট দত্তকে ডাকার?"

।। ৭।।

পরের দিন সকালে কফি মেকারে জল ঢালছি, দেখলাম একেনবাবু সোফায় বসে খুব মন দিয়ে ল্যাপটপে কী জানি দেখছেন।

"সাত সকালে কী পড়ছেন এত মন দিয়ে?"

"বেহালার ওপর একটা আর্টিকল স্যার।"

"বেহালা?"

"খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যার। স্ট্র্যাডিভারির বেহালা সঙ্গে নতুন পুরোনো ভালো ভালো বেহালার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সে রকম ভাবে কোনও তফাৎ ধরা পড়েনি।"

কাগজের ফিল্টারে এখন ছ'চামচ কফির গুঁড়ো দিতে হবে। একটু কম-বেশি হলেই প্রমথ চেঁচামেচি জুড়বে উইক বা স্ট্রং হয়েছে বলে! আমার অ্যাটেনশানটা তাই সেদিকে। প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে হয়েছেটা কি?

এরমধ্যেই একেনবাবু সোফা থেকে উঠে ল্যাপটপটা খুলে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উত্তেজিত ভাবে বললেন, "এই যে দেখুন স্যার, ১৯৭৭ সালে বিবিসি রেডিওর প্রোগ্রামে চারটে বেহালা আনা হয়েছিল। একটা স্ট্র্যাডিভারিয়াস, একটা গুয়ার্নেরির ১৭৩৯ সালে বানানো ডেল গেসু। অন্য দুটো অত পুরোনো নয় ১৮৪৬ আর ১৯৭৬ সালের তৈরি। ভালো বেহালা বাদকদের দিয়ে সেগুলো বাজানো হয়েছিল পর্দার আড়ালে। বিচারক ছিলেন আইজ্যাক স্টার্ন, পিঞ্চাস জাকারম্যান আর বেহালা বিশেষজ্ঞ চার্লস বিয়ারক। এঁরা সবাই বিখ্যাত, তাই না স্যার?"

আইজ্যাক স্টার্নের নাম আমি আগে শুনেছি। অন্য দু'জনও নিশ্চয় বিখ্যাত হবেন। সেটাই জানালাম।

"তাহলেই বুঝুন স্যার, এঁরা কেউই চারটের মধ্যে দুটো ঠিক করে বলতে পারেননি।

এঁদের মধ্যে দু'জন আবার ভেবেছিলেন ১৯৭৬ সালের বেহালাটা স্ট্র্যাডিভারিয়াস!"

আমি কফি মেশিনটা চালু করে বললাম, "চলুন আগে বসি, তারপর বলুন আপনার পয়েন্টটা কি?"

সোফায় বসতে বসতে একেনবাবু বললেন, "আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, ওই দুম করে যে রবার্ট দত্ত ছড়ে একটা টান দিয়েই বললেন এটা ডেল গেসু নয়, সেটা সত্যি হতে পারে না!"

"তাহলে?"

"একটা গল্প মনে পড়ছে স্যার। একটা আসরে আলো নিভে যাবার সুযোগ নিয়ে এক মহিলা অতিথির হিরের আঙটি খুলে নিয়েছিল এক চোর। তারপর মুখ থেকে চুইংগাম বার করে সেটাতে লাগিয়ে ডেল গেসুর মতো দামি কোনও বেহালার সাউন্ড বক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চুইংগামের জন্য আঙটিটা বেহালার ভিতরেই আটকে গেল।

আলো যখন জ্বলল, তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আঙটিটা পাওয়া গেল না। পুলিশ এসে সবাইকে সার্চ করেও কিছু পেল না। ইট ওয়াজ এ মিস্ট্রি স্যার। শুধু বেহালার আওয়াজটা আগের মতো খুলছিল না।"

"গল্পটা ইন্টারেস্টিং। কিন্তু শেষে লাভবান হলেন কে? বেহালার মালিক না চোর?"

"সেটাই ভুলে গেছি স্যার।"

"তা এখন কী করতে চান?"

"ভাবছি স্যার... একবার খোঁজ করলে হয়, সেদিন ওখানে কারও কিছু খোয়া গিয়েছিল কিনা।"

"এর থেকে অনেক সহজ এক্সপ্লানেশন আছে। নিজে কত বড় বোঝদার প্রমাণ করার জন্যে রবার্ট দত্ত একটা ফালতু স্টেটমেন্ট করেছেন।" আমি বললাম।

"তার থেকেও সিনিস্টার এক্সপ্লানেশন হল নিজের রদ্দি ডেল গেসু রেখে দিয়ে গোলমালের মধ্যে আঙ্কলের ভালো মালটা নিয়ে কেটে পড়েছেন।" প্রমথ কখন ঘরে এসেছে খেয়াল করিনি।

"এটা মন্দ বলেননি স্যার। কিন্তু 'এটা ডেল গেসু নয়' বলার কী দরকার ছিল? আপনার থিওরি ঠিক হলে স্যার, উনি তো প্যান্ডেমোনিয়ামের মধ্যে এক্সচেঞ্জটা করেই ফেলেছিলেন। নিজের বেহালাটাই না হয় একটু বাজিয়ে, তারপর রেখে দিয়ে চলে যেতেন। কারও সন্দেহের কোনও প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু আরও ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন স্যার, উনি কী করে জানলেন আঙ্কলের বেহালা শুধু জেনুইন নয়, একটা ভালো ডেলগেসু... যার জন্য ওই এক্সচেঞ্জটা উনি করতে গিয়েছিলেন?"

একেনবাবুর এই যুক্তিটা প্রমথ নাকচ করতে পারল না। ব্যাজার মুখে বসে রইল।

একেনবাবু কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থাকার পর পা নাচাতে নাচাতে প্রমথকেই জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, চুরির মোটিভ কী হতে পারে?"

"সিম্পল অর্থোপার্জন। কিন্তু প্রসঙ্গটা আসছে কোত্থেকে?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক স্যার, অথবা কারও ক্ষতি করা, নিজের তেমন লাভ হোক বা না হোক।"

"এত হেঁয়ালি করে কথা বলছেন কেন?"

"মাঝে মাঝে সব কিছু খুব কনফিউসিং লাগে স্যার।"

প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার তো আপনার এখনকার কথাই কনফিউসিং লাগছে। কী বলতে চান বা করতে চান বলুন তো?"

"ভাবছি আঙ্কলকে একটা ফোন করব।"

আমি অনেকবারই এই কথা লিখেছি, একেনবাবুর মাথায় কিছু চাপলে যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে, ততক্ষণ আশেপাশে সবার লাইফ হেল করতে দ্বিধা করেন না। আমাকে দিয়েই ফোন করানোর চেষ্টা করছিলেন, লাকিলি প্রীতমের ফোন এল। প্রীতম আমাদের এদিকে এসেছে, আমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। এতে আবার সমস্যা কি? চলে আসতে বললাম।

একটুবাদে ও একাই এল। ওর কাছে শুনলাম, বাড়িতে প্রবল গোলমাল চলছে। আঙ্কল রেগে আগুন হয়ে রয়েছেন, বিপ্লবের বাবাকে ফোন করে যাচ্ছাতাই গালাগালি করেছেন ঠকাবার জন্য। যেসব কাগজপত্র বেহালার অথেনটিসিটির প্রমাণ হিসেবে বিপ্লবের বাবা দিয়েছেন, সেগুলো সব ভুয়ো বলে কেস করার কথা বলেছেন। বল্লরী কান্নাকাটি করছে। শেষ করল এই বলে, "অমল কী যে একটা ঝামেলা পাকাল?"

"আচ্ছা স্যার, এই অমল মিত্র ভদ্রলোকটি কে?"

"ও-র ঠাকুরদা আমার মায়ের দাদুর উকিল ছিলেন। আমার আন্টির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বলতে গেলে ফ্যামিলিরই একজন। তবে..."

কী জানি বলতে গিয়ে প্রীতম থেমে গেল।

"'তবে' কী স্যার?"

"ও আন্টির খুব প্রিয়, কিন্তু আঙ্কলের সঙ্গে একটু সমস্যা আছে। অমলের ধারণা আঙ্কলদের এই বিশাল ব্যাবসায়ে ওর ঠাকুরদার প্রচুর অবদান। বিশেষ করে অ্যাসবেস্টসের বিজনেসটা উনিই দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই বিজনেসটা অবশ্য এখন নামে মাত্র আছে। কিন্তু এক সময় তো বিরাট আয় হত। তার প্রতিদানে ওকে চাকরির ক্ষেত্রে সেরকম সুযোগ বা সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে একদিন বলেছিল আঙ্কলদের এক কম্পিটিটর ওকে অনেক স্টার্ট-আপ বোনাস আর মাইনে দিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু ও পারিবারিক সম্পর্কটা নষ্ট হতে দিতে চায় না।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

"বুঝলাম না," প্রমথ বলল।" ওর কোম্পানি ছেড়ে যাবার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হবার প্রশ্ন উঠছে কেন। ও চলে গেলে যদি ইন্ডাস্ট্রি লাটে উঠত, তাহলে এসব কনসিডারেশন আসতে পারত!"

"তা নয়।"

"তা হলে আর কী হতে পারে... বল্লরীকে পাবার চান্স চলে যাবে? সরি, তোমার বোন... এভাবে কথাটা বলা উচিত নয়।"

"তুমি আবার কবে রেখে ঢেকে কথা বল!" প্রীতম হেসে ফেলল। "আন্টির তরফ থেকে সে চান্স দিতে আপত্তি হবে না। তবে বল্লরী আঙ্কলের চোখের মণি। আঙ্কলের কাছে বল্লরীর উপযুক্ত এখনও কেউ জন্মায়নি।"

"সর্বনাশ! এর পরে জন্মালে তো বয়সের ডিফারেন্স বেড়ে যাবে!" প্রমথ বলে উঠল।

"ও কথা থাক। আসলে ব্যাপারটা এত বিচ্ছিরি অবস্থায় চলে যাচ্ছে। কিছু একটা করে স্টিমটা আউট করা দরকার।"

"সেই জন্যেই তুমি এই সকালবেলা একেনবাবুর কাছে এসেছ?"

"তোমাদের সবার কাছেই পরামর্শের জন্যে এসেছি। মল্লিকাও পুরো ব্যাপারটাতে খুব

আপসেট।”

“তা তো বুঝতে পারছি স্যার। তার আগে আসুন, কফি খাওয়া যাক, সবারই মাথা তাতে খেলবে। সেই ফাঁকে আরও দুয়েকটা কথা জেনে নিই, তারপর না হয় যাওয়ার কথা ভাবা যাবে।”

প্রীতমের তাতে কোনও আপত্তি আছে বলে মনে হল না। প্রমথ এক পট কফি বানালো। বাড়িতে ডোনাট ছিল। সেই নিয়ে আমরা বসলাম।

“কাল আমার মাথাতে কতগুলো প্রশ্ন জেগেছিল স্যার, সেগুলো আগে ক্লিয়ার করি। এই যে রবার্ট দত্ত, এঁকে কি আপনি আগে কোথাও দেখেছেন?”

“হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন আগে জুবিন মেহেতার একটা কনসার্টে বাজিয়েছিলেন লিড ভায়োলিনিস্ট হিসেবে। সেটাই ওঁর প্রথম ব্রেক। মল্লিকাও ওঁকে দেখেছে গতবছর লন্ডনের একটা কনসার্টে। খুব আত্মম্ভরি লোক।”

“আই সি। অমল মিত্র ওঁকে চিনলেন কী ভাবে স্যার?”

“তা বলতে পারব না। তবে অমলের অসীম ক্ষমতা লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে। বহু সেলিব্রেটিকে ও চেনে।”

“বুঝলাম স্যার, কিন্তু উনি হঠাৎ রবার্ট দত্তকে নিয়ে এসে একটা ভায়োলিন পরীক্ষা করতে বললেন কেন, আর রবার্ট দত্তই বা তাতে রাজি হলেন কেন?”

“এই প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল যখন শুনলাম অমল ওঁকে আনার চেষ্টা করছে। পরে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল।”

“কী ক্লিয়ার হল স্যার?”

“আঙ্কলের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল ভায়োলিনটা সত্যিই কতটা ভালো। কাগজপত্রে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। ভাবছিলেন কাকে দিয়ে পরীক্ষা করাবেন। অমলই তখন রবার্ট দত্তের কথা বলেছিল। রবার্ট দত্ত রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু সেটা করার জন্য পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন। তারপর আমার রিসেপশনে যখন আসবেন ঠিক হল, তখন সেই পারিশ্রমিকের ওপর একটা অ্যাপিয়ারেন্স ফী-ও আঙ্কল দিয়েছিলেন। এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট আমি জানি না। কিন্তু ভালো টাকাই হবে মনে হয়।”

“আমি একটু কনফিউসড স্যার। আঙ্কল নিজে তো বাজান না, কিন্তু এরকম একটা দামি বেহালা কিনলেন কেন? সেটা কি ইনভেস্টমেন্টের জন্য?”

“তা হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হয় অন্য একটা কারণ কাজ করেছিল।”

“অন্য কী কারণ স্যার?”

“আমার মামাতো ভাই, এই আঙ্কলের একমাত্র ছেলে, বেহালা বাজাত। ওর খুব সাধ ছিল ডেল গেসু বা স্ট্র্যাডিভারিয়াস কিনবে। বেশ কয়েক বছর আগে ও দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেটাও হয়তো মনের মধ্যে ছিল... কে জানে?”

“অমলবাবুর সঙ্গে কি এর মধ্যে আপনার কথা হয়েছে?”

“না।”

“ঠিক আছে স্যার, আমি যাব। আপনারাও চলুন না স্যার?”

“আমরা গিয়ে কী করব?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“আমি যাচ্ছি না। আমি গেলে স্টিম-আউট হবার বদলে স্টিমের চাপ বেড়ে যাবে... যত্তসব!” প্রমথ অনড়।

অগত্যা আমি আর একেনবাবুই গেলাম। কিন্তু একেনবাবুকে সতর্ক করলাম, “আমি যাব আর আসব। আমাকে আজকেই গ্র্যান্টের রিপোর্ট শেষ করতে হবে, নো ইফ অর

বাট।”

প্রীতম আন্টির সঙ্গে কথা বলেই এসেছিল। টেরাস তখনও পরিষ্কার করা হয়ে ওঠেনি। দু’জন লোক সেখানে কাজ করছে। বল্লরী আর মল্লিকা আন্টির সঙ্গে বসে আছে ফ্যামিলি রুমে। আঙ্কল বাড়িতে নেই। মনে হল বেহালার কাগজপত্র পরীক্ষা করানোর জন্যে একজন বিশেষজ্ঞ-উকিলের কাছে গেছেন।

একেনবাবু আন্টিকে কোনও ভনিতা না করেই জিজ্ঞেস করলেন, “আন্টি, আমি কি আঙ্কলের ডেল গেসু বেহালাটা একটু দেখতে পারি?”

সবাই বিস্মিত। আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, “কেন বল তো?”

“একটা জিনিস পরীক্ষা করতাম। কিন্তু একটা জেমস ক্লিপ বা চুলের কাঁটা দরকার।”

জেমস ক্লিপ, চুলের কাঁটা! বিস্ময়টা একেবারে তুঙ্গে। বল্লরীই চট করে কোত্থেকে চুলের কাঁটা নিয়ে এসেছে।

আঙ্কলের অফিসে গেলাম। আগেও এসেছি, সেই একই রয়েছে। ওডিনের উপহারটা যেভাবে দিয়েছিলাম সেভাবেই ডেস্কের ওপর। কাল রাতে যা ঘটেছে, তারপর আর ওটা দেখার সময় পাননি। ডেল গেসু বেহালা বাক্স-শুদ্ধু ডেস্কের আরেক কোণে। সেটাকে আর ডিসপ্লে ক্যাবিনেটে ঢোকানো হয়নি।

বেহালাটা বাক্স থেকে উঠিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্টো ফ্ল্যাশ-লাইট বের করে একেনবাবু কী জানি দেখার চেষ্টা করলেন।

তারপর চুলের কাঁটাটা একটু বেঁকিয়ে সোজা করে বেহালার ছোট্ট মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে... ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে জিনিসটা বার করলেন, সেটা আমি যেন এক্সপেক্টই করছিলাম, একটা চুইংগাম!

“এর মানে?” প্রীতম আর বল্লরী প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করল।

“ম্যাডাম, কেউ এটার আওয়াজ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল... আরও কিছু গাম হয়তো আটকে আছে, কিন্তু খোঁচাখুঁচি করে বেহালাটা ড্যামেজ করতে চাই না।”

এই কীর্তি কে করেছে একেনবাবু মনে হল বুঝতে পেরেছেন। আমিও মনে হয় একই লোককে সন্দেহ করেছি। বল্লরীর চোখ দেখলাম জ্বলছে, সে ঠিকই ধরেছে।

“আঙ্কলকে বলবেন ম্যাডাম, বেহালা সারাই করার ভালো লোক ডেকে এটাকে ঠিক মতো ক্লিন করতে।” বল্লরীকে বললেন একেনবাবু। আন্টি আমাদের চা খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আমরা বসলাম না।

ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার কী করে সন্দেহ হল যে অমল মিত্র এর সঙ্গে জড়িত? এইভাবে বিপ্লবকে ফিল্ড থেকে হটিয়ে দেওয়া... এত একেবারে মাস্টার স্ট্রোক!”

“এটা একেবারেই ঝড়ে বক পড়ে স্যার। চুইং গামটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম, নইলে তো এটা চিটিং কেস! ভালো বলে বাজে মাল গছানো!”

“সে যাই হোক, যে বম্বশেল ফাটিয়ে এলেন, এবার দেখুন কী দাঁড়ায়! একটা পারিবারিক অশান্তির পরিবেশ যে হবে সেটাতে সন্দেহ নেই।”

।। ৮।।

সন্ধেতে যে খবরটা পেলাম, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না! আঙ্কল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, এবার আর পটকা ফটকা নয়, বম্ব ব্লাস্ট! ভয়ার্ত প্রীতমের করা ফোন থেকে যা বুঝলাম। পুলিশ জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে। ফরেন্সিক এক্সপার্টরা তন্নতন্ন করে চত্বরটা পরীক্ষা করছে। দুটো ডেলিভারি এসেছিল সকালে। সেগুলো ট্র্যাক করা হচ্ছে। বল্লরীকে নিয়ে আন্টি আপাতত কোম্পানির গেস্ট হাউসে।

মৃত্যুর আগে একেনবাবুর চুইংগাম ডিসকভারির কথাও বোধহয় শুনে যাননি। অবশ্য সেটা জিজ্ঞেস করার সময় এখন নয়।

ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির মালিকের এভাবে খুন হওয়াটা একটা বিগ নিউজ। একেনবাবুও খোঁজখবর করছেন। যেটুকু জানলাম বেশ সোফিস্টিকেটেড প্ল্যাস্টিক বম্ব। যেই বানাক না কেন, বম্ব বানানোর বিজনেসটা জানে, অ্যামেচারের কাজ নয়।

ওডিনও খবরটা শুনেছে। জিজ্ঞেস করল প্রেজেন্টটা মিস্টার সিংকে দিতে পেরেছিলাম কি না। বিড় বিড় করল, ওটা ইতিমধ্যে না দেখে থাকলে তো আর দেখতেও পাবেন না।

“হোয়াট ডিফারেন্স ইট মেকস ওডিন। তোমার আঙ্কল-আন্টি মনে করে পাঠিয়েছেন, সেটাই তো যথেষ্ট!”

মাঝে মাঝে লোকেদের প্রায়োরিটি দেখে বিস্মিত হতে হয়!

আঙ্কলের ফিউনারেলটা হচ্ছে লোয়ার ম্যানহাটানের একটা ফিউনারেল হোমে। লন্ডন থেকে প্রীতমের দুই মামা এসেছেন মামিদের নিয়ে। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার, ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির সবাই এলে তো তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। শুধু সিনিয়র কিছু এক্সিকিউটিভ। অনেকেই ফুল নিয়ে এসেছেন। মেজোমামা আর ছোটোমামা ফুলগুলোকে খুলে খুলে ক্যাসকেডের চার পাশে সাজিয়ে রাখছেন। আমি আর প্রমথ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। একেনবাবু একটু পরে আসবেন বলেছিলেন। হঠাৎ অমল মিত্র এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলেন, “একেনবাবু কোথায়?”

“একটু বাদেই আসছেন।”

তারপর প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, “আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে?”

আমি আর প্রমথ দুজনেই বিস্মিত চোখে তাকালাম।

“বল্লরী কথা বলা বন্ধ করেছে। ওর ধারণা আমি চুইংগাম বেহালায় ঢুকিয়েছি বিপ্লব আর বিপ্লবের ফ্যামিলিকে হেনস্থা করার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর মধ্যে জড়িত নই। কেন এরকম নোংরা কাজ আমি করব? আপনারা একেনবাবুকে সেটা বলুন।”

আমার সত্যিই বিরক্তি লাগল। আঙ্কলের ফিউনারেলে এসেছি, একটা বিষাদপূর্ণ অনুষ্ঠান... এর মধ্যে এসব কী কথা!

“ঠিক আছে বলব,” বলে কাটালাম।

“ছোঁড়াটা বাঁশ খাচ্ছে দেখে ভালো লাগছে।” অমল চলে যেতেই প্রমথর মন্তব্য।

এর মধ্যে ভিড়টা বেশ বেড়েছে। ক্যাসকেডের চারপাশে ফুল রাখার আর জায়গা নেই।

প্রীতমের দুই মামা ফুলগুলো নিয়ে পাশের একটা টেবিলে রাখছেন। হঠাৎ দেখি ওডিন। হাতে কাগজে মোড়া এক গুচ্ছ ফুল। সেটা প্রীতমের ছোটোমামার হাতে দিতেই পিছন থেকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আর দু'জন পুলিশ সেটা হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে ওডিনের হাত পেছন করে হাতকড়া লাগিয়েছে! পুরো ব্যাপারটা বড়োজোর পনেরো সেকেন্ড! দেখলাম একেনবাবুও সেখানে দাঁড়িয়ে। ওডিনকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। বাইরে বম্ব স্কোয়াডের গাড়ি। ফিউনারেল হোমে সবাই সন্ত্রস্ত। কোনও মতে নমো নমো করে ব্যাপারটা শেষ হল। শুধু আমি না প্রমথও কমপ্লিটলি কনফিউসড।

একেনবাবু বাড়ি ফিরলেন বিকেলে।

"কী ব্যাপার মশাই বলুন তো? ওডিনকে ওরকম করে অ্যারেস্ট করা হল কেন?"

"খুবই স্যাড স্যার, তার কারণ আঙ্কলের মৃত্যুর জন্য মিস্টার ওডিনই দায়ী। ওঁকে সময় মতো না ধরলে আরেকটা বিস্ফোরণ হত। আমরা সবাই খতম হয়ে যেতে পারতাম।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে, প্রথম থেকে বলুন।"

"বলছি স্যার, বলছি... সেই সঙ্গে একটু কফিও হোক। স্টুয়ার্ট সাহেবের অফিসে ওটি ভালো পাওয়া যায় না।"

প্রমথ রোস্টেড কফি বিন ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করতে বসল। একেনবাবুর গল্পও শুরু হল...

"স্যার এখানে ডিটেকশনের দুটো গল্প আছে। প্রথমে প্রাণঘাতি গল্পটাই বলি। এও বলি স্যার, আমি যা বলছি তা আপনারা সবই জানেন। প্রমথবাবু যদি বা না জানতে পারেন, আপনি কিন্তু স্যার, জানেন।"

"বাপি জানলেও ব্যাপারটার আসল অর্থ বুঝতে পারে না, একটু গবেট আছে।"

"চুপ কর তুই, বলুন।"

"দাঁড়া দাঁড়া, কফিটা একেবারে নিয়ে তারপর শোনা যাক, কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার।"

সোফায় বসে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে একেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, "আপনি স্যার নিশ্চয় খেয়াল করেছিলেন, আফ্রিকার ক্যাম্পর ইনডাস্ট্রি নিয়ে মিস্টার ওডিনের একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল।"

"তা করেছিলাম, একটু অবাকই হয়েছিলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওদের পরিবারের অন্নদাতা ছিল ওই কোম্পানি।"

"এক্স্যাক্টলি স্যার। মিস্টার ওডিন অবশ্য সেটা জেনেছিলেন খুব বেশিদিন হয়নি... জন্মদাতা বাবা-মা'র খোঁজ শুরু করার সময় ওঁর পালক-পিতার এক বন্ধুর কাছ থেকে। তিনি মনে হয় মিস্টার ওডিনের বাবা-মা'র খবর মিস্টার জনসন, মানে ওডিনের পালক-পিতার থেকে বেশি জানতেন। এছাড়া সাবালক হয়ে গেলে অ্যাডপশন এজেন্সি থেকেও নিজের জন্মগত পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়, যদি আইনের কোনও বাধা না থাকে। অনুমান করি স্যার, মিস্টার ওডিন ওখান থেকেই জানতে পারেন কোন অনাথ আশ্রমে তিনি থাকতেন। তারপর সেই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে তো বটেই, পরে সেকো ফ্যামিলির কারও কারও সঙ্গে মিস্টার ওডিনের যোগাযোগ হয়েছিল। হয় চিঠিতে অথবা ফোনে। আর সেই পরিবারকে আরও ভালো ভাবে জানার জন্যেই তিনি তিন সপ্তাহের জন্য আফ্রিকা গিয়েছিলেন।

"প্রমথবাবু, আপনি এটা জানেন না, কিন্তু মিস্টার ওডিন খুব পরিষ্কার করেই বাপিবাবুকে লিখেছিলেন কেন আফ্রিকা যাচ্ছেন... To find my roots. বাপিবাবু অবশ্য এটাকে একটু অন্যভাবে নিয়েছিলেন। লেখাটাতে দুটো অর্থই লুকিয়েছিল, যিনি যে-ভাবে নেবেন। তাই না স্যার?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আসলে স্যার, অ্যাডপ্টেড ছেলেমেয়েদের মানসিক অবস্থা আমরা তো নিজেরাই দেখেছি এরিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলে। মনের গভীরে ওঁদের মানসিক কষ্ট কী নিদারুণ, আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। কেন ওঁদের নিজের বাবা-মা ওঁদের পরিত্যাগ করলেন... এই কষ্ট ওঁদের কুরে কুরে খায়। মিস্টার ওডিনের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছে একটা বাইরের কারণে...ওঁর বাবা-মা ওঁকে ফেলে দেননি স্যার, মৃত্যুই হঠাৎ এসে ওঁর বাবা-মা'কে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দু'জনেই মারা গেছেন ক্যান্সারে...মেসোথেলিওমা।

"আপনারা জানেন কিনা জানি না স্যার, এটা একটা মারাত্মক ক্যান্সার। যার অন্যতম প্রধান কারণ অ্যাসবেস্টসের সংস্পর্শে বহু সময়ের জন্যে থাকা। শুধু ওঁর বাবা-মা নন, কাকারও মৃত্যু ওই একই ক্যান্সারে। সেদিক থেকে স্যার, বাবা-মা'র ওপর অভিমান না করে, মিস্টার ওডিন রাগ করতে পারেন ভগবানের ওপর। এর মধ্যে বেহালা নিয়ে ওই ব্যাপারটা ঘটল। মিস্টার প্রীতম এসে অমল মিত্রের কথা বললেন। মনে আছে স্যার?"

"কী কথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"মিস্টার মিত্রের ঠাকুরদার কথা। ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রির অ্যাসবেস্টসের ব্যাবসাটা তিনিই দাঁড় করিয়েছিলেন। এখন অবশ্য সেটা পড়তি অবস্থায়, কারণ বেশির ভাগ দেশই ওটার ব্যবহার বন্ধ করেছে মেসোথেলিওমার ভীতিতে। তখনই মনে পড়ল মিস্টার ওডিনের সেই নোট, যেটা প্রীতমের আঙ্কলকে পাঠানো গিফটের সঙ্গে আটকানো ছিল। আপনার মনে আছে স্যার?"

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন একেনবাবু।

আমি ভাবার চেষ্টা করলাম। "ওঁর আঙ্কল আর আন্টির নাম?"

"হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ডাক নামটা লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

"খুবই মনে আছে। 'known as...' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা তো কথাও বললাম সেই নিয়ে।"

"কিন্তু তার পরের শব্দগুলোও ভাবুন স্যার... "Best, OS।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওতো সব সময়েই নোটের শেষে Best, OS কথাটা লেখে।"

"তা লেখেন। কিন্তু এখানে সেটা অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শেষ তিনটে শব্দ এখন এক সঙ্গে পড়ুন স্যার, As Best OS, অর্থাৎ অ্যাসবেস্টস। কী তীব্র রাগ আর ক্ষোভ নিয়ে মিস্টার ওডিন ওই নোটটা লিখেছিলেন! বক্তব্যে কোনও ঢাকা চাপা নেই, কিন্তু গুরুবচন আঙ্কলের সাধ্য হবে না তার অর্থ বোঝার। আমরাও বুঝিনি। এখানেও ওঁর সেই roots খোঁজার মতো... যে যে-ভাবে বোঝে!"

প্রমথ এবার মুখ খুলল, "এবার কিন্তু আপনার গল্পের গরু গাছে উঠছে! এর সঙ্গে আঙ্কলের মৃত্যুর সম্পর্ক কী? আঙ্কল মারা গেছেন একটা সোফিস্টিকেটেড প্লাস্টিক বোমায়। সেটা তো যে-কেউ বানাতে পারবে না!"

"একদম ঠিক স্যার। তবে কিনা বাপিবাবু আরেকটা জিনিস খেয়াল করেননি, আমিও প্রথমে করিনি। আমাদের ধারণা ছিল মিস্টার ওডিন এনার্জি সেক্টরের একটা ল্যাবে কাজ

করেছেন। সেটা ঠিক নয় স্যার, উনি কাজ করেছিলেন এনার্জেটিক্স ল্যাবে। বাপিবাবু সেদিন যখন ওঁর রেসিউমিটা দেখালেন, তখন এনার্জেটিক্স শব্দটা পড়েছিলাম, কিন্তু সেভাবে ওটা নিয়ে ভাবিনি। এনার্জি আর এনার্জেটিক্সের মধ্যে অনেক তফাত। এনার্জেটিক্স হল বিস্ফোরক নিয়ে কারবার। উনি আগে কাজ করতেন সেখানে রিসার্চ করা হত বিস্ফোরক নিয়ে।”

একেনবাবু বলে চললেন, “সেদিন আরও দুটো প্যাকেজ আঙ্কলের কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু সেগুলো নির্দোষ... অ্যামাজন আর ওয়ালমার্টের অন-লাইন অর্ডার। ওডিনের প্যাকেজটা খুলতে গিয়েই এক্সপ্লোশানটা হয়। ফরেন্সিক অ্যানালিসিসে দেখা যায় ব্যাটারি অপারেটেড কোনও ট্রিগারিং মেকানিজম ব্যবহার করা হয়েছিল। আমিও চিন্তা করতে শুরু করি, কোথায় মিস্টার ওডিন এটা বানাতে পারেন। বাইরে কোথাও বানাবার চেষ্টা করলে করলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে... করতে পারবেন ইউনিভার্সিটিরই কোথাও। কোথায় আবার? প্রমথবাবু ওঁকে ল্যাবে একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন। সেই ল্যাবে প্ল্যাস্টিক বোম বানাবার সব রসদই মজুত আছে, বাইরে থেকে কিছুই কেনার দরকার নেই। পুলিশ ইতিমধ্যেই সেটা ভেরিফাই করেছে।”

“মাই গড!” প্রমথ বলল।

“ওঁর দিক থেকে ভাবুন স্যার, বাবা-মা ওঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন ক্যানসারে মৃত্যুর জন্য, অন্য কোনও কারণে নয়। আর ক্যানসার হয়েছে অ্যাসবেস্টসের জন্য। ক্যাম্পর ইন্ডাস্ট্রি, যার মালিক হচ্ছেন আঙ্কল গুরুদয়াল সিং আর তাঁর ভাইরা, অ্যাসবেস্টস নিয়ে এত হইচই সত্ত্বেও মুনাফার লোভে সেই ব্যাবসা বন্ধ করেননি। যদ্দিন খরিদ্দার পেয়েছেন, মাল তৈরি করেছেন, বিক্রি করেছেন। এই সিং ভাইরাই জেনেশুনে ওঁর বাবা-মা’কে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। রাগ থাকা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার স্যার।

“মুশকিল হল স্যার, এগুলো সবই পরোক্ষ প্রমাণ। ওঁকে বোমা বানাতে দেখা যায়নি। বোমা উনি নিজে ডেলিভারি করেননি। যে চিঠি লিখেছেন... সেটার ওপর ভিত্তি করে কিছুই এগোয় না। কিন্তু আমি জানতাম স্যার, একজন সিং-এর মৃত্যুতে উনি সন্তুষ্ট হবেন না। তারপর এই ফিউনারেলের ব্যাপারটা এল। অন্য দুই ভাইও আসবেন, পত্রিকাতেই খবর পাওয়া গেল।

“মিস্টার ওডিন আবার কাজে লাগলেন। এবার উনি জানতেন না, ওঁর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মুভ রেকর্ড করা হচ্ছে। ফুলের গুচ্ছ কিনে কাগজের মোড়কে যখন প্ল্যাস্টিক এক্সপ্লোসিভ জড়াচ্ছেন... এসব ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে কঠিন, অর্থাৎ ট্রিগারিং মেকানিজম, যাতে কাগজগুলো খুললেই সেটা তৎক্ষণাৎ কাজ করে, সেটাকে যখন বসাচ্ছেন􏰀 সেটাও ফোকাস করে তোলা হল। তারপরের ঘটনা তো আপনারা জানেনই। ওঁর পিছন পিছন আমরা গেলাম, ফুলটা হাতে দিতে না দিতে ওঁকে অ্যারেস্ট করলাম।... সবই স্বীকার করেছেন উনি। অত্যন্ত ট্র্যাজিক। পুলিশের কাজ স্যার, নচ্ছার!”

আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। একটা প্রশ্ন অবশ্য মাথায় এল, এত দেরি করে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করল কেন! বোমা বানানোর সময়েও করতে পারত। কিন্তু তার আগেই প্রমথ বলে উঠল, এবার একটা হালকা প্রসঙ্গ তুলি। “আপনি তো মশাই, অমল মিত্রের কেস কাঁচ্চা করে দিয়ে এলেন।”

‘‘কেন স্যার?’’

‘‘ওই যে বল্লরীর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন, অমল মিত্র আঙ্কলের ডেল গেসু বেহালার সাউন্ড-বক্সে চুয়িংগাম ফেলেছেন, আওয়াজটা ড্যাম্প করতে। উদ্দেশ্য বল্লরীর বয়ফ্রেন্ডের বাবার ওপর আঙ্কল যাতে এত রেগে যান যে বল্লরীর বিয়েতে আপত্তি করেন!’’

‘‘কী মুশকিল স্যার, আমি কি তাই বলে এসেছি?’’

‘‘প্লেন ইংলিশে বলেননি, কিন্তু ইশারায় তো বলেছেন।’’

‘‘বলে থাকলে ভুল বলেছি, স্যার।’’

‘‘মানে?’’

‘‘মানে স্যার, ওই বিস্ফোরণের পরে পুলিশ সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো সব পরীক্ষা করেছে। কীর্তিটা ওই যমজ দুটো ভাইয়ের। এটা অবশ্য স্যার, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, এইভাবে বিপ্লবকে হেনস্থা করার চেষ্টা শুধু চাইল্ডিশ নয়, রিস্কি।’’

‘‘কিন্তু বেচারা অমল, ওর জন্যে তো কিছু করতে হবে?’’ আমি বললাম।

‘‘ও-তো দু’দিক থেকেই শেষ। বল্লরী ভালোবাসে বিপ্লবকে... অমল বেহালা নষ্ট করুক বা না করুক। আর আঙ্কলও গন। আমার শুধু একটাই দুঃখ, একেনবাবু,’’ প্রমথ বলল, ‘‘বাপিটার কিছু হল না। বিপ্লব গন হলে বাপির তবু একটা চান্স থাকত।’’

‘‘কেন স্যার, বেভ ম্যাডাম তো আছেন।’’

একেনবাবুকে মাঝে মাঝে খুন করতে ইচ্ছে করে।

কর্মফল

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

গতকাল রাত্রে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি, ভালো করে ঘুমও হয়নি। সকালে হাতমুখ ধুয়ে চা নিয়ে পত্রিকা খুলতেই চোখে পড়ল

'কিলার নার্ভ-ডিজিজ!!! আরেক বলি!'

দ্রুত পড়ে যেটুকু বুঝলাম, এবার মৃত কিশলয় দত্ত বলে এক যুবক। গত দু'মাসে এই নিয়ে তিনজনের মৃত্যু। কোনও চিকিৎসাই কাজ দিচ্ছে না। রোগলক্ষণ অনেকটা সিভিয়ার মেনিঞ্জাইটিস বা এনফেলাইটিজের মতো। শুরু হয় অসহ্য মাথা ধরা, ধূম জ্বর, ডিজওরিন্টেশন, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া দিয়ে। দেখতে দেখতে সেটা চলে যায় কোমায়। কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু। এখন পর্যন্ত যারা আক্রান্ত হয়েছে সবাই যুবক... কোনও শিশু বা বৃদ্ধ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা মশাবাহিত রোগ নয়, জলবাহিতও নয়।

রোগের কারণটাই জানলি না, কিন্তু বুঝে গেলি এটা মশাবাহিত বা জলবাহিত নয়! যত্তসব! সক্কাল বেলাতেই গেল মেজাজটা বিগড়ে।

মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার! আমাকে তো আগে কিছু জানাওনি?"

"কী জানাব?"

"এই যে ছেলেদের এরকম প্রাণঘাতি অসুখ হচ্ছে! আমিও তো একটা ছেলে।"

মা অবাক হয়ে বলল, "দেশে কি অসুখের কমতি আছে? আর অসুখ তো হয়েছে মাত্র তিনজনের... আর শুধু ছেলেদের অসুখ বুঝছে কী করে?"

"মা যে স্ট্যাটিস্টিকসের ছাত্রী ছিল ভুলেই গিয়েছিলাম। আসলে অসুখকে আমার ছেলেবেলা থেকেই ভয়। তিরিশ পেরিয়েও সেই ভয় যায়নি। প্রতিবারই দেশে আসি আর দুশ্চিন্তা করি, যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি? ডেঙ্গু, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, চিকেনগুনিয়া... অসুখের কি আর শেষ আছে? নিউ ইয়র্কে যে অসুখ হয় না তা নয়... তবে কলকাতার তুলনায় তা নস্যি। কলকাতায় মশা সমস্যা দেখি এতটুকু কমেনি, দেশ যখন ছেড়েছি তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে। প্রতিবছরই শুনি এইবার নাকি এমন মশা-নিধন হবে, মশাবাহিত কোনও রোগই এপিডেমিক পর্যায় পৌঁছবে না। কোথায় কি! আর এবার তো দেখছি কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে বিদঘুটে এই নার্ভের অসুখ!

প্রমথ আর আমি সাধারণত একসঙ্গে কলকাতায় আসি। এবার ও দু'দিন আগে এসেছে ওর ভাগ্নের মুখে ভাতে বলে। ফোন করলাম।

"শুনেছিস নার্ভের অসুখের খবরটা?"

"কখন এসে পৌঁছলি?" প্রমথ আমার প্রশ্নটাকে পাত্তা দিল না।

"কাল রাত বারোটায়। কিন্তু নার্ভের অসুখের ব্যাপারটা দেখেছিস, কী বিপদ বল তো!"

"মরেছে তো মাত্র তিনজন, এত টেনশন করছিস কেন?"

"বলিস কি? একটা অজানা রোগ কেন হচ্ছে, কী করে হচ্ছে... একটা চিন্তার বিষয় নয়?"

"নিউ ইয়র্কে তো অটো-অ্যাকসিডেন্ট আর বন্দুকের গুলিতেই মরে অনেক বেশি লোক। তোর চিন্তা তো তাতেই বেশি হওয়া উচিত। বাদ দে ওসব কথা, আজ বিকেলে একেনবাবু চা খেতে ডেকেছেন পাঁচটা নাগাদ, চলে আসিস।"

একেনবাবুর কথাটা তো এখনও বলা হয়নি। একেনবউদি যে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন না সেটা এখন মোটামুটি নিশ্চিত। এতদিন আশায় আশায় থেকে অবশেষে একেনবাবু হাল ছেড়েছেন। তাই কলকাতায় একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি শুরু করেছেন পুরোনো কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে। আপাতত দু-নৌকোয় পা, কলকাতায় পাঁচ মাস আর নিউ ইয়র্কে সাতমাস। এই পাঁচ-সাতের ব্যাপারটার সঙ্গে মনে হয় ট্যাক্সের কোনও বিষয় জড়িত। যদিও বিশদ করে বলেন না। নিউ ইয়র্কে ওঁর প্র্যাক্টিস হল 'সোলো', গোয়েন্দাগিরি যা করার একাই করেন। নিউ ইয়র্কে যখন থাকেন না, আরেকটা এজেন্সির সাহায্য নেন। কলকাতার বড় বড় কাজগুলো উনিই দেখেন, নিউ ইয়র্কে থাকলে লং ডিস্টেন্সে। দৌড়োদৌড়ির কাজগুলো করেন ওঁর সহকর্মীরা, উনি খেলান মাথা। এইবার এসে সেই নিয়ে একেনবাবু একটু ব্যস্ত। এজেন্সিটা কয়েক বছরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলে... গুডবাই ম্যানহাটান, গুডবাই নিউ ইয়র্ক।

কলকাতায় বেড়াতে এলেও দৈনিক আড্ডার অভ্যাস আমাদের ছাড়ে না। আড্ডাটা তখন হয় একেনবাবুর বাড়িতে। অন্যতম কারণ, একেনবউদি সবসময়েই চমৎকার চা আর উপাদেয় টা'র বন্দোবস্ত করেন।

আজকে গিয়ে দেখি একেনবাবু নেই, ওঁর এখানকার এজেন্সির কী একটা কাজে নাকি আটকা পড়েছেন। তবে শিগগিরি আসবেন। বিশেষ করে বলে গেছেন আমরা যাতে চলে না যাই।

চলে যাবার প্রশ্নই উঠছে না। একেনবউদি আজ লুচি আর আলুর-দম করেছেন। সেগুলোর সদ্ব্যবহার না করে কে পালাবে? তারপর প্রমথর বায়না রাখতে লম্বা লম্বা ফালি করে বেগুন ভাজা হচ্ছে। ভাজছে বাড়ির কাজের মেয়েটি, একেনবউদি আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন।

একেনবউদিকে আলাদা ভাবে তেমন পাওয়া যায় না, একেনবাবু সব সময়েই উপস্থিত থাকেন। ফলে বউদির সঙ্গে গল্প করতে গেলেই একেনবাবু অদ্ভুত কিছু একটা বলে বসেন, কথা ঘুরে যায়। আজকে তার সম্ভাবনা নেই।

নানান গল্প হচ্ছে। প্রমথ হঠাৎ একেনবউদিকে বলল, "এবার মনে হচ্ছে একেনবাবু সিরিয়াসলি দেশে ফেরবার কথা ভাবছেন।"

"কে জানে ভাই, এজেন্সিটা দাঁড়িয়ে গেলে মনে হয় আসতে পারবে। কিন্তু এগুলো কি

বলা যায় কবে হবে।"

"আচ্ছা বউদি, একেনবাবু হঠাৎ নিউ ইয়র্ক গেলেন কেন? যাওয়ায় আমাদের অবশ্য মস্ত লাভ হয়েছে, কিন্তু কেন হঠাৎ করে গেলেন সেটা কোনওদিনই জানতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলেই কেমন জানি এড়িয়ে যান।"

একেনবউদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "অনেকদিন তো হয়ে গেছে, এখন হয়তো বলতে বাধা নেই। আগে হলে বলতে দিত না।

"তাহলে একেনবাবু আসার আগেই বলে ফেলুন, নইলে আবার ঝামেলা পাকাবেন।" আমি বললাম।

"না ভাই, এখন আর মনে হয় পাকাবেন না। ও কলকাতা ছেড়েছিল, একটা কনফারেন্সে যেতে পারার সুযোগে। তবে আগেও এ ধরণের সুযোগ পেয়েছিল, নিজের কাজে খুব সুনাম ছিল তো। কিন্তু যায়নি।"

"আর এবার? নিশ্চিন্ত মনে বলুন বউদি, একেনবাবু কিচ্ছু জানতে পারবেন না।" প্রমথ অভয় দিল।

"আরে না ভাই, ও এখন আর এ নিয়ে কিছু মনে করবে না। আসলে সেই সময়ে ও একটা মানসিক ধাক্কার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ভালো লাগছিল না পুলিশের কাজটা...।"

"কেন?"

হঠাৎ একেনবউদির কী জানি মনে হল। বললেন, "না, ভাই ওর কাছেই উত্তরটা জেনে নেবেন, ওই ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারবে।"

এমন সময়ে ডিং ডং ডোর বেল। দরজায় পুলিশের পোষাক পরা এক সুন্দরী।

"এই যে বউদি, দাদা আছে?"

"আরে শ্রেয়া, আয় আয়। তোর দাদা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। বস, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" বলে আমাদের দিকে তাকালেন।

শ্রেয়া নামে সেই পুলিশ অফিসারটি এক মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এঁরাই দাদার সেই দুই বন্ধু?"

"হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন বাপি, আর ইনি প্রমথ।"

"আপনাদের দু'জনের কথা আমি অনেক শুনেছি।" মুখে মিষ্টি হাসি।

"এটা তো অন্যায়, আপনার কথা আমরা শুনিনি কেন?" প্রমথ অভিযোগের সুরে বলল।

"ওকে আবার আপনি আপনি করছেন কেন ভাই, দু'বছরও হয়নি ও অফিসার হয়েছে।"

"তা হোক, বউদি, পুলিশ অফিসার তো, কখন হাতকড়া লাগিয়ে দেন!"

প্রমথর কথা বলার ভঙ্গিতে শ্রেয়া হাসল, এবার আর নিঃশব্দে নয়।

শ্রেয়ার পরিচয় বিশদ করে পেলাম। একেনবাবুর দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। ইন্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে ঢুকে বছর দেড়েক পোস্টেড ছিল বেনারসে। বদলি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মাস কয়েক হল। প্রবাসী বাঙালি, তাই বাংলায় একটু হিন্দির টান। অত্যন্ত মিশুকে মেয়ে। একে আপনি আজ্ঞে করা যায় না বেশিক্ষণ। 'আপনি' হিসেবেও নিজেকে দূরে রাখা যায় না।

একেনবউদি শ্রেয়ার জন্য চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে গেলেন।

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি পুলিশি কাজে এসেছ, না একেনবাবুর সঙ্গে আড্ডা

দিতে?"

"আড্ডা দিতেই, তবে দাদার কাছে তো শুধু আড্ডা দিয়ে ফেরা যায় না, কাজের কথাও দুয়েকটা এসে যায়!"

"একেনবাবু কিন্তু এখন চার্জ করবেন কাজের জন্য, ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন যে।"

"বোনকে চার্জ করবে না, আর গিভ এন্ড টেক-এর ব্যাপার... আমিও তো সাহায্য করব দরকার পড়লে...।"

শ্রেয়া কথা শেষ করতে পারল না, একেনবাবু এসে হাজির।

"কি রে কখন এলি?" শ্রেয়াকে কথাটা বলে আমাদের দিকে তাকালেন একেনবাবু। "আপনারা কি স্যার অনেকক্ষণ বসে আছেন?"

"আছিই তো! কী ধরণের হোস্ট মশাই আপনি, গেস্টদের ডেকে নিজে হাওয়া হয়ে যান!" প্রমথ ওর ইউস্যুয়াল খোঁচা দেওয়ার মুডে।

"কী যে বলেন স্যার, ফ্যামিলিকে তো বলে গিয়েছিলাম আপনাদের বসাতে।"

"প্রমথর কথা ছাড়ুন, আপনার ফ্যামিলি, মানে আমাদের বউদি, শুধু আমাদের বসাননি, ভালোমন্দ খাবারের বন্দোবস্তও করেছেন।"

আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা শ্রেয়া মনে হয় ভালো করেই জানে, দেখলাম হাসিহাসি মুখেই উপভোগ করছে।

"আসলে স্যার, একটা সমস্যা নিয়ে আটকা পড়েছিলাম। ভালোই হয়েছে শ্রেয়া এসেছে, ওরও সাহায্য লাগবে।"

"সাহায্য করব, সাহায্য নেব।" শ্রেয়া আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল। ভাবটা, কী, বলেছিলাম না একটু আগে?

"আপনি মশাই সামথিং!" প্রমথ আবার একেনবাবুকে চার্জ করল।

"কেন স্যার?"

"আপনার বোন যে পুলিশে আছে, সেটা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?"

"কী মুশকিল স্যার, লুকাবো কেন, প্রসঙ্গটা ওঠেইনি!"

"বেশ এখন প্রসঙ্গটা তুলছি, আপনার ভাই বোনরা আর কে কোথায় পোস্টেড বলুন।"

আমার দিকে তাকালেন একেনবাবু, "এই প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!"

"এই নে তোর চা," শ্রেয়াকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে একেনবাবুকে বউদি বললেন, "লুচি আসছে, ভাজা হচ্ছে। তুমিও হাতমুখ ধুয়ে নাও।"

।। ২।।

একেনবাবু হাতমুখ ধুয়ে আসতেই শ্রেয়ার আসার আসল কারণ বুঝলাম। এসেছে একটা ঝামেলায় পড়ে। কাজে যোগ দিতে না দিতেই ওর ঘাড়ে একটা বড়োসড়ো দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। ক'দিন আগে নার্ভের অসুখে কিশলয় রায় বলে যে যুবকটি মারা গেছে, তার মৃত্যুর তদন্ত করা।

“পত্রিকায় তো পড়লাম ব্যাপারটা, চব্বিশ ঘণ্টার নিউজেও বেশ জল ঘোলা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশি তদন্তের ব্যাপারটা আসছে কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“কারণ হল, রোগীর ফ্যামিলি কানেকশন। কিশলয়ের বাবা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল বিজনেসম্যান, তার ওপর শাসকদলের পেয়ারের লোক। তাঁর অভিযোগ ছেলের মৃত্যু ঘটেছে প্রাইভেট হাসপাতালের গাফিলতিতে। ভুল চিকিৎসা, সেবাযত্নে অবহেলা, ইত্যাদি। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সেটা মানতে রাজি নয়। তাদের বক্তব্য, স্নায়ুরোগে আক্রান্ত কিশলয় হাসপাতালে ছিল সপ্তাহ চারেক। প্রথম দিন থেকেই প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসাই করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও কোমায় চলে যায়। কোমায় ছিল মাস চারেক, তারপর একটার পর একটা অর্গান ফেল করে মৃত্যু।”

“পোস্ট মর্টেম করা হয়েছে?” একেনবাবুর প্রশ্ন।

“হ্যাঁ। ব্রেন-এ বিপদজনক পরিমাণের মার্কারি পাওয়া গেছে। মার্কারি নার্ভের পক্ষে মারত্মক। প্রশ্ন হল, মার্কারিটা এল কোত্থেকে?”

“দাঁড়া দাঁড়া! এই যে কিশলয়ের কথা বলছিস, তিনি তো হাসপাতালেই এসেছিলেন অসুস্থ অবস্থায়?”

“হ্যাঁ, কিন্তু কিশলয়ের বাবার বক্তব্য তখন অতটা অসুস্থ সে ছিল না। হাসপাতালে নানান ধরণের ওষুধপত্র ইঞ্জেকশন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকেই মার্কারি-পয়েজনিং হয়েছে।”

“বুঝলাম। কিন্তু তুই নিশ্চয় শুনেছিস, কিছুদিন আগে আরও জনা দুই নার্ভের অসুখে মারা গেছে, সেগুলোও কি এই হাসপাতালে?”

আমি বুঝতে পারছিলাম, একেনবাবু কোনদিকে এগোচ্ছেন। কয়েক বছর আগে মার্কিন মুলুকে একজন নার্সকে ধরা হয়েছিল রোগীদের গোলমেলে ওষুধ দিয়ে খুন করার অভিযোগে। পুরো কেসটা অবশ্য মনে নেই।

“না, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই হাসপাতালে এই একটাই কেস।”

“অন্য যেসব লোক নার্ভের অসুখে মারা গেছে, তাদের অটোপ্সি হয়েছে?”

“না, দাদা। তুমি তো জানো, সব সময়ে করা হয় না যদি না মৃত্যুর সঙ্গে কোনও অপরাধ জড়িয়ে আছে সন্দেহ করা হয়।”

“ঠিকই বলেছিস।” বলে একেনবাবু প্রমথর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি তো স্যার এইসব জিনিস অনেক জানেন, মার্কারি শরীরে কী ভাবে ঢুকতে পারে?”

“মার্কারি পয়জন নিয়ে মার্কিন মুলুকে অনেক কাজ হয়েছে।” প্রমথ বলল, “লিকুইড মার্কারিতে সমস্যা নেই, তবে মার্কারি ফিউম বা ধোঁয়া নার্ভকে অ্যাটাক করে।”

প্রমথ অনেক কিছু জানে, আবার মাঝে মাঝে গুলতাপ্পিও দেয়।

“এখানে কয়েকজন পয়জন স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি,” শ্রেয়া জানাল। “ওঁরা নানান রকমের মার্কারি কম্পাউন্ডের কথা বলেছেন, এই ধোঁয়ার কথাও বলেছেন। কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে এভাবে হত্যা করার মোটিভটা কি? আর এটা যদি হত্যা না হয়, কেমিক্যাল এক্সপোজারের কথা ভাবতে হবে। কোনও হ্যাজার্ডাস সাইটে উনি গিয়েছিলেন কিনা। কেউ কেউ আবার পল্যুশনের প্রসঙ্গও তুলেছেন। জাপানের মিনামাতার কাহিনি শুনিয়েছেন। সেই অ্যাঙ্গেল দিয়েও দেখছি।”

“‘মিনামাতা’ কেসটা কি?” আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল।

“মিনামাতা জাপানের একটা শহর। মিনামাতার একটা কেমিক্যাল প্ল্যান্ট থেকে বিষাক্ত মিথাইল মার্কারি বর্জ হিসেবে সমুদ্রে ফেলা হত। ফলে সমুদ্রের মাছগুলো বিষাক্ত হয়ে

যায়। সেগুলো খেয়ে এক সময়ে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল নার্ভের অসুখে। আমরাও খোঁজ নিচ্ছি কলকাতার কোনও কেমিক্যাল প্ল্যান্ট এই কাজ করছে কিনা।''

''সেটার সম্ভবনাই তো বেশি মনে হচ্ছে, যখন নার্ভের অসুখে লোকে মারা যাচ্ছে। তবে একটাই খটকা।'' একেনবাবু বললেন।

''কী বল তো দাদা?''

''শুধু যুবা পুরুষই কি মাছ খায়?''

শ্রেয়ার মুখটা দেখে বুঝলাম, এই বিষয়টা নিয়ে ভাবেনি। প্রমথ অবশ্য ফোড়ন কাটল, ''তার কারণ, মেয়েদের জেনেটিক মেক-আপ অনেক স্ট্রং।''

মনে হল কথাটা শ্রেয়ার পছন্দ হয়েছে।

''মুশকিল কী জানিস,'' একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন। ''এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে কিশলয়বাবুর জীবনের প্রতিটা স্টেপ মিনিট বাই মিনিট তোকে ফলো করতে হবে। কোথায় গিয়েছেন, কী করেছেন, কী খেয়েছেন, কী মেখেছেন। করতে করতে তোর জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে, যদি না হঠাৎ একটা শর্ট-কাট মেলে।''

''শুনছো দাদার কথা!'' শ্রেয়া অনুযোগ ভরা দৃষ্টিতে একেনবউদির দিকে তাকাল।

''আচ্ছা বোনটাকে একটু সাহায্য করো না... ওর নতুন চাকরি!'' একেনবউদি একটু বিরক্ত হয়েই যেন কথাটা বললেন।

''আরে শোনো না, ওই শর্ট-কাট পাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট।'' এটা একেনবউদিকে বলে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে আমাদের বললেন, ''আচ্ছা, আপনারাই বলুন স্যার... ধরুন, মহারাজ দিগবিজয় সিং মনে মনে একটা সংখ্যা ভেবেছেন এক থেকে দশ লক্ষের মধ্যে। আপনাদের সেই সংখ্যা খুঁজে বার করতে হবে। প্রতিদিনই শুধু একটা করে সংখ্যা মহারাজকে বলতে পারবেন। শুনে মহারাজ জানাবেন, সেটা ঠিক না ভুল। তাহলে ক'দিন লাগবে সংখ্যাটা বার করতে?''

''একদিনও লাগতে পারে, আবার দশলক্ষ দিনও লাগতে পারে।'' আমি বললাম।

''ঠিক স্যার, সেইজন্যেই শ্রেয়াকে বলছিলাম শর্ট-কাট-এর কথা। অর্থাৎ আমরা যদি জানতাম মহারাজ দিগবিজয়ের দুর্বলতা হল ছয়। ছয় ছাড়া উনি আর কিছু ভাবতে পারেন না। তাহলে ৬ হবে সেই শর্ট-কাট। উনি ভাববেন ৬ বা ৬৬ বা ৬৬৬ বা ৬৬৬৬... তাহলে চট করে সংখ্যাটা বার করে ফেলা যাবে।''

''ননসেন্স, শ্রেয়ার সমস্যার শর্ট-কাটটা কি?'' প্রমথ একটু বিরক্ত হয়েই একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

''আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার। কিন্তু সেটাই প্রথম খুঁজে বার করতে হবে।''

''তোমার দাদার কথা কিছু বুঝলে?'' শ্রেয়াকে জিজ্ঞেস করল প্রমথ।

শ্রেয়া মাথা নাড়ল। কিন্তু হাসি দেখে বুঝলাম, বোনের হাত থেকে একেনবাবু সহজে ছাড়া পাবেন না।

ইতিমধ্যে লুচি আলুর দম এসে যাওয়ায় এ নিয়ে আর কথা হল না। তবে খেতে খেতে শ্রেয়া একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, ''তুমি আমার কী সাহায্য চাইছ, সেটা তো বললে না?''

''একজন মিসিং পার্সনের খোঁজ করতে।''

''মিসিং পার্সন?''

''হ্যাঁ।''

''ডিটেল-এ বলো।''

"পরে বলব রে, এখন বলতে গেলে লুচি আর আলুর দম মিসিং হয়ে যাবে।"

বোনের সঙ্গে একেনবাবুর আচরণ একেবারে টিপিক্যাল ভাই-বোনের মতো, একেবারে অন্য একেনবাবু! বেশ মজা লাগছিল দেখতে।

সেদিন বাড়িতে ফেরার পথে প্রমথ আমার পেছনে লাগতে শুরু করল। কোনও নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলেই যেটা ও করে।

"হ্যাঁরে, শ্রেয়াকে কেমন লাগল?"

"বেশ তো।"

"আমার কি মনে হয় জানিস, ওর মতো একটা মেয়ে তোর পক্ষে খুব ভালো হবে।"

"তুই নিজের চরকায় তেল দে।"

"না সিরিয়াসলি, মেয়েটা সুন্দরী, ব্রাইট... পুলিশে যখন চাকরি করে তখন তোর মতো ন্যালা-খ্যাপাকে সামলাতে পারবে।"

"তুই থামবি?"

"বেশ এখন থামছি, কিন্তু একেনবউদির কাছে কথাটা পাড়ব।"

"বউদিকে কিছু বললে তোকে আমি খুন করব।"

"করলে তো সেই শ্রেয়ার হাতেই ধরা পরবি। তারজন্যেই না হয় আমি মরব, তোদের মিলনের জন্য সেটা হবে আমার আত্মত্যাগ।"

"এবার স্টুপিডামিটা বন্ধ করে উত্তর দে, কাল 'গ্রিন-লিফ'-এ যাব চুল কাটতে আসবি?"

'গ্রিন-লিফ' নামটা বানালাম, খামোকা একটা কোম্পানির বিজ্ঞাপন দিতে চাই না। যার নামটা উহ্য রাখলাম, সেটা একটা ঝকঝকে ফাইভ-স্টার ইউনিসেক্স বিউটি সেলুন, একটা তিনতলা বাড়ির পুরো দোতলা জুড়ে। আমাদের বাড়ির থেকে বেশি দূরেও নয়।

"হঠাৎ গ্রিন লিফ-এ যাবি কেন, কোনও পাত্রীপক্ষ তোকে দেখতে আসছে নাকি?"

"এবার তোকে সত্যিই ঠ্যাঙাবো। যাবি কি না বল?"

"এটা একটা প্রশ্ন হল নাকি! নিশ্চয় যাব। যখন যাচ্ছি, তখন ব্ল্যাক-হেডগুলোও তুলে ফেলব।"

।। ৩ ।।

আমি আর প্রমথ কলকাতায় এলে সব সময়ে চুল কাটি। এখানে অনেক সস্তা। হিসেব করে দেখেছি, গ্রিন লিফ-এর মতো দামি সেলুনেও বেশি হলে আড়াইশো টাকা দিই। ম্যানহাটনে ওই স্ট্যান্ডার্ডের দোকানে টাকার হিসেবে অন্তত বারোশো গুনতে হয়! আর প্রমথ যে ব্ল্যাক-হেড তোলার কথা বলল, সেটা কী জানেন তো? চামড়ার ওপর কালো কালো বিন্দুর মতো। ওগুলো কেন হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রমথ দিয়েছিল, সেটা অবশ্য এখন মনে নেই। তবে মনে আছে প্রমথর গার্ল ফ্রেন্ড ফ্র্যান্সিস্কার পরামর্শে লোয়ার ম্যানহাটানের একটা বিউটি পার্লারে গিয়েছিলাম ব্ল্যাক-হেড তুলতে। তোলার কাজটা

মোটেই কঠিন নয়... ব্ল্যাক-হেডের ওপর প্লাস্টিকের সরু নল বা নজ্‌ল বসিয়ে ভ্যাকুয়ামের টানে চামড়ার ভেতর থেকে উৎপাটিত করা। তার আগে অবশ্য মুখে স্টিম দিয়ে চামড়াকে ঢিলে করতে হয়। ফলে এতটুকু ব্যথা লাগে না। তারপর মুখে ক্রিমটিম মাখিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলেই একেবারে চকচকে পরিষ্কার নতুন মুখ!

ম্যানহাটানে এটা করাতে আমাদের লেগেছিল কড়কড়ে একশো ডলার! নিতান্ত ফ্র্যান্সিস্কার চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। কলকাতার গ্রিন-লিফ-এ ওই একই কাজ ৮০০ টাকায় করানো যায়। একজনকে করাতেও দেখলাম গত বছর। যন্ত্রপাতি প্রায় একই, সেই লেটেক্স-এর গ্লাভস পরা বিউটিশিয়ান, মুখে যে ক্রিমটা দেয় সেটাও আলো ভেরা... ম্যানহ্যাটানে ওটাকেই লাগাতে দেখেছি। সুতরাং করানো যেতে পারে। করালে মা খুশি হবে, ক'দিন আগেই বলছিল, "হ্যাঁরে, তোর মুখে আবার ওই কালো কালো ফুটকিগুলো ফিরে এসেছে।"

গ্রিন লিফ-এ আগের চেনা মেয়েদের মধ্যে মাত্র একজনকে দেখলাম। রিসেপশিস্ট জানতে চাইল, আমরা কী করাতে চাই। উত্তর দিতে যাব এমন সময়ে মা-র একটা ফোন। আমি একটু সরে গিয়ে ফোনটা ধরলাম। মা-র প্রেশারের ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, বাড়ি আসার সময় যেন কিনে আনি। ফোন শেষ করে দেখি প্রমথ সেই চেনা মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে একটা চেয়ারে বসেছে। পাশে গোটা দুই চেয়ার খালি, কিন্তু সেখানে কোনও বিউটিশিয়ান নেই। প্রমথ কী বলেছিল জানি না, আমাকে রিসেপশানিস্ট মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "আপনিও কি হেয়ার কাট, ফেশিয়াল□ দুটোই করবেন?"

আমার ধারণা ছিল ফুল-ফেশিয়াল-এ আরও অনেক কিছু করা হয়। তাই বললাম, "চুল কাটব, আর ব্ল্যাকহেড রিমুভ করব। তার জন্য কি ফুল-ফেশিয়াল করতে হবে?"

"ঠিক আছে, আপনি একটু বসুন, আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।"

বসার জায়গাটা বেশ প্রশস্ত। একটা বড়ো সোফা, উলটো দিকে দু'জন বসার লাভসিট আর পাশে দুটো চেয়ার। মাঝখানে লম্বা কফি টেবিল। দেয়াল ঘেঁসে একটা র‍্যাকে হরেক রকমের ম্যাগাজিন□ বাংলা, ইংরেজি, কয়েকটা হিন্দিও দেখলাম। সেখান থেকে ইন্ডিয়া টুডে-টা তুলে নিয়ে বসলাম। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বড় সানগ্রাস চোখে হিজাব আর নিকাব পরা একটি মেয়ে ভিতরের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রথমে ভেবেছিলাম কাস্টমার। না, এখানেই কাজ করে, বিউটিশিয়ান।

"আসুন স্যার।"

আমার অসোয়াস্তি লাগল। শেষে হিজাব নিকাব পরা একটা মেয়ে চুল কাটবে, তার ওপর সানগ্রাস পরে! অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলাম। প্রমথর পাশের চেয়ারে মেয়েটি আমাকে বসাল। চাদর দিয়ে গা-টা ঢাকতে ঢাকতে জিজ্ঞেস করল, "প্লেইন হেয়ারকাট, শ্যাম্পু দিতে চান না, তাই তো?"

"ঠিক।"

"আর ব্ল্যাক-হেড রিমুভ করাবেন?

"এক্স্যাক্টলি, আর কিছু করার দরকার নেই।"

মেয়েটা দেখলাম চোখের সানগ্লাসটা খোলেনি। পুরো মুখটাই হিজাব, নিকাব আর সানগ্লাস-এ ঢাকা।

"সানগ্লাস চোখে ব্ল্যাক-হেডগুলো দেখতে পারবেন?" মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে

গেল।

"নিশ্চয় পারব।"

মুসলিম মেয়ে, মুখ দেখাতে চায় না বুঝতে পারি, কিন্তু চোখ দেখাতে এত অসুবিধা কেন বুঝলাম না! প্রমথ দেখি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ভাবটা কেমন জব্দ!

আমার দুর্ভাবনার কোনও কারণ ছিল না। মেয়েটা এফিশিয়েন্ট। নিউ ইয়র্কের সেলুনের মতোই ইলেক্ট্রিক হেয়ার-ক্লিপারের সঙ্গে কয়েক ধরণের চিরুনি অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে দ্রুত চুল-কাটার পর্ব শেষ করল। তারপর মুখে স্টিম দিয়ে আঙুলে কটন প্যাড জড়িয়ে কপালে আর গালের কয়েকটা জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিল। শেষে ভ্যাকুয়াম চালিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করল। ব্ল্যাকহেড তোলার পর আমার সামনে একটা বড় আয়না ধরে দেখাল। সত্যিই সবগুলো দাগই অদৃশ্য।

আমি সন্তোষ প্রকাশ করলাম, কিন্তু মুক্তি পেলাম না।

একটু ক্রিম মাখিয়ে দিচ্ছি বলে আলো ভেরার একটা বড় বোতল ড্রয়ার থেকে বার করে জিজ্ঞেস করল, আমার কোনও ক্রিম-এ অ্যালার্জি আছে কিনা। নেই শুনে চেয়ারটা হেলিয়ে দিয়ে মুখে ক্রিম লাগাতে শুরু করল। চুপচাপ না থেকে আমিও খেজুরে আলাপ শুরু করলাম।

"কতদিন ধরে বিউটিশিয়ানের কাজ করছেন?"

"বছর ছয়েক।"

"গত বছর কিন্তু আপনাকে এখানে দেখিনি।"

"আমি সব সময়ে কাজ করি না, আজকে আমরা শর্ট হ্যান্ডেড, তাই করছি।"

"ও, তার মানে আপনি ম্যানেজার?"

"তা বলতে পারেন," নিকাবের ভেতর থেকে একটু যেন হাসির আওয়াজ। "এই দোকানটা আমার।"

"আপনার! এটা তো একটা বিশাল চেইন!" অজান্তেই আমার বিস্ময়টা চেপে রাখতে পারলাম না।

"ঠিক। কিন্তু আমি শুধু এই ব্রাঞ্চটার ফ্র্যানচাইজ নিয়েছি। গ্রিন লিফ-এর মালিককে আমি চিনতাম, তাই পেলাম।"

"কিন্তু এটাও তো বিরাট দোকান, মাই গড!"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

মুখটা দেখতে পারছি না, কিন্তু আমার এই প্রবল বিস্ময়ে নিশ্চয় সেটা কৌতুকে পরিপূর্ণ।

"আপনি বোধহয় এখানে থাকেন না, তাই না?"

"হ্যাঁ, আমি বছর আটেক বিদেশে।"

"বিদেশে কোথায়?"

"নিউ ইয়র্ক। আমি ওখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই।" বাড়তি ইনফরমেশনটা না দিলেও চলত।

"কোন সাবজেক্ট?"

অর্ডিনারি বিউটিশিয়ান নয় বোঝাই যাচ্ছে। উত্তর দিলাম, "ফিজিক্স।"

"খুব কঠিন সাবজেক্ট, তাই না?"

আমি হাসলাম। তারপর একটু মজা করেই বললাম, "আমার এক গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট

মুসলিম মেয়ে। কাজের মাঝখানেই দেখি সে টুক করে নামাজ পড়তে বসে। টাইমটা বোধহয় ফিক্সড। তা, আপনার কাজ করতে অসুবিধা হয় না?”

“এই কাজ করতে গেলে সময় মতো নামাজ পড়া যায় না।” সংক্ষিপ্ত উত্তর।

প্রশ্নটা করা বোধহয় আমার উচিত হয়নি, মনে হল বিরক্ত হয়েছেন। কত বয়স মহিলার? ইচ্ছে হচ্ছিল মহিলার মুখটা দেখি। কী ঝামেলা! এই হিজাব-নিকাব ব্যাপারটা আমার একেবারেই অপছন্দ! না দেখা যায় চুল, না দেখা যায় মুখ।

ক্রিম-ফ্রিম লাগানো হয়ে যাবার পর ভাবছি এঁকে টিপস দিই কী করে, ইনি তো আমাকে দশবার কিনে বেচে দিতে পারেন! ক্যাশিয়ারের কাছে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা, আপনারা দেখি প্লাস্টিক গ্লাভস পরে কাজ করেন, কারণটা কি?”

“অনেক সংক্রামক অসুখ স্কিন কনটাক্টে হতে পারে। সবাইকেই এটা সুরক্ষা দেয়। তাছাড়া আমরা নানান রকম কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করি, অ্যাসিটোন, ফরম্যাল্ডিহাইড, টল্যুইন...।”

আরও দুয়েকটা নাম বলেছিলেন, মনে করতে পারছি না। পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ, বোঝাই যায় এজুকেটেড মুসলিম মহিলা। এমন সময় আরেক জন কাস্টমার এসে যাওয়ায় আর কথা হল না।

প্রমথর আগেই হয়ে গিয়েছিল। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বললাম, “জানিস, আমাকে যিনি ফেশিয়াল দিলেন, এই দোকানটা তাঁর।”

“ওই হিজাব-নিকাব পরা মহিলা?”

“হ্যাঁ। অবভিয়াসলি খুব কট্টর মুসিলিম ফামিলির।”

“নো ওয়ান্ডার। আমি আরেকজন মুসলিম মেয়েকে দেখলাম হিজাব নিকাব নয়, এক্কেবারে মাদার অফ অল থিংস, বোরখা। ভিতরের একটা ঘরে একজনকে বিউটি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে।”

“ইন্টারেস্টিং, নিশ্চয় এই মালকিনের রিক্রুট! আমি কী ভাবছি জানিস, এদিকে শরীর আর মুখ ঢেকে রাখছে পর-পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার জন্য, আবার আড়ালে থেকে পর-পুরুষদের গায়ে হাতও লাগাচ্ছে বিউটিকেয়ার করার অজুহাতে। এক ধরণের ক্যাথারসিস বলতে পারিস! নিজেরদের অবদমিত ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ।”

“ওরেব্বাস, বড় বড় কথা বলছিস!”

প্রমথ উঠতে বসতে আমাকে জ্ঞান দেয়, কিন্তু ওকে সিরিয়াস কিছু বলতে গেলেই মজা করে উড়িয়ে দেয়।

।। ৪।।

পরের দিন দশেক বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বালিগঞ্জ গভর্মমেন্ট স্কুলের রি-ইউনিয়ন আর যাদবপুরে কয়েকটা স্পেশাল লেকচার দেবার ব্যাপার ছিল। যাদবপুরে বছর দুই আগে স্যাবাটিক্যাল নিয়ে এসেছিলাম, ওখানে ডাকলে তো যেতেই হয়। শুক্রবার বিকেলে

লেকচার দিয়ে বেরোচ্ছি হঠাৎ পেছন থেকে কে জানি ডাকল, "বাপিদা!"

ফিরে যাকে দেখলাম, তাকে এখানে দেখব কল্পনা করিনি। শ্রেয়া। ধরাচুড়ো নেই। কাঁধ পর্যন্ত নামা এলো চুল। হাল্কা কমলা শর্ট-স্লীভ টি-র ওপর হাত-কাটা ডেনিম জ্যাকেট আর ম্যাচিং জিনস। আজকাল ম্যানহাটান আর কলকাতার পোশাকে অনেক সময়েই ফারাক দেখি না।

"তুমি!"

"এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। শুনলাম তুমি বক্তৃতা দিতে এসেছ। ভাবলাম একটু দাঁড়িয়ে যাই।"

"ভালো করেছ। কিন্তু কী কাজে এসেছিলে... সেই হসপিটাল ডেথের কেস?"

"না," হেসে ফেলল শ্রেয়া, "নিজের কাজে।"

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি করার কথা ভাবছি।"

"পুলিশের এত ভালো কাজ ছেড়ে দিয়ে?"

"কেন, ছাড়া যায় না?"

"তা নিশ্চয় যায়। কিন্তু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে করবেটা কী?"

"কেন, তোমাদের মতো পড়াব?"

"তোমার মাথাটা একবার দেখাও তো? আইপিএস অফিসার এইসব কথা বলছে শুনলে লোকে এটাই বলবে।"

আমার কথাটাকে কানে তুলল না শ্রেয়া। "দাদার সঙ্গে সকালে কথা হল। তুমি নাকি একটা ভালো রিসার্চ গ্র্যান্ট পেয়েছ?"

"ভালো কিনা জানি না, তবে এনএসএফ-এর একটা গ্র্যান্ট এবার জুটে গেছে।"

"আমি যদি ওখানে গিয়ে ভালো গ্রেড পাই, তাহলে তো তুমি একটা অ্যাসিস্টেন্টশিপ দিতে পারবে। পারবে না?"

"আমার ভরসায় থাকলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। তার থেকে তোমার দাদাকে ধর, উনি বেশ টু-পাইস কামাচ্ছেন। পার্ট-টাইম ওঁর সঙ্গে কাজ করলে কোনও চিন্তাই নেই।"

"তাহলে তো যাওয়াটা মুশকিল।" শ্রেয়া মুখ গম্ভীর করার চেষ্টা করেও হেসে ফেলল।

"ব্যাপারটা কি, তুমি সিরিয়াস নাকি?"

"নিশ্চয়, এখানে তো এসেছি রেকমেন্ডেশন লেটারের জন্য... আমাদের বিএইচইউ-র মাস্টারমশাই এখন যাদবপুরের ফ্যাকাল্টি।"

এমন সময়ে শ্রেয়ার মোবাইল বেজে উঠল।

"হ্যাঁ, আসছি স্যার।" উত্তর দিয়ে ফোনটা বন্ধ করে বলল, "মাস্টারমশাই ডেকেছেন... লেটার রেডি হয়ে গেছে। পরে কথা হবে।"

"গুডলাক।" বললাম ঠিকই, কিন্তু সত্যিই যদি চাকরি ছেড়েছুড়ে দেয়, পরে আপশোস করবে। দ্য গ্রাস ইজ অলয়েজ গ্রিনার অন দ্য আদার সাইড। অথবা অন্য কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা? কে জানে!

শীতকালে কলকাতা আসার একটা বড় নেগেটিভ হল থাকার সময়টা বড্ড অল্প। মেরে কেটে সপ্তাহ চারেক, তাও নয়। গ্রীষ্মকালে সময় বেশি পাই, কিন্তু গরমের কষ্টটা সহ্য করতে হয়। মা অপেক্ষা করে থাকে। তাই বছরে দু'বার করেই আসি। যদ্দিন মা আছে,

সেটাই করতে হবে। যাবার সময় এগিয়ে আসছে। ব্যাগ গোছানো শুরু করেছি, জানুয়ারির দশ তারিখ থেকে ক্লাস আরম্ভ হবে পুরোদমে। কলকাতা ছাড়ার আগের দিন একেনবাবুর বাড়ি গেলাম। বেশ কয়েক দিন আমাদের আড্ডা হয়নি। ফোনে অবশ্য কথা হয়, বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই। কিন্তু ওঁর নিউ ইয়র্কে যাবার প্ল্যানটা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। আর এবার যাবার পর কতদিন ওখানে থাকবেন, সেটাও জানি না। হয়তো আর এক বছর, কিছুই নিশ্চিত নয়। উনি না থাকলে আমাদের ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে হবে। তবে কিনা প্রমথর ব্যাপারটাও অনিশ্চিত। প্রমথ যদি এরমধ্যে ফ্র্যান্সিস্কাকে বিয়ে করে, তাহলে তো প্রমথও থাকছে না।

কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি বলে মনটা বিক্ষিপ্ত, জমিয়ে তেমন গল্প হল না। একেনবউদিকে কাছ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছি, হঠাৎ নিজের থেকেই আমার দুটো হাত ধরলেন, "আপনাদের ওখানে ও থাকে বলে কত নিশ্চিন্তে থাকি! ও-ও আপনাদের দু'জনকে ভাইয়ের মতো দেখে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ও চলে এলে আপনাদেরও খুব খারাপ লাগবে জানি।"

"তা লাগবে বউদি, খুবই লাগবে। কিন্তু উনি তো ফিরে আসবেন নিজের জায়গায়। তাই না?" বলতে বলতে আমিও একটু ইমোশানাল হয়ে গেলাম।

।। ৫ ।।

একেনবাবু এলেন ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে এয়ার ইন্ডিয়ার সকালের ফ্লাইটে। ভাগ্যক্রমে সকালে ক্লাস ছিল না। এয়ারপোর্টে গেলাম ওঁকে আনতে। আজকাল এয়ারপোর্টের ভিতরে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করা যায় না। হয় পয়সা দিয়ে পার্কিং-এ রাখতে হয়, নয় বাইরে যাত্রী বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত এয়ারপোর্টে চক্কর দিতে হয়। কতক্ষণ লাগবে বেরোতে ইমিগ্রেশন, ব্যাগ চেক-আউট, কাস্টমস, ইত্যাদিতে করে, জানার কোনও উপায় নেই। তাই সেই ঝামেলায় না গিয়ে গাড়ি পার্ক করে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর ভিতরেই অপেক্ষা করছিলাম। কাস্টমস ক্লিয়ার করে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে একেনবাবু উৎফুল্ল।

"ভাগ্যিস এলেন স্যার, টেনশনে ছিলাম আপনি আসতে পারবেন কি না।"

"না এলে আর কী হত, শাটল বাস ধরে সোজা চলে যেতেন গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনালে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে অ্যাপার্টমেন্টে।"

"তা যাওয়া যেত ঠিকই স্যার, কিন্তু গল্পটা তো হত না।"

"হত, কিন্তু একটু পরে হত। তা আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে কলকাতায়?"

"চলছে ঠিকই স্যার, কিন্তু আপনারা না থাকলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে!"

"আপনাকেও তো আমরা মিস করি। বউদি কেমন আছেন?"

"উত্তরটা দেওয়া কঠিন স্যার।"

"এর উত্তর দেওয়া কঠিন? প্রমথ ঠিকই বলে, আপনি সামথিং!"

"না না স্যার, আসল ব্যাপারটা হল, ফ্যামিলির মনের খবর তো জানা অসম্ভব। তবে

একটু চাপে আছি স্যার।"

"কেন?"

"এই যে স্যার 'ন যযৌ, ন তস্থৌ'। মানে এদিকেও নেই, ওদিকেও নেই...কথাটা ঠিক বললাম কি? আমার আবার সংস্কৃত গুলিয়ে যায়।"

"হাফ-এম্পটি না ভেবে হাফ-ফুল ভাবুন না... এদিকেও আছেন, ওদিকেও আছেন। আপনি তো মাল্টি-ন্যাশেনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি চালাচ্ছেন!"

"এটা মন্দ বলেননি স্যার। না, ওখানেও একটু আধটু হচ্ছে। এবার শ্রেয়াও প্রচুর হেল্প করেছে। আসলে স্যার মিসিং পার্সন খুঁজে পাওয়াটা একার কর্ম নয়।"

"তাহলে আর কি, এখানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ওখানে আপনার বোন শ্রেয়া... দু'দিকেই তো পুলিশের হেল্প গ্যারান্টিড!"

"কী যে বলেন স্যার।"

"তা শ্রেয়ার খবর কি?"

"ভালো নয় স্যার, মেয়েটা চাকরি ছাড়তে চাইছে, আপনাদের লাইনে আসতে চায়।"

"হ্যাঁ, সেদিন আমাকেও বলেছিল বটে।"

"আসলে খুব স্ট্রেস-এর মধ্যে আছে স্যার। এই নার্ভের অসুখে মৃত্যু একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল নিয়েছে।"

"তারে মানে?"

"যে মারা গেছে, তার বাবা শুধু বড়োলোক নয়, এক পলিটিকাল চাঁইয়ের ফাইনান্সিয়ার ছিলেন। শুধু গত ইলেকশনে সেই বড়োলোক বাবা বিরোধী পক্ষেও টাকা ঢেলেছেন। যার ফলে এই মার্কারি পয়জনিং মার্ডারের অ্যাঙ্গেল নিয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুল বা গাফিলতি নয় স্যার, পরিকল্পিত ভাবে হত্যা!"

"আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। খুন করার তো আরও অনেক সহজ উপায় আছে, তাই না?"

"ট্রু স্যার।"

"যদি না কেউ চায় খুব কষ্ট পেয়ে লোকটা মরুক।"

"এটাও ভালো পয়েন্ট স্যার, ব্যাপারটা খুবই কনফিউসিং।"

একেনবাবুর সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ গল্প চালানো যায় না। এর মধ্যেই মার্কিন মুলুক আর ইন্ডিয়ার ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে তুমুল এক প্রস্থ আলোচনা হয়ে গেল। একেনবাবুর ঘোরতর আপত্তি দেশে কেন ওঁর ইনকাম ট্যাক্স কাটছে, উনি তো আমেরিকাতেও ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছেন।

"এটা তো স্যার ডাবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে!" আমাকে বললেন।

"ডাবল ট্যাক্সেশন কেন হবে? আপনি আমেরিকায় তো গ্লোবাল ইনকাম-এর ওপর ট্যাক্স দিচ্ছেন দেশের আয়, আমেরিকার আয়... সব কিছুর ওপরে। দেশে কিছু কেটে নিলে আপনি স্বচ্ছন্দে দেশে যে ট্যাক্স দিয়েছেন তা আমেরিকার ট্যাক্স থেকে বাদ দিতে পারেন।"

"দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান, তার মানে আপনি দেশে যে ইন্টারেস্ট পান, সেগুলো এখানে ট্যাক্সের কাগজ জমা দেবার সময়ে দেখান?"

"আপনি দেখান না? সেটাই তো আইন!"

"কী সর্বনাশ স্যার, আমি তো দেখাই না! ভাবি ওটা দেশের ব্যাপার। তাছাড়া এত অল্প

ইন্টারেস্ট পাই ব্যাঙ্ক থেকে।”

“সেই অল্পটুকুই দেখাবেন। তাহলে আর দেশে ট্যাক্স দিচ্ছেন বলে হা-হুতাশ করতে হবে না।”

“এটাও ঠিক বলেছেন স্যার। এইজন্যেই দেশে আপনাদের আমি খুব মিস করি!”

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা “স্যার, আপনার এক ছাত্রী ছিল না, নাসরিন নামে?”

“হ্যাঁ। হঠাৎ তার প্রসঙ্গ কেন?”

“না খুব ভালো ছিলেন উনি। সব সময়ে হিজাব পরে থাকতেন। আপনার কাছে কী একটা পড়া দেখতে এসেছিলেন, নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় আপনার অনুমতি নিয়ে নামাজ পড়তে বসলেন।”

“আপনার মনে আছে সেটা? গল্পটা আমি অনেককেই করেছি।”

“হ্যাঁ, খুব ধার্মিক মেয়ে ছিলেন। আচ্ছা স্যার হিজাব আর নিকাব-এর মধ্যে তফাৎটা কি?”

“নিকাব হল নাক আর মুখ যে কাপর দিয়ে ঢাকা হয়... হিজাবের সঙ্গে মেয়েরা পরে... যারা আরও রক্ষণশীল মুসলিম।”

“তবে টপ-এ তো আছে স্যার বোরখা। চোখও ঢাকা একটা জাল দিয়ে।”

আমি জানি, এই হিজাব, নিকাব আর বোরখার কোনওটাই একেনবাবুর অজানা নয়। কিন্তু বক বক না করে উনি থাকতে পারেন না। প্রমথর সঙ্গে এগুলো করতে গেলেই ধমক খান। ‘কী ভেবেছেন মশাই আপনি, আলতু ফালতু বকে সময় নষ্ট করছেন? আমাদের সময়ের দাম নেই?’

আমি সেটা পারি না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, “হঠাৎ হিজাব, নিকাব আর বোরখা নিয়ে গবেষণা করছেন কেন?”

“আসলে স্যার, এবার আধার কার্ডটা করালাম। আপনি করেছেন?”

“না।”

“করিয়ে নেবেন স্যার, অধিকন্তু না দোষায়।”

“কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন আধার কার্ড নিয়ে।”

“ও হ্যাঁ স্যার। যখন ছবি তুলতে গেলাম, মুখের ছবি তো নিলই। চোখের তারার ছবিও নিল। তখনই মনে হল স্যার বোরখা পরা মুসলিম মহিলাদের চোখের তারার ছবি তুলবে কী করে, নিকাব থাকলে মুখের ছবিই বা উঠবে কী করে?”

“ভারতে তো মুসলিম পপুলেশন কম নয়। নিশ্চয় এই সমস্যার একটা সুরাহা হয়েছে। বোরখা খুলে বা মুখের ঢাকাটা সরিয়েই নিশ্চয় ছবি তোলা হয়।”

“এক্স্যাক্টলি স্যার। তবে কিনা মহিলারা সেই ছবি তোলেন। সেটাই আমাকে বললেন যিনি ছবি তুলছিলেন। কী ঝামেলা বলুন তো স্যার?”

“আমার কিন্তু ছবি তোলার থেকে বেশি চিন্তা এঁদের আধার কার্ড দেখে কী করে বোঝা যাবে কার্ডধারীই আসল লোক কি না। সঙ্গে কোনও মহিলা না থাকলে তো পরীক্ষা করার কোনও উপায় নেই!”

“আঙুলের ছাপ থেকে করা যাবে স্যার। তবে হ্যাঁ, সেই যন্ত্রটা থাকতে হবে।”

“আর নেট কানেকশন থাকতে হবে, সেই সঙ্গে সার্ভারও চালু থাকতে হবে। অনেক সময়েই তো শুনেছি সার্ভার ডাউন থাকে।”

“এটা মন্দ বলেননি স্যার। আসার সময়ে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিতে দেখলাম নিকাব

আর বোরখা পরা মহিলাদের আলাদা করে আড়ালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আইডেন্টিফাই করার জন্য। মুসলিম হবার কী ঝামেলা স্যার।”

“মুসলিম হবার ঝামেলা নয়, ঝামেলা হল ধর্মের গোঁড়ামি আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ! দেশে হিন্দু মেয়েরাও তো ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখত, রাখত না? এখনও তো কেউ কেউ রাখে।” আমি বললাম।

“ঠিকই স্যার, এটা ভাবিনি। তবে শুনলাম ইউ-এ-ই-তে নাকি একটা যন্ত্র বসিয়েছে যেটা মুখের কাপড় ভেদ করে চোখের তারা বা আইরিস দেখতে পায় ... অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং। বিজ্ঞান কিন্তু সমাজ ধর্ম সব কিছুর মুখোশ ভেদ করতে পারে। পারে কি না স্যার, বলুন?”

“নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে ‘না’ বলি কী করে! ভালো কথা, আজ হঠাৎ নিকাব আর বোরখা নিয়ে পড়লেন কেন?”

“আসলে স্যার প্লেনে আসতে আসতে একটা সিনেমা দেখছিলাম। জেল থেকে একটা আর্ট-চোর বোরখা পরে কী ভাবে পালাল... সেই নিয়ে গল্প।”

“বোরখা না পরেও তো লোকে পালাতে পারে!” আমি হেসে ফেললাম।

“এটাও ঠিক বলেছেন স্যার।”

এই রকম বকর বকর করতে করতে যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি প্রমথ ফুল-কোর্স ব্রেকফাস্ট বানিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সাওয়ার ডো ব্রেড, সসেজ, বেকন, অমলেট, কফি আর একটা বড় বোল-এ আঙুর, কলা আর মেলনের টুকরো।

ব্রেকফাস্টের আয়োজন দেখে একেনবাবু উত্তেজিত। “অনেক দিন বাদে স্যার সাওয়ার ডো ব্রেড, সসেজ আর বেকন! থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যি স্যার, প্রমথবাবু আছেন বলেই এসব জোটে।”

“থাক আপনাকে আর তেল মারতে হবে না, বউদি এখানে নেই, আমাদের হাবিজাবি রান্নাই আপনাকে খেতে হবে।”

“কী যে বলেন স্যার, এগুলো হাবিজাবি?” বলতে বলতে একেনবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

আজকে কফিটাও দুর্ধর্ষ হয়েছে! সেটা বলতেই প্রমথ বলল, একটা নতুন অ্যারাবিকা কফি বিন ব্যবহার করলাম।”

“আচ্ছা স্যার এই অ্যারাবিকা কফিগুলো কি আরব দেশ থেকে আসে?”

“অ্যারাবিকা হল এক ধরণের কফি বীজ। যেরকম, রোবাস্টা। আপনাকে তো বলেছিলাম একদিন। বলিনি?”

“ও হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। কী করে যে ভুলে গেলাম স্যার, কে জানে!”

“আপনার ভুলে যাবার কথায় আমার মনে পড়ল... একটু আগে শ্রেয়া ফোন করেছিল। আপনার সঙ্গে কী জানি আলোচনা করতে চায়। আপনাকে মোবাইলে ধরতে পারেনি, তাই ল্যান্ড লাইনে ধরার চেষ্টা করেছে।”

“তাই নাকি! একজন ইন্ডিয়াতে ক’টা বাজে স্যার?”

প্রমথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, রাত দশটা।”

“ঠিক আছে স্যার, খেয়েই তাহলে ফোন করি।”

প্রসঙ্গত বলি, হোয়াট্সঅ্যাপ চালু হবার পর থেকে একেনবাবু এখন দেশে ফোন

করতে এতটুকু ভাবনা চিন্তা করেন না। মনে আছে একটা স্মার্টফোন কিনতে বলায় প্রথম কী রকম হাত-পা ছুঁড়েছিলেন, "এগুলো স্যার পয়সার শ্রাদ্ধ! এতে কি কথা বেশি শোনা যাবে?"

"তা যাবে না, কিন্তু এতে অনেক অ্যাপ্স থাকবে... নতুন নতুন অ্যাপ্স বাজারে আসবে, অনেক কনভেনিয়েন্ট। প্রমথ বুঝিয়েছিল।"

"না স্যার। ওই যে আমাকে ল্যাপটপ কিনিয়েছিলেন, ঠিক আছে, আর কোনও গ্যাজেট নয়।"

পরে যখন দেখলেন আমারা হোয়াট্সঅ্যাপ দিয়ে কলকাতায় ফোন করছি। তখন পুরোনো বস্তাপচা ফোনটা ফেলে একটা স্মার্টফোন কিনেছেন। একেনবউদিকেও কিনে দিয়েছেন। হিসেব কষে দেখেছেন এতে পয়সার অনেক সাশ্রয় হচ্ছে।

ফোন সেরে এসে একেনবাবু বললেন, "বুঝলেন স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং ডেভালাপমেন্ট। যে কিশলয় মারা গেছে, তার নাম কিন্তু আগে অন্য ছিল। বছর পাঁচেক আগে দিল্লীতে ওটা পালটানো হয়েছে।"

"নাম পালটানো হয়েছে? কারণ?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"কারণ হল কুষ্ঠীগত।"

"কী বলছেন মশাই যা-তা!"

"ঠিকই বলছি স্যার। ইন্ডিয়াতে নাম পালটানো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। প্রথমে স্ট্যাম্প পেপারে পুরোনো নাম আর নতুন নাম লিখে বাড়ির ঠিকানা দিতে হয়। সেখানে একটা কারণ দিতে লাগে কেন নামটা পালটাতে চাওয়া হচ্ছে। কিশলয়ের ক্ষেত্রে কারণটা দেওয়া হয়েছিল কুষ্ঠীগত... কুষ্ঠী অনুসারে নামটা 'ক' দিয়ে শুরু হতে হবে।"

"এটাও একটা যুক্তি? তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এই এফিডেবিটটা দু'জনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল দুটো পত্রিকায় একটা ইংরেজি, আরেকটা হিন্দি। তাতে ছিল, আমি অমুক, এই ঠিকানায় বাস করি, নিজের নাম বদলে অমুক তারিখ থেকে এই নতুন নামে পরিচিত হতে চাই। ব্যাস।"

"এতেই হয়ে যায়? আমার তো ধারণা ছিল একটা ফর্ম আর কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয় সরকারি অফিসে?"

"ঠিকই বলেছেন স্যার, নাম-পরিবর্তনের একটা গেজেট আছে। অফিশিয়ালি সেখানে একটা ফর্ম ফিল-আপ করে নিজের ছবি দিয়ে পত্রিকার বিজ্ঞপন জমা দিলেই কাজটা হয়ে যায়... আরও দুয়েকটা ছোটোখাটো জিনিস লাগতে পারে। গেজেট-এ নাম উঠলেই আইনত নতুন নাম হয়ে গেল।

"আগে নামটা কী ছিল?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"সংগ্রাম দত্ত।"

"এত বছর বাদে সংগ্রাম দত্তের এইভাবে নাম পালটানোর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার নয়। ডালমে কুছ কালা হয়।"

"ঠিক স্যার, সেই অ্যাঙ্গেল থেকেই শ্রেয়া দেখছে। নামটা আমার অপরিচিত নয় স্যার, ওর বিরুদ্ধে একাধিক জেনারেল ডায়রি ছিল। একটা এফআইআরও ছিল। নাইট ক্লাবে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ায় একবার অ্যারেস্টেডও হয়েছিল। আমাদের দেশে বড়লোকদের পুত্র স্যার, অবাক হবার কিছু নেই।"

"কিন্তু নাম পালটে লাভটা কী হল, লোকটা তো বদলাল না, ক্রিমিমাল রেকর্ড থাকলে নাম পালটে তো সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।"

"তা যাবে না স্যার, কিন্তু শ্রেয়ার মতো গভীর ভাবে ক'জন তলিয়ে দেখে। বেশির ভাগ পুলিশই কিশলয়ের নামে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড না পেলে আগের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

"মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি, এখন তো ওকে শাস্তিও দেওয়া যাবে না, ও এখন যেখানে সেখানে দেশের আইন খাটবে না।" প্রমথ বলল।

"এটা ভালো বলেছেন স্যার।"

"খারাপটা আমি কখন বলি? ভালো কথা, এদেশে তো নাম পালটাতে গেলে শপথ করে বলতে হয় আমার নামে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। দেশে হয় না?"

"মিথ্যে বলা তো খুব সহজ স্যার আমাদের দেশে... বললেই হয়... কম তো দেখিনি জীবনে।"

"আপনার গলায় একটা হতাশার সুর শুনছি।"

"তা নয় স্যার, শ্রেয়াকে আমি ছোট্ট থেকে দেখেছি, খুব আদর্শবাদী মেয়ে। ঠিক কাজ করতে গিয়ে ও যদি ধাক্কা খায়... যা খাবেই আমি জানি... খুব খারাপ লাগবে স্যার।"

"আপনি গাইড করবেন এখান থেকে।"

"আমি স্যার? দশ হাজার মাইল দূর থেকে?"

"দশ হাজার নয়, আট হাজার মাইল।" প্রমথ শুদ্ধ করে দিল।

"ওই হল স্যার।"

"আপনার তো অনেক চেনাজানা গুণমুগ্ধ ভক্ত আছে, তাঁরা গাইড করবেন।"

"তা করবে। আসলে স্যার, খুব আদর্শবাদী হলে আমাদের দেশে এসব লাইনে চাকরি করা কঠিন। আমার আন্ডারে কাজ করত বিবেক বলে একটি ছেলে। পুলিশে ঢুকেছিল গীতার বাণী পালন করতে... মানে, দুষ্টলোকদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপন করবে বলে। আমরা বুঝিয়েছিলাম অতবড় আদর্শ নিয়ে টিকতে পারবে না। মাঝে মধ্যে এক আধটা চোর-বদমায়শকে ধরতে পারলেই যথেষ্ট। কে তাকে বোঝায়! নিত্য নূতন আইডিয়া নিয়ে আসত, যা ওর কাজের মধ্যেও পড়ে না।"

"যেমন?"

"একটা আইডিয়ার কথা বলি। এই তো কিছুদিন আগের কথা। ট্র্যাফিক লাইট কলকাতায় হঠাৎ করে লাল হয়ে যায়। ফলে অনেকেই গাড়ি ঠিক জায়গায় থামাতে পারে না, লাইন ক্রস করে যায়, এমন কি এক আধ সময়ে রেডলাইটও জাম্প করে। বিবেক ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টকে বলল, লালবাতি জ্বালানোর আগে কিছুক্ষণ হলুদবাতি জ্বালানো হোক। তাহলে ড্রাইভাররা সাবধান হবার সুযোগ পাবে।"

"এটাতে আমি সহমত। আমি তো ভেবেই পাই না, কেন লালবাতির টাইমার দেওয়া হয় কতক্ষণ পরে নীল হবে জানানোর জন্যে। অথচ উলটোটা হলেই তো ভালো হত।"

"ঠিক স্যার, কিন্তু বিবেকের প্রস্তাব কেউ কানে তুলল না।"

"কেন বলুন তো... এতে পুলিশের ফাইন করার সুযোগ কমবে বলে, না ফাইনের বদলে ঘুষ কালেকশন কম হবে বলে?"

"কে জানে স্যার?"

একেনবাবুর কথা বলার ধরণে মনে হল, উত্তরটা জানা থাকলেও দিচ্ছেন না।

"আরও একটা আইডিয়ার কথা বলি। বিবেক থানার ভিতরে সিসিটিভি রাখার প্রস্তাব

দিয়েছিল। থানায় এনে লোকেদের হেনস্থা করা হচ্ছে কিনা, সেটা কর্তৃপক্ষ দেখতে পারবেন। অবশ্যই ওর প্রস্তাবে কেউ কান দিল না। এদিকে ও এক সাংবাদিক বন্ধুকেও এটা জানিয়েছিল। ফলে সে নিয়ে পত্রিকায় অনেক জলঘোলা হল।"

"বিবেকবাবু এখন কোথায়?

"জানি না স্যার। যেটা বলতে চাচ্ছি, শুধু আদর্শ মেনে চললে তো হয় না।"

"তার মানে আপনি বলতে চান, পুলিশে যারা আছে, তারা সবাই আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে কাজ করছে... তাই তো?" প্রমথ এবার চেপে ধরল। "আপনি নিজে তো মশাই বহু বছর পুলিশে চাকরি করেছেন!"

"তা করেছি স্যার, কিন্তু এখন তো করছি না।"

"তার মানে আগে নেতাদের তেল দিয়ে চলতেন, কিন্তু এখন আপনি সৎ এবং আদর্শবান!"

"কী যে বলেন স্যার, তাই কি বললাম? কলকাতা পুলিশেও অনেক সৎ অফিসার আছেন, নইলে চলবে কী করে!"

"তাহলে বোনের জন্য এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন?"

"প্রমথ বাবু না স্যার, সত্যি?" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন একেনবাবু।

"প্রমথর কথা ছাড়ুন, আর কিছু জানলেন শ্রেয়ার কাছ থেকে?"

"আর কিছু নয় স্যার। এখন তো ওখানে মাঝ রাত্তির, কাল সকালে ফোন করলে হয়তো আরও কিছু জানতে পারব।"

।। ৬।।

দুপুরে একেনবাবু একটা লম্বা ঘুম দিলেন... জেটল্যাগের এফেক্ট। ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি উনি ওঠার তোড়জোর করছেন।

আমাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস ঘুম হয়েছে স্যার। খুব ফ্রেশ লাগছে। প্রমথবাবু কোথায়?"

"প্রমথও আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে। ও খুব খুশি, ওর একটা পেপার কেমিক্যাল রিভিউ এ্যাকসেপ্ট করেছে।"

"তা হলে তো সেলিব্রেট করতে হয়।"

"হ্যাঁ আজকে ওকে আর ফ্র্যান্সিস্কাকে খেতে নিয়ে যাব।"

"বাড়িতেও তো সেলিব্রেট করা যায় স্যার।" বুঝলাম একেনবাবুর দুশ্চিন্তা হয়েছে টাকা খসবে বলে।

"দুশ্চিন্তা করবেন না, দ্য বিল ইজ অন মি।"

"না, না, সে কি স্যার!" একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন। "আমরা সবাই কন্ট্রিবিউট করব।"

এইসব কথার মধ্যেই প্রমথ ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, "শোন, আজকে আমরা সবাই বাইরে খেতে যাব।"

“দূর, বাইরে কেন যাব? ফ্র্যান্সিস্কা চিকেন রোস্ট করে আনছে। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে দুয়েকটা ইন্ডিয়ান সাইড ডিশ করতে।”

“এটা তো খুবই ভালো প্ল্যান স্যার,” একেনবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন।

আমি বললাম, “আজ যাচ্ছিস না, ঠিক আছে। কিন্তু খাওয়াটা তোর পাওনা রইল। কেমিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্টে লেখা বেরোচ্ছে, সেলিব্রেট তো করতে হবে। একটা দিন ঠিক করে রাখ, তোদের দু’জনকে খাওয়াব।”

ফ্র্যান্সিস্কা এলে যা হয়। রাত্রের খাওয়া খুবই জোরদার হল। ফ্রান্সিস্কার চিকেন রোস্ট অর্ডিনারি রোস্ট নয়, মেপল গ্লেইজ দেওয়ায় তার স্বাদই আলাদা। সঙ্গে অলিভ অয়েল দিয়ে অ্যাসপারাগস আর ফুলকপি রোস্ট। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য প্রমথর স্পেশালিটি— রোস্টেড কাজুবাদাম আর ধনেপাতা-কুচি সজ্জিত ভেজিটেবিল পোলাও... ঘি-তে এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, পেঁয়াজ লালচে করে ভেজে টুকরো টুকরো নানান সবজি দিয়ে বাসমতি চালের ক্লাসিক। সেইসঙ্গে অবশ্যই রায়তা।

খেতে খেতে কলকাতার গল্প হল। কথায় কথায় শ্রেয়ার প্রসঙ্গ এল। ফ্র্যান্সিস্কা ভীষণ উৎসাহিত ডিটেকটিভের বোন পুলিশ-অফিসার শুনে।

“আই মাস্ট মিট হার।”

“এখানে পাবে কোথায়?” প্রমথ বলল।

“কেন আমরা দেশে যাচ্ছি না?”

দেশ মানে নিশ্চয় কলকাতা। পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, বিয়ের প্ল্যানিং বোধহয় ওদের শুরু হয়েছে।

“দেশে গেলেও ওর দেখা নাও পেতে পার, তদন্তের কাজে ও ভীষণ ব্যস্ত!” প্রমথ একটু লজ্জা পেয়ে রহস্য করল।

“কী যে বলেন স্যার, ম্যাডাম যাবেন আর শ্রেয়া দেখা করতে আসবে না?” তারপর হঠাৎ বললেন, “ও হ্যাঁ, স্যার, আসল একটা কথা তো আপনাদের বলা হয়নি। মিনামাতার পসিবিলিটি, মানে কন্টামিনেটেড ফিশ-এর ব্যাপারটাও শ্রেয়া উড়িয়ে দিচ্ছে না।”

ফ্র্যান্সিস্কা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। কিন্তু গল্পটা ওকে শুনতে হবে। সংক্ষেপে পুরোটাই বলার চেষ্টা করলাম। দুয়েকটা ভুল প্রমথ শুদ্ধ করল। তারপর একেনবাবুকে বলল, “এবার বলুন মশাই, যা বলছিলেন।”

একেনবাবু যা বললেন, তা হল— হাওড়ার দুটো ফ্যাক্টরি বিষাক্ত বর্জ গঙ্গার জলে ফেলছে বলে ধরা পড়েছে, কিন্তু সেগুলোতে মার্কারির পরিমাণ কতটা জানা যায়নি। জানা গেলেও যে খুব একটা লাভ হবে তা নয়, কলকাতার বাজারে নানান জায়গা থেকে মাছ আসে, এমন কি বাংলাদেশ থেকেও। তবে যেটা সবচেয়ে বড় খবর, সেটা হল কিশলয় ছাড়াও আরও এক যুবকের খোঁজ শ্রেয়া পেয়েছে, যে কিছুদিন আগে নার্ভের অসুখেই মারা গেছে, আর ওরা দুজনেই ডাঃ সিনহানিয়ার ডেন্টাল ক্লিনিকে যেত।

“দাঁড়ান দাঁড়ান, তার সঙ্গে মার্কারি পয়জনের সম্পর্ক কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তরটা প্রমথ দিল, “এক সময়ে ডেন্টাল ফিলিং-এ মার্কারি কম্পাউন্ড ব্যবহার করা হত। তবে এখন লোকে অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। দাঁতের কাজে মার্কারির ব্যবহার, হয় না বললেই চলে। কলকাতার কথা অবশ্য জানি না।”

“ঠিক বলেছেন স্যার, শ্রেয়া খোঁজ নিয়ে জেনেছে ডাক্তার সিনহানিয়া— দাঁতের ফিলিং-এ অ্যামালগাম, মানে মার্কারি কম্পাউন্ড ব্যবহার করছেন বহু বছর ধরে। তার জন্য যা যা

সাবধানতা নিতে হয় সবই নেন। তাছাড়া ইদানীং উনি নাকি মার্কারির সঙ্গে ইন্ডিয়াম ব্যবহার করছেন, তাতে মার্কারি ভেপার বেরোনোর সমস্যা অনেক কমে যায়। এসব টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আমি ঠিক জানি না।"

"আমি কিছুটা জানি।" প্রমথ বলল, "এ নিয়ে এদেশে ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক রিসার্চ করেছে। ঠিকঠাক সাবধানতা নিলে কোনও সমস্যাই নেই। অসাবধান হলে ডেন্টিস্ট নিজেও মার্কারি ভেপারে অসুস্থ হবে। প্রশ্ন হল, কোনও ডেন্টিস্ট কি কলকাতায় নার্ভের অসুখে মারা গেছে?"

"শ্রেয়া যদ্দুর জানে, না।"

"যখন মার্কারি নিয়ে এত সমস্যা ওটা ব্যবহার না করলেই তো হয়?" আমি বললাম।

"ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। তাহলে তো জ্বর মাপার থার্মোমিটারও ফেলে দিতে হয়, সেখানেও তো মার্কারি থাকে? কাচ ক্র্যাক করলেই বেরিয়ে আসবে।"

"ঠিক, পদ্মপাতায় জলের মতো এদিক ওদিক গড়ায়, ওগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় অনেক খেলেছি।"

"সেইজন্যেই তোর নার্ভটা উইক।"

"চুপ কর," আমি ধমক লাগালাম প্রমথকে। "শ্রেয়া কি ডাঃ সিনহানাইয়ার কথাটা মেনে নিল, কোনও রকম ফ্যাক্ট-চেক না করে।"

"না, না, মানেনি স্যার। আর আপনি যা ভাবছেন, সেটা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে।"

এর কয়েকদিন বাদে একেনবাবু যে সমাচার দিলেন তাতে আমার আক্কেল গুরুম!

"শ্রেয়া মনে হল আরও অনেকটা পথ এগিয়েছে। এই কিশলয় গ্রিন লিফ-এ চুল কাটত। আর অন্য যুবকটি, যার নাম শঙ্কর, সেও কাটত। অর্থাৎ দুটো মৃত্যুর আরও একটা কমন সোর্স পাওয়া গেছে।"

"কী সর্বনাশ, আমি আর প্রমথও তো গ্রিন লিফ-এ চুল কেটে এসেছি!" আমি বললাম। "ওখানে বিউটিশিয়ানদের হাতে গ্লাভস দেখে সেলুনের মালিককে প্রশ্ন করায় উত্তর দিয়েছিলেন, অনেক টক্সিক কম্পাইন্ড নিয়ে ওঁরা কাজ করেন, তাই সাবধানতা নেন। তার মধ্যে কি কোনও মার্কারি কম্পাউন্ড থাকতে পারে? শুনেই তো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! কালকেই একবার ইউনিভার্সিটি হেলথ সেন্টারে যাব, খোঁজ করব মার্কারি পয়জনিং-এর কোনও অ্যান্টিডোট আছে কি না!"

প্রমথও মনে হল একটু চিন্তিত। সাধারণত আমি কিছু বললেই একটা বাঁকা মন্তব্য করে। বলল, "এটা মন্দ বলিসনি। দুয়েকটা অ্যান্টিডোট আছে বলে শুনেছি। কিন্তু একটা কথা একেনবাবু, শ্রেয়ার উচিত আগে যারা ওখানে কাজ করত, তাদের খুঁজে বার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, তাদের নার্ভের কোনও অসুখ হয়েছে কি না! এবার গিয়ে তো অনেককেই নতুন দেখলাম, তাই একটু সন্দেহ হচ্ছে।

"আরে না স্যার, বহু লোকই তো ওখানে চুল কাটে। শ্রেয়া খোঁজ নিয়ে দেখেছে গ্রিন লিফ যেসব কেমিক্যাল ব্যবহার করে সেখানে মার্কারি কম্পাউন্ড কিছু নেই।"

"কিন্তু এই যোগাযোগ... মানে সিনহানাইয়ার ক্লিনিক আর গ্রিন লিফ... আপনার কি মনে হচ্ছে কাকতালিয়... এর সঙ্গে নার্ভের অসুখের কোনও লিঙ্ক নেই?"

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। তবে ইন্টারনেট-এ মার্কারি কম্পাউন্ড খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়ল ডাইমিথাইল মার্কারি... জল রঙের তরল, মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু কী মারাত্মক জিনিস স্যার! দুয়েক ফোঁটা গায়ে লাগলে কয়েক মাসের মধ্যে স্নায়ুরোগ দেখা

দেবে... কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোমা এবং নির্ধারিত মৃত্যু। ভেরি ইন্টারেস্টিং।”

“বুঝলাম। কিন্তু আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, গ্রিন লিফ-এর কেউ এটা ব্যবহার করছে ছেলেদের খুন করার জন্য। কিন্তু কেন?”

“সেটাই বার করতে হবে স্যার। নার্ভের অসুখে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের চেহারার মধ্যে কি কোনও মিল আছে? কিশলয় আর শঙ্করবাবুর চেহারায় কতটা সাদৃশ্য? ডেন্টাল ক্লিনিককে যদি ক্লিন চিট দেওয়া হয়, তাহলে গ্রিন লিফের কোনও বিউটিশিয়ান কি ওই রকম চেহারার কোনও লোককে এতটাই ঘৃণা করে যে চুল-কাটার সময় বা পেডিকিওর বা ফেশিয়াল করার সময়ে দু-এক ফোঁটা গায়ে দিচ্ছে? কিন্তু সে কাজটাও যদি কেউ করে, সেটা সহজ কাজ হবে না।”

“এটা কেন বলছেন?”

“এটা নিয়ে কাজ করা স্যার বেশ কঠিন। একজন প্রফেসর এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নার্ভের অসুখে মারা গেছেন। হাতে গ্লাভস ছিল, সেই গ্লাভস ভেদ করে ওটা শরীরে ঢুকে যায়। এটা যদি কেউ ব্যবহার করে, সে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।”

“অথবা যে খুনগুলো করেছে, সেও এই নার্ভের অসুখে মৃত কোনও যুবক। আনাড়ির মতো অন্যদের খুন করতে গিয়ে নিজেও প্রাণ হারিয়েছে।”

“সেটাও স্যার সম্ভব। শ্রেয়া এখন মৃত যুবকদের আত্মীয়স্বজন, চেনা পরিচিতদের খোঁজখবর করছে। তবে একটা জিনিস আমরা জানি না স্যার, সবাই মার্কারি পয়জনে মারা গেছে কিনা। শুধু জানি কিশলয়বাবুর শরীরে মার্কারি পাওয়া গেছে। সেখান থেকে সবাইকে মার্কারি পয়জনের ভিক্টিম ভাবাটা ভুল হবে স্যার। যাই হোক, গ্রিন লিফ-এ যারা কাজ করছে তাদেরও ইন্টারভিউ করা হচ্ছে। এটা যদি অ্যাকসিডেন্ট না হয়, তাহলে আমরা হয়তো ডেঞ্জারাস এক খুনির সঙ্গে ডিল করছি।”

“এটুকু বলতে পারি, ‘গ্রিন লিফ’-এর ধারে কাছে আমি যাচ্ছি না। এদেশে আসার আগে বাড়িতে এসে চুল কাটত নিতাই, কুড়ি না তিরিশ টাকা নিতো, তাকেই আবার পাকড়াব।”

“তাহলে নার্ভের অসুখে মরবি না, সম্ভবত এইচআইভি-র কবলে পড়বি।” প্রমথ খোঁচা দিল।

“ডোন্ট বি সিলি!” ফ্র্যান্সিস্কা ধমক দিল।

“ভালো কথা স্যার, আপনি বললেন গ্রিন লিফ-এর মালিককে গ্লাভস নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি ওঁকে চেনেন? কবে পরিচয় হল স্যার?”

“এই তো এইবার। একজন মুসলিম মহিলা।”

“আপনি শিওর স্যার?”

“হ্যাঁ, কেন এই প্রশ্ন করছেন বলুন তো?”

“কারণ, শ্রেয়া বলছিল গ্রিন লিফ-এর মালিকের নাম বুলবুল চৌধুরী।”

“হিজাব নিকাব পরা একজন মুসলিম মহিলা। চৌধুরী তো মুসলিম পদবীও হয়। তাই না?”

“তা হয় স্যার।”

।। ৭।।

এর পরের দু'দিন স্কুলের নানান কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সকালে গেছি রাত্রে ফিরেছি। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত ছিল না। রাত্রে যখন ফিরেছি একেনবাবু তখন দরজা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছেন। প্রমথ গেছে ফ্র্যান্সিস্কার বাড়িতে। ইদানীং ওখানেই মাঝে মাঝে রাত কাটায়। আগে খ্যাপালে লজ্জা পেত। এখন কিছু বললেই বলে, "চুপ কর, শালা!"

যাই হোক, আজ শনিবার, স্কুল নেই। ফ্র্যান্সিস্কা ওর এক বন্ধুর বাড়িতে উইক এন্ড কাটাতে গেছে, তাই সাত সকালে প্রমথও এসে হাজির। একেনবাবুর গলা শুনছি ঘর থেকে...

"দুটো গ্লাভস পেয়েছিস? খুব সাবধানে কোনও এক্সপার্টকে দিয়ে ওগুলো ডিস্পোজ কর।... হ্যাঁ, আমার সন্দেহ হয়েছিল নামাজ পড়ছে না শুনে।... তা তুই কি করবি?... কাটা কাটা কথাগুলো পুরো শুনতে পারছিলাম না।

একটু বাদেই একেনবাবু বেরোলেন ঘর থেকে।

"কী ব্যাপার?"

"ঘরের মধ্যে থাকব কী করে স্যার, আপনার কফির যা খুশবাই।"

"এতক্ষণ তো দিব্বি ছিলেন ঘরের মধ্যে, কার সঙ্গে এত কথা হচ্ছিল? শ্রেয়ার সঙ্গে?" প্রমথ চার্জ করল।

"আপনার কানকে স্যার কে ফাঁকি দেবে?"

"তা শ্রেয়ার তদন্ত শেষ হল?"

"তা মনে হয় হল। কিন্তু তার আগে গল্প বলি, যেটা বহুদিন বলব বলব করেও আপনাদের বলা হয়নি।"

"এটা আর নতুন কথা কি, গোপন করা তো আপনার স্বভাব!"

"না না স্যার, ফ্যামিলিও বলছিল, আপনারা ওর কাছেও জানতে চেয়েছিলেন আমি এদেশে হঠাৎ কেন এলাম।"

"এখন আর আমরা ইন্টারেস্টেড নই।"

"স্টুপিডের মতো কথা বলিস না। না বলুন, প্লিজ।" আমি বললাম।

একেনবাবু একটু চুপ করে শুরু করলেন, "আপনারা মনে হয় সেই সময়ে দেশে ছিলেন না। হঠাৎ করে মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার একটা চল আরম্ভ হয়েছিল। প্রেমের বা কোনও কুপ্রস্তাবে সাড়া না দিলে বা অন্য কোনও কারণে কারোর ওপর রাগ হলেই মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা। এটা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে, সেখান থেকে এল পশ্চিমবঙ্গে।"

"ভালো করেই সেটা জানি, নেট-এ পড়েছি, ফেসবুকেও তো ছবি দেখছি। এখনও তো ঘটছে।"

"হ্যাঁ, স্যার। এটার যখন বাড়াবাড়ি শুরু হল, আমি বড় কর্তাদের একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে খুব বড়ো বড়ো মাটির পাত্রে জল রাখা। অ্যাসিড মুখে লাগলেই যার মধ্যে মুখ ডোবানো যায়। সেটা সম্ভব না হলে, বালতি বা কিছুতে জলের বন্দোবস্ত রাখা, যাতে চট করে জল নিয়ে মুখটা অন্তত ধুয়ে ফেলা যায়। সেক্ষেত্রে মুখটা সেভাবে পুড়বে না। আমার প্রস্তাবে কেউ কান দিলেন না। কর্পোরেশনের এক কাউন্সিলার কানে সেটা উঠতে ঠাট্টা করে আবার বিবৃতি দিলেন অ্যাসিডে মুখ পুড়বে না,

কিন্তু ডেঙ্গীতে লোকেরা মরবে। খুব উপহাসের পাত্র হয়েছিলাম স্যার।

"এর মধ্যে বেশ কয়েকটা মেয়ের মুখ অ্যাসিডে পুড়ল। আমাদের ওপর চাপ এল দ্রুত দোষীদের ধরার। মুশকিল হল, মেয়েটার হয়তো কাউকে সন্দেহ হয়, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে তো কেউ অ্যাসিড ছোঁড়ে না। অনেক সময় প্রেমিক নিজে না ছুঁড়ে আর কাউকে দিয়ে ছোঁড়ায়। এক আধ সময়ে যখন হাতেনাতে ধরতে পারা গেল, তখনও শাস্তি দেওয়া গেল না। খুঁটির জোর আমাদের দেশে বড় জোর। বিশেষ করে সেই খুঁটি যদি হয় শাসক দলের রাজনৈতিক নেতাদের। শেষে যে ঘটনা ঘটল, আমার কাছে সেটা মর্মান্তিক। আক্রান্ত হল আমাদেরই পরিচিত খুব মিষ্টি একটি মেয়ে। ওর বাবা-মাকে চিনতাম, আমাদের আগের পাড়ায় থাকতেন। মেয়েটা বায়োলজিতে মাস্টার্স করছিল। তার ব্যর্থ প্রেমিক দিনের বেলায় রাস্তার লোকের সামনেই মেয়েটির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারল। দোষীকে ধরলাম। কিন্তু ছেলেটির বিরুদ্ধে কেস খাড়া করার অনুমতি দেওয়া হল না। ব্যর্থ প্রেমিক এক মন্ত্রীর ভাগ্নে। লাভের মধ্যে রাতারাতি আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল রেকর্ডস সেকশনে। অর্থাৎ বসিয়ে দেওয়া হল কেরানীর কাজে। মনে আছে হাসপাতালে গিয়ে ওকে দেখেছি। কী সুন্দর মুখ ছিল... ঝলসে সেটা বিকৃত হয়ে গেছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছিল। আমি তদন্ত করছি... ওর বাবা-মা অনেক আশা করেছিলেন, দোষী অন্তত শাস্তি পাবে।

"বেশ কিছুদিন অফিসে যাইনি স্যার, ছুটি নিয়ে বসেছিলাম। সেই সময়েই নিউইয়র্কে আসার সুযোগটা এল, ফ্যামিলিই জোর করল সুযোগটা নিতে।"

"সত্যি, এত করাপশন থাকলে আইন থেকে আর লাভটা কি?" আমি স্বগতোক্তি করলাম।

"ঠিকই স্যার।"

"কিন্তু এই গল্পটা হঠাৎ এখন করলেন কেন?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল। যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম প্রমথ উত্তরটা জানে। কারণ আমিও আঁচ করতে পারছিলাম।

"বলছি, স্যার। এই কিশলয় ছিল এক মন্ত্রীর ভাগ্নে, যার নাম ছিল সংগ্রাম। আপনি বলেছিলেন না স্যার, গ্রিন লিফ-এর মালিক হিজাব নিকাব পরা একজন মুসলিম। আমি শ্রেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মালিকটি নিয়মিত নামাজ পড়েন কিনা। গ্রিন লিফ-এর বোরখা পরা বিউটিশিয়ানটিও নামাজ পড়েন না। খুব অদ্ভুত না স্যার, ব্যাপারটা? দু'জন গোঁড়া মুসলিম, যাঁরা মুখ ঢেকে আছেন কিন্তু এই আবশ্যিক প্রাত্যহিক কর্মটা করছেন না, তখনই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল স্যার। মনে পড়ল সেই মিষ্টি মেয়েটির নাম ছিল বুলবুলি। পদবি চৌধুরী। নিশ্চয় ভালো নাম ছিল বুলবুল।

আরেকটা জিনিস জানার দরকার ছিল স্যার, কারণ সাবধানতা না নিয়ে ডাইমিথাইল মার্কারি ব্যবহার করলে নিজেদেরও মার্কারি পয়জনিং হবে। এক ফোঁটা গায়ে পড়লে বা লেটেক্স গ্লাভসে পড়লেও মৃত্যু। একমাত্র গ্লাভস যার মধ্যে দিয়ে ডাইমিথাইল মার্কারি ঢুকতে পারে না, সেটা হল সিলভার-শিল্ড-ল্যামিনেট গ্লাভস। সেটার খোঁজ করতে বলেছিলাম শ্রেয়াকে। খুঁজতে খুঁজতে শ্রেয়া একটা তালা-বন্ধ ক্যাবিনেট-এর মধ্যে দুটো সিলভার শিল্ড ল্যামিনেট গ্লাভস পেয়ে গেল। আর পেল ভালো করে সিলকরা ডাইমিথাইল মার্কারির একটা বোতল। সেগুলো দেখানোর পর শ্রেয়ার কাছে বুলবুল চৌধুরি স্বীকার করেছে ও আর অ্যাসিড-দগ্ধ বন্ধু পরিকল্পনা করে হত্যা করেছে কিশলয় আর শঙ্করকে। ওদের একটাই কথা, আমরা সারা জীবন এই লোকগুলোর করে দেওয়া ক্ষত নিয়ে অস্পৃশ্য হয়ে আছি, আর ঘৃণ্য অপরাধ করেও এরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে! না,

সরকার কোনও বিচার আমাদের দেয়নি। এটাই আমাদের বিচার, আর কিছু না হোক তীব্র কষ্ট পেয়ে ওরা অন্তত মরুক।"

"তাহলে তো শ্রেয়ার একটা মস্ত ব্রেক হল।" প্রমথ বলল, "ফ্রন্ট পেজ নিউজ।"

"না স্যার। শ্রেয়া ওদের ধরেনি। দেশে থাকতে আমরা স্যার শুধু চোখ বুজে কর্তব্য করেছি, আমার বোনটি অন্য ধাতুর, ওর কর্তা হল বিবেক। কেস রিপোর্ট না লিখে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। নিউ ইয়র্কেই আসছে। আমাকে বলল, ওর বাপিদার সঙ্গে নাকি এ নিয়ে কথাও হয়েছে।"

শুনে প্রমথ আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল... ভাবটা এত জানা কথাই!

[একেনবাবুর এই কাহিনিতে কিন্তু শেষের চমকটা নেই। বাপিবাবুকে বলেছিলাম সে কথাটা। একটু ঘুরিয়ে যদি কাহিনিটা লেখেন। বাপিবাবু রাজি হলেন না। এই একটা গল্পে একেনবাবু আমাদের অবাক করতে চাননি। হাতের তাস দেখিয়েই খেলেছিলেন। আমি অন্য রকম করে লিখব কেন?]